গবেষণাপত্র সংকলন-২

সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৌজন্যে
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-২

সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

প্রকাশনায়
গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬

ই-মেইল ঃ bic@accesstel.net
ওয়েবসাইট ঃ www.bicdhaka.com

সেল্স সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (দোতলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২৭০৮৭

ISBN : 984-843-031-7

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৭
পৌষ, ১৪১৪
যুলহিজ্জা, ১৪২৮

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

কম্পোজ
র‍্যাকস কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত পনের টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আস্-সুন্নাহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা আস্-সুন্নাহ আলকুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আলকুরআনের সংক্ষিপ্ত মৌল নির্দেশনাগুলোর বিস্তারিত প্রায়োগিক রূপ। আলকুরআন ওয়াহী মাতলু। আর আস্-সুন্নাহ ওয়াহী গাইর মাতলু। প্রথম প্রকার ওয়াহীর ভাব ও ভাষা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক নাযিলকৃত। আর দ্বিতীয় প্রকার ওয়াহীর ভাব আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক নাযিলকৃত কিন্তু ভাষা আল্লাহর রাসূলের (সা)। বিভিন্ন যুগে একশ্রেণীর তাত্ত্বিক আস্-সুন্নাহর গুরুত্ব ও বিশুদ্ধতা নিয়ে নানা প্রকারের সংশয় সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহর দারুণ ক্ষতি করেছে। বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের তাত্ত্বিকগণ একই ভূমিকা পালন করে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের একটি "বিশেষ অধ্যয়ন অধিবেশনে" (Special Study Session) "সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সা)" বিষয়টি আলোচিত হয়। অধিবেশনে ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এর ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার "গবেষণাপত্র সংকলন-২" নামে লেখাটি প্রকাশ করছে। চিন্তার বিভ্রান্তি নিরসনে এবং স্বচ্ছ ও সঠিক চিন্তার বিকাশ সাধনে গবেষণাপত্রটি বড়ো রকমের অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ কে এম নাজির আহমদ

বিষয়সূচী

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد :

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে– 'সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ' সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরোনামে ছোট্ট একটি পুস্তক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। গবেষণাধর্মী পুস্তক রচনার যে রীতি-পদ্ধতি চালু আছে তা এতে হুবহু অনুসৃত হয়নি। কারণ সে রকম পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এ কাজে হাত দিতে পারিনি। তাৎক্ষণিকভাবে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তার কয়েকটি এতে আলোচনা করেছি।

পুস্তকটির শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে এতে হয়তো রাসূলে কারীমের (সা) 'আমলী সুন্নাহ কী কী এবং কোন্‌টির গুরুত্ব কতখানি, অথবা কোনটি সুন্নাহ নয় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আসলে তেমন কিছু এতে আসেনি। সুন্নাহ বলতে আমরা হাদীছবিশারদ ও উসূলবিদগণের সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাপক অর্থে রাসূলে কারীমের (সা) কাওলী, 'আমলী ও তাকরীরী

(কথা, কাজ ও সমর্থন) সবকিছুই বুঝিয়েছি এবং তারই কিছু তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছি। কুরআন-হাদীছের আলোকে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সকল সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তা একেবারে নতুন নয়, বরং অতীতের সর্বজন স্বীকৃত কোন মুসলিম মনীষীর সিদ্ধান্তও হয়তো তেমন ছিল। কোথাও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও হয়তো বাদ পড়েছে।

হাদীছ নিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সেই হিজরী ২য়/৩য় শতক থেকে চলে এসেছে। বর্তমানেও সে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। সেই বিষয়ে একটু সতর্ক করাই আমার এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে জমা দিলে তারা এর উপর আলোচনার জন্য একটি স্টাডি সেশনের আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশজন হাদীছ বিশারদ পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিছু পরামর্শ দেন। তাঁদের সেই মূল্যবান পরামর্শের আলোকে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে নেয়া হয়েছে।

লেখার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠক-পাঠিকাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন!

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

২৫ নভেম্বর, ২০০৭
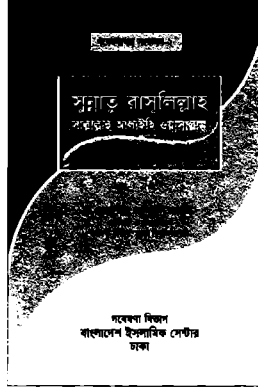
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ কর্তৃক রচিত গবেষণাপত্রটির কপি প্রথমে বিশজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট পাঠানো হয়। অতঃপর এটি ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'বিশেষ অধ্যয়ন অধিবেশনে' (Special Study Session) উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, মাওলানা রাফিকুর রাহমান আলমাদানী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা খলিলুর রহমান আলমাদানী এবং জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাহ্‌র পরিচয়

সুন্নাহ্ (السنة) একটি আরবী শব্দ। এক বচন বিশেষ্য, বহু বচনে 'সুনান' (اَلسُّنَنُ)। অভিধানগত অর্থ : اَلطَّرِيْقَةُ - مَحْمُوْدَةً كَانَتْ أَوْ مَذْمُوْمَةً.
– রীতি, পদ্ধতি, পথ, পন্থা, নিয়ম, স্বভাব– তা ভালো হোক বা মন্দ।

যেমন রাসূল (সা) বলেছেন :[১]

مَنْ سَنَّ سَنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سَنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি-পদ্ধতি চালু করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তার ওপর আমল করবে সে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদানও পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ রীতি-পদ্ধতি চালু করবে সে তার প্রতিফল পাবে, তেমনিভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তা অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিফল সে পেতে থাকবে।"

রাসূলুল্লাহর (সা) আরেকটি বাণীতে এসেছে :[২]

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.

'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করবে– তারা এক বিঘৎ পরিমাণ করলে তোমরাও এক বিঘৎ করবে, তারা এক হাত সমপরিমাণ করলে তোমরাও এক হাত পরিমাণ করবে।'

উল্লেখিত হাদীছ দু'টিতে সুন্নাহ শব্দটি রীতি, পদ্ধতি, পথ-পন্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন মাজীদেও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তা ভালো অর্থে। যেমন :[৩]

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত : বাবুল হাছ্ছি 'আলাস সাদাকা ওয়া আনওয়া'ইহা-৭/১০২

২. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। (ড. মুস্তাফা আস-সিবা'ঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৪৭)

৩. সূরা আন-নিসা-২৬

'আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থায় হিদায়াত করতে।'

শব্দটি কুরআনে রীতি, হুকুম ও চূড়ান্ত ফায়সালা বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে :[৪]

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً.

'পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এ ছিল আল্লাহর রীতি। তুমি কখনও আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।'

"سُنَّةُ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِه." – সৃষ্টি জগতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাহ্" অর্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম, নির্দেশ, সৃষ্টি জগতকে যে অভ্যাস, নিয়ম-রীতির উপর চালু রেখেছেন, তাই।[৫]

হাদীছে সুন্নাহ শব্দটি রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী ও কর্ম বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, রাসূল (সা) বলেন :[৬]

تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى.

'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।'

হাদীছে সুন্নাহ শব্দটি রাসূলে কারীমের (সা) জীবনাদর্শ বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন :[৭]

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى.

'বিয়ে করা আমার সুন্নাহ্ (আদর্শ)। সুতরাং যে আমার এ সুন্নাহ্ প্রত্যাখ্যান করবে সে আমার উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়।'

হাদীছে সুন্নাহ শব্দটি রাষ্ট্র পরিচালন–নীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূল (সা) বলেছেন :[৮]

---

৪. সূরা আল-আহযাব-৬২

৫. আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত-৪৫২

৬. ইবন 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, খণ্ড-২, পৃ. ১৮০

৭. সাহীহ আল-বুখারী

৮. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-২/১৮০

اتقوا الله عليكم بالسمع والطاعة، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ.

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের কর্তব্য শুনা ও আনুগত্য করা। তোমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের অবশ্য করণীয় হবে আমার এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহর অনুসরণ করা। তা দাঁত কামড়ে ধরার মত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।'

এ হাদীছে সুন্নাহ বলতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র পরিচালনা-নীতিকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, রাসূল (সা) এখানে কেবল খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেছেন, অন্য সকল সাহাবীর সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেননি। এ থেকে বুঝা যায়, এখানে খুলাফায়ে রাশিদীনের এমন কোন সুন্নাহর কথা বলা হচ্ছে যা অন্য কোন সাহাবীর নেই।

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের সেই বিশেষ সুন্নাহ হলো তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি। অতএব হাদীছটির অর্থ হবে : "তখন তোমাদের করণীয় হবে আমার এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্রনীতি ও পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করা।"

সুন্নাহর পারিভাষিক অর্থের ব্যাপারে হাদীছবিদ ও ফিক্‌হবিদদের মধ্যে একটু মত পার্থক্য আছে, প্রত্যেক দলই নিজেদের অধ্যয়নের বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুন্নাহর অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করেছে। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় সুন্নাহ হলো :[৯]

كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خَلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَةٍ، أو سيرة - سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها.

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াত পূর্ব অথবা নবুওয়াত পরবর্তী জীবনের কোন কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, দৈহিক গঠন প্রকৃতি, নৈতিক গুণাবলী ও জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাই সুন্নাহ।" অনেকের মতে সুন্নাহ এই অর্থে হাদীছের সমার্থবোধক।

---

৯. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৪৭; শুবহাত আল-কুরআনিয়্যীন-১/৮

মুহাদ্দিছগণের এ সংজ্ঞা মতে রাসূলে কারীমের (সা) সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই সুন্নাহ। অন্য ভাষায় রাসূল (সা) হতে বা রাসূল (সা) সংক্রান্ত কুরআন ব্যতীত যে সব বর্ণনা এসেছে সবই সুন্নাহ। রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের যে সব বিষয় তাঁর নিজের ইচ্ছাধীন নয়, যেমন তাঁর দৈহিক আকার-আকৃতি, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির বর্ণনাগুলোও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

উছূলবিদদের পরিভাষায় সুন্নাহ :

ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

- নবী (সা)-এর কথা অথবা কাজ অথবা মৌন সমর্থন সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা হলো সুন্নাহ।

কথার দৃষ্টান্ত হলো : বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে রাসূল (সা) বিধি-বিধান সম্বলিত যে সকল কথা বলেছেন। যেমন : "انما الأعمال بالنيات" –'সকল কর্মের ভিত্তি হলো নিয়্যাত।'[১০]

"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا."[১১]

– 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বলবৎ রাখা বা না রাখার অধিকার আছে।'

কাজের দৃষ্টান্ত হলো : সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলে কারীমের (সা) ছালাত, ছাওম, হাজ্জ, বিচার ইত্যাদি কাজ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাই।

মৌন সমর্থনের দৃষ্টান্ত হলো : রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে অথবা জ্ঞাতসারে কোন কোন সাহাবী কিছু কাজ করেছেন, কিন্তু রাসূল (সা) চুপ থেকেছেন। এতে তাঁর সম্মতি আছে তা বুঝা গেছে অথবা তার প্রতি তিনি সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

চুপ থাকার দৃষ্টান্ত হলো : বানূ কুরাইযার যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন :[১২]

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ ـ

"তোমাদের কেউই বানূ কুরাইযায় ছাড়া আসরের ছালাত আদায় করবে না।"

সাহাবায়ে কিরামের অনেকে মনে করলেন, এ নিষেধাজ্ঞা আক্ষরিক অর্থেই। তাই

১০. বুখারী ও মুসলিম 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১. প্রাগুক্ত

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা আসর আদায় করলেন না এবং বানূ কুরাইযায় পৌঁছে মাগরিবের পরে আসর আদায় করেন। সাহাবীদের অপর একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথার অর্থ এই বুঝলেন যে, তিনি যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছতে বলেছেন। তাই তাঁরা সময় মত আসরের নামায আদায় করেন এবং দ্রুত বানূ কুরাইযায় পৌঁছেন। উভয় দলের কর্মকাণ্ড রাসূল (সা) অবগত হন এবং মৌনতা অবলম্বনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দান করেন।

মৌন সমর্থনের দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হলো : একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গুঁইসাপের (ضَبٌّ) গোশ্‌ত খাবার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি খেলেন না, তবে খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ (রা) খেলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা খাওয়া কি হারাম? বললেন : না। তবে এটা আমার সম্প্রদায়ের এলাকায় নেই, এ জন্য আমার খাওয়ার রুচি হয়নি।

(قَالَ لَهُ بعض الصحابة : أو يحرم أكله يا رسول الله؟ فقال : لا، ولكنه ليس فى أرض قومى فأجدنى أعافه.)[১৩]

এই উছূলবিগদণ এমন কিছুকেও সুন্নাহ বলেন যা কোন শর'ঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সে দলীল আল-কুরআন হোক অথবা হোক রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বাণী বা কর্ম অথবা হোক সাহাবীদের ইজতিহাদ। যেমন : আল-কুরআন মাসহাফে সংগ্রহ করা, একই উচ্চারণে কুরআন পাঠের জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করণ, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দিওয়ান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এসবই হলো সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ-প্রসূত কাজ। উপরোক্ত সব কিছুকে সুন্নাহ বলা হয়, আর এর বিপরীত শব্দ হলো বিদ'আত (البدعة)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী হলো :

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى.[১৪]

– আমার সুন্নাহ ও আমার পরে খুলাফা-ই-রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আর ফকীহদের পরিভাষায় :

ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب.

---

১৩. বুখারী ও মুসলিম ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৪. আবূ দাঊদ ও তিরমিযী 'ইরবাদ ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

– রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া অন্য যা কিছু প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই সুন্নাহ। আর তাঁদের নিকট এর বিপরীত শব্দ হলো আল-বিদ'আ (البدعة)। যেমন : তাঁরা বলেন : طلاق السنة كذا، طلاق البدعة كذا – সুন্নাত তালাক এমন, বিদ'আত তালাক এমন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (সা) বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত তালাক হলো সুন্নাত তালাক, আর এর বিপরীতটি তালাকে বিদ'আত।

সুন্নাহর পারিভাষিক অর্থে এই ভিন্নতা 'আলিম ব্যক্তিদের প্রতিটি দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতার কারণে হয়েছে। হাদীছ বিশারদগণ রাসূলে কারীমকে (সা) একজন নেতা, সত্যপথের দিশারী, যাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন, সেই হিসেবে তাঁর জীবন-ইতিহাস অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। সুতরাং তাঁরা তাঁর জীবনী, দৈহিক গঠন, চরিত্র, নৈতিক গুণাবলী, কথা, কাজ ইত্যাদি বর্ণনা করেন। এসব কিছু কোন শর'ঈ হুকুম প্রমাণ করুক বা না করুক।

আর উছূলবিদগণ রাসূলুল্লাহকে (সা) এই হিসেবে জানতে চেয়েছেন যে, তিনি বিধানদাতা, যিনি পরবর্তী কালের মুজতাহিদগণের জন্য মূলনীতির প্রতিষ্ঠাতা এবং মানব জীবনের সংবিধান প্রদানকারী। সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) এমন সব কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন বর্ণনা ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেন যা দ্বারা শরী'আতের কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর ফিক্হবিদগণ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এভাবে গবেষণা করেছেন যে, তাঁর সকল কাজই কোন শর'ঈ হুকুম প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ থেকে বাইরে নয়। তাঁরা বান্দার কাজের ব্যাপারে শর'ঈ হুকুমকে ওয়াজিব, হারাম, মুবাহ, মাকরূহ ইত্যাদি হিসেবে গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

উছূলবিদগণ যে অর্থে সুন্নাহকে বুঝেছেন সেটাই আমরাও বুঝবো। কারণ, ইসলামী বিধানে সুন্নাহর প্রামাণিকতা ও গুরুত্ব তাঁদের গবেষণায় স্পষ্ট হয় বেশি। মুহাদ্দিছগণ ব্যাপক অর্থে ইতিহাসগতভাবে সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের সাধনা করেছেন তাও আমরা স্মরণ রাখবো।

এই সুন্নাহ ও হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে আরো দু'টি শব্দের প্রচলন আছে। যেমন : আল-খাবর, আল-আছার, (اَلْخَبَرُ وَالأَثَرُ)।

খাবর (خَبَرٌ) : অর্থ সংবাদ। বহু বচনে আখবার (أخبار)। মুহাদ্দিছগণের মতে হাদীছ ও খাবর একই অর্থবোধক। তবে অনেকে বলেছেন, নবী (সা) সম্পর্কিত

বিষয়কে হাদীছ এবং অন্যদের সম্পর্কিত বিষয়কে খাবর বলা হয়। সে কারণে ইতিহাস ও এ জাতীয় বিষয় চর্চাকারীকে বলা হয় "ইখবারী" এবং সুন্নাতে নববী (সা) চর্চাকারীকে বলা হয় মুহাদ্দিছ। আবার কারো কারো মতে শব্দ দু'টির মধ্যে عموم وخصوص مطلق সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রতিটি হাদীছই এক একটি খাবর; কিন্তু প্রতিটি খাবর হাদীছ নয়।[১৫]

আছার (أثر) : অর্থ চিহ্ন, বস্তুর ধ্বংস চিহ্ন। অনেকে পারিভাষিক অর্থে হাদীছের সমার্থবোধক বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরামের (রা) কথা ও কাজকে বলে আছার।[১৬]

আসলে সুন্নাহ হলো সেই উচ্চতর আইন যা সর্বোচ্চ বিধানদাতার (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) মর্জি ও ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিধান মুহাম্মাদ (সা) থেকে আমাদের নিকট দুইটি মাধ্যমে পৌঁছেছে। এক. কুরআন, যা অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান ও তাঁর হিদায়াতের সমষ্টি। দুই. মুহাম্মাদ (সা)-এর উসওয়া-ই-হাসান বা অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ, অথবা তাঁর সুন্নাহ যা কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। মুহাম্মাদ (সা) শুধুমাত্র আল্লাহর বাণীবাহকই ছিলেন না যে, তাঁর কিতাব পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আর কোন দায়িত্ব ছিল না, বরং তিনি তাঁর নিয়োগকৃত পথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা ও প্রশিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা, তার সঠিক উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেয়া, তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

অতঃপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত জামা'আতের রূপদান করে সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো। অতঃপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি সৎ ও সংশোধনকারী রাষ্ট্রের রূপদান করে দেখিয়ে দেয়া যে, ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা)-এর এই সমগ্র কাজই হচ্ছে সুন্নাহ যা তিনি তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই সুন্নাহ কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ আইন প্রণেতার উচ্চতর আইনের রূপায়ন ও পূর্ণতা বিধান করে। আর ইসলামী পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নাম শরী'আত।[১৭]

---

১৫. শারহু নুখবাতিল ফিক্‌র-১৬

১৬. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীছ-১৬

১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-৩২

ওহীর প্রকার

ওহী বা প্রত্যাদেশ দুই ধরনের : (১) الوحى الظاهر (২) الوحى الباطن –প্রকাশ্য ওহী ও অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন প্রকাশ্য ওহী এবং সুন্নাহ অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন 'ওহী মাতলু'– যা তিলাওয়াত করা হয়, যা ছালাতে পঠিত হয়। কিন্তু সুন্নাহ বা হাদীছ 'গায়র মাতলু', যা তিলাওয়াত করা হয় না এবং ছালাতে পঠিত হয় না।

সুন্নাহ যে ওহী তা কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তেমন একটি আয়াত হলো :[১৮]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى.

'এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এ তো কেবল ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।'

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে যা কিছু তিনি বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী। তা প্রথম প্রকারের ওহী আল-কুরআন হোক, বা হোক দ্বিতীয় প্রকারের ওহী আস-সুন্নাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাসূলের (সা) শানে বলেছেন :[১৯]

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيْلِ، لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ، فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ.

'সে (রাসূল) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।'

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা) যদি ওহী ছাড়া দীন বিষয়ক কোন কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে ধ্বংস করবেন। আর এই ধ্বংসের কর্ম থেকে কেউ তাঁকে বিরত রাখতে পারবে না। তাই 'আলিমগণ বলেন, আল্লাহ একথা ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ওহী করেননি, দীন বিষয়ক এমন কথা যদি নবী (সা) বলেন তাহলে তিনি তাঁকে ধ্বংস করবেন; কিন্তু তিনি তাঁর নবীকে ধ্বংস

---

১৮. সূরা আন-নাজম-৩-৪

১৯. সূরা আল-হাক্কা-৪৪-৪৭

করেননি এবং তাঁকে ডান হাত দিয়ে পাকড়াও করেননি, হৃৎপিণ্ডের শিরা-উপশিরাও কেটে দেননি; বরং এর বিপরীতে তিনি নবীকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গী-সাথীদেরসহ তাঁকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছেন। এ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী ওহী ছাড়া কোন কিছু যেমন বলেননি, তেমনি কোন কাজ করেননি এবং মৌন সমর্থনও দেননি। কারণ, কাজের চেয়ে কথা অধিকতর ব্যাপক।[২০]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন :[২১]

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ، اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, সে তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়। তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।'

উল্লেখিত আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম ঘোষণা করার চূড়ান্ত কর্তৃত্বটি সরাসরি উম্মী নবীর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এ শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, তা কুরআন অথবা সুন্নাহ দ্বারা হতে হবে। যেহেতু সাধারণভাবে ও ব্যাপক অর্থে কথাটি বলা হয়েছে, তাই নবী (সা) কুরআন অথবা সুন্নাহ যা দ্বারাই হোক না কেন এবং যা কিছুই হালাল

২০. দ্র. তাফসীর আয-যামাখশারী, আল-কুরতুবী ও আর-রাযী

২১. সূরা আল-আ'রাফ-১৫৭

অথবা হারাম করুন না কেন সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সা) তাঁর সুন্নাহ দ্বারা যা কিছু হালাল বা হারাম করেছেন তা কুরআন কর্তৃক কৃত হালাল-হারামের সমপর্যায়ের এবং দুইটিই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ওহী।

অনুরূপ আরেকটি আয়াত :[২২]

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্ইয়া দেয়।'

এ আয়াতে দুই প্রকার হারামের উল্লেখ করা হয়েছে : আল্লাহ কর্তৃক কৃত হারাম ও রাসূল (সা) কর্তৃক কৃত হারাম। একই বাক্যে একটি সংযোগ অব্যয়ের মাধ্যমে ভিন্ন দুই প্রকার হারাম সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্টভাবে দুইটি জিনিস বুঝা যায় :

১. রাসূল (সা) যা কিছু হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার মত। বিধান ও আইনগত দিক দিয়ে দুটিই সমপর্যায়ের এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সুন্নাহ্র মাধ্যমে যে সকল বিধান দিয়েছেন তা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর কিতাবে প্রদত্ত বিধানের মতই।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছেন তা আল্লাহর নিকট থেকে আসা এরূপ ওহী, যেমন ওহী আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন। উভয় বিধানই আল্লাহর ওহী।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :[২৩] قُلْ إِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّىْ -

'বল (হে মুহাম্মাদ), আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট যে ওহী করা হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।' এ আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় কুরআন

২২. সূরা আত-তাওবা-২৯

২৩. সূরা ইউনুস-১৫

মাজীদ ছাড়াও মহানবীর (সা) উপর ওহীর মাধ্যমে বিধান নাযিল হতো এবং তিনি উভয় প্রকার ওহীর অনুসরণ করতেন।

রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন :[২৪]

أَلاَ وَإِنِّىْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

'জেনে রাখো! আমি আল-কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার মত আরেকটি জিনিস।' (আবূ দাঊদ, মিশকাত) আর সেই জিনিসটি হলো, সুন্নাহ।

আবূ উমামা (রা) বলেন, ইহুদীদের জনৈক 'আলিম একদিন রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলো, পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূল (সা) চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর জিবরীল এসে বললেন, আজ আমি আল্লাহর এত নিকটে পৌছেছিলাম, যেখানে ইতিপূর্বে কখনো পৌছাতে পারিনি। সেটি হলো, আমি তার নূরের ৭০ হাজার পর্দার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন :

شَرُّ الْبُقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبُقَاعِ مَسَاجِدُهَا -

'সর্বনিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মাসজিদ।'

ওহী মাতলু ও ওহী গায়র মাতলুর মধ্যে পার্থক্য

আসলে কুরআন কারীমের শব্দ সমষ্টি ও তার বিষয়বস্তু উভয়ই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এবং মহানবীর (সা) উপর তা এজন্য নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নাযিলকৃত ভাষায় তা মানব জাতির নিকট পৌছাবেন। তাই এটাকে ওহী মাতলু বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহী অর্থাৎ ওহী গায়র মাতলু তার ধরন, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে পূর্বোক্ত ওহী হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা রাসূলুল্লাহকে (রা) পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আসতো এবং মানুষের নিকট তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ভাষায় নয়, বরং মহানবীর (সা) সিদ্ধান্ত, বক্তব্য ও কর্মের আকারে পৌছতো। যদি কোন ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় যে, মহানবীর (সা) নিকট প্রথমোক্ত শ্রেণীর ওহী আসতে পারে, তবে তার এটা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, সেই নবীর নিকট শেষোক্ত শ্রেণীর ওহীও আসতে পারে। কুরআনের মু'জিযাসুলভ বাণী আমাদের যদি এই নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে যে, এটা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের-ই কালাম, তবে কি রাসূলুল্লাহর (সা) মু'জিযাসুলভ

২৪. আবূ দাঊদ, মিশকাত

জীবন এবং তাঁর মু'জিযাপূর্ণ কার্যাবলী আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় না যে, এটাও আল্লাহর পথ নির্দেশেরই ফল?

কুরআনে বিধৃত ওহীর প্রকার

অনেকে মনে করেন, যদি ধরে নেয়া হয় যে, মহানবী (সা) যা কিছু করতেন বা বলতেন ওহীর আলোকে করতেন– তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে যে ওহী প্রেরণ করতেন তার উপর (না'উযুবিল্লাহ) আশ্বস্ত না হতে পারায় আরেক প্রকারের ওহী নাযিল শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এই দুই ধরনের ওহী কেন? পূর্বকালে আগত নবীগণের উপর যে ওহী নাযিল হতো তাতে কুরআন নাযিল হওয়ার ইংগিত থাকতো, অতএব যে দ্বিতীয় প্রকার ওহী নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়– কুরআন মাজীদে তার প্রতি ইংগিত করাটা কি আল্লাহর জন্য খুব কঠিন ব্যাপার ছিল, যিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। কুরআনে তো এমন কোন জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না।

এর জবাবে আমরা বলতে পারি যে, মনোযোগ সহকারে কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এই কিতাবে কেবল দুই প্রকার নয়, বরং আরো কয়েক প্রকার ওহীর কথা উল্লেখ রয়েছে– যার মধ্যে শুধুমাত্র এক প্রকার ওহী কুরআন মাজীদে সংকলন করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :[২৫]

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اِنَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন বার্তাবাহক প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মানুষের উপর নির্দেশনামা এবং হিদায়াত নাযিল হওয়ার তিনটি পন্থার কথা বলা হয়েছে। সরাসরি ওহী (ইলকা ও ইলহাম), অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কথোপকথন, অথবা আল্লাহর

২৫. সূরা আশ-শূরা-৫১

বার্তাবাহকের (ফেরেশতার) মাধ্যমে ওহী প্রেরণ। কুরআন মাজীদ কেবল তৃতীয় প্রকারের ওহী। এর বিবরণ আল্লাহর তা'আলা সরাসরি কুরআন মাজীদেই পেশ করেছেন। যেমন :[২৬]

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَانَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

'(হে নবী) বল, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছে– যা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমার্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।'

আল্লাহ্ আরো বলেন :[২৭]

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ -

'তা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নাযিলকৃত কিতাব। রূহুল আমীন তা নিয়ে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়– যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।'

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন মাজীদ কেবলমাত্র এক প্রকারের ওহীর সংগ্রহ। রাসূলুল্লাহ (সা) আর যে দু'টি উপায়ে হিদায়াত লাভ করতেন যার উল্লেখ সূরা আশ-শূরার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা উপরোক্ত ওহী থেকে স্বতন্ত্র। এখন স্বয়ং কুরআন মাজীদ আমাদের বলে দিচ্ছে যে, এসব উপায়েও মহানবী (সা) হিদায়াত লাভ করতেন।

আল্লাহ্ বলেন :[২৮]

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

---

২৬. সূরা আল-বাকারা-৯৭

২৭. সূরা আশ-শূ'আরা'-১৯২-১৯৪

২৮. সূরা আল-বাকারা-১৪৩

'তুমি এ যাবত যে কিবলার অনুসরণ করছিলে তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে– আমরা জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায়।'

মাসজিদুল হারামকে কিবলা বানানোর পূর্বে মুসলিমদের যে কিবলা ছিল তাকে কিবলা বানানোর কোন হুকুম কুরআনে আসেনি। আর এ ঘটনা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের প্রারম্ভিককালে মহানবী (সা)-ই এই কিবলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং প্রায় চৌদ্দ বছর যাবত সেদিকে মুখ করে মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম ছালাত আদায় করতে থাকেন। চৌদ্দ বছর পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সূরা আল বাকারার এই আয়াতে মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত কাজের সত্যায়ন করেন এবং এই ঘোষণা দেন যে, এই কিবলা আমাদের নির্ধারিত ছিল এবং আমরা আমাদের রাসূলের (সা) মাধ্যমে তা এজন্য নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম কে রাসূলের আনুগত্য করে, আর কে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহর (সা) উপর কুরআন ছাড়াও যে ওহীর মাধ্যমে হুকুম-আহকাম নাযিল হতো, এটা একদিকে তার স্পষ্ট প্রমাণ এবং অপর দিকে এই আয়াত সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, মুসলিমগণ, রাসূলুল্লাহর (সা) সেই সব হুকুম মানতেও আদিষ্ট যা কুরআন মাজীদে উল্লেখ নেই। এমনকি আল্লাহ তা'আলার নিকট রিসালাতের প্রতি মুসলিমদের ঈমানের পরীক্ষাও এভাবে হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তারা মান্য করে কিনা।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের নিকট এই স্বপ্নের কথা বলেন এবং চৌদ্দ শো সাহাবী সাথে নিয়ে 'উমরা আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়ে যান। মক্কার কাফিররা তাঁকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধা দেয় এবং তার ফলশ্রুতিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। কোন কোন সাহাবীর মনে সংশয় ও অস্থিরতার সৃষ্টি হলে 'উমার (রা) প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করবো এবং তাওয়াফ করবো? তিনি বলেন : "আমি কি বলেছিলাম এই সফরেই তা হবে"?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :[২৯]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

২৯. সূরা আল-ফাত্হ-২৭

الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ، مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– কেউ মাথা কামিয়ে কেউ চুল ছোট করে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক নিকটবর্তী বিজয়।'

এ থেকে জানা গেল যে, মহানবীকে (সা) স্বপ্নের মাধ্যমে মক্কায় প্রবেশের এই পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, কাফিররা বাধা দেবে এবং শেষে সন্ধি স্থাপিত হবে– যার ফলে পরবর্তী বছর 'উমরা করার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যত বিজয়ের পথও খুলে যাবে। এটা কি কুরআন মাজীদ ছাড়াও ভিন্নতর পন্থায় পথ-নির্দেশনা লাভের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়?

মহানবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের কোন একজনের নিকট একটি একান্ত গোপন কথা বলেন। তিনি (স্ত্রী) তা অন্যদের নিকট ফাঁস করে দেন। মহানবী (সা) এজন্য তাঁকে অভিযুক্ত করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন, আমি অন্যদের নিকট একথা বলে দিয়েছি? মহানবী (সা) জবাব দেন, আমাকে মহাজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত সত্তা (আল্লাহ) অবহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন :[৩০]

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ.

'যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর সে তা যখন অন্যদেরকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো, যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বললো, কে আপনাকে তা অবহিত করলো? নবী বললো, আমাকে তিনি অবহিত করেছেন– যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।"

এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন মাজীদে সেই আয়াতটি কোথায় যার মাধ্যমে আল্লাহ

৩০. সূরা আত-তাহরীম-৩

তাঁর নবীকে অবহিত করেছিলেন যে, তোমার স্ত্রী তোমার গোপন কথা অন্যদের নিকট ফাঁস করে দিয়েছে? যদি এ রূপ কোন আয়াত না থেকে থাকে তবে কি প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ কুরআন মাজীদ ছাড়াও নবী (সা)-এর নিকট পয়গাম পাঠাতেন?

মহানবী (সা)-এর মুখডাকা পুত্র যায়িদ ইবন হারিছা (রা) নিজ স্ত্রীকে তালাক দেন। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এটাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক ও কাফিররা মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার এক ভয়ংকর তুফান সৃষ্টি করে এবং অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করায়। আল্লাহ তা'আলা এই অভিযোগের জবাব সূরা আল আহযাবের একটি পূর্ণ রুকূতে দান করেন এবং এই প্রসঙ্গে লোকদের বলেন, আমার নবী স্বয়ং এই বিয়ে করেননি, বরং আমার নির্দেশে করেছেন।

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.[৩১]

'অতঃপর যায়িদ যখন তার (যায়নাব) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে তাদের বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।'

এ আয়াতে তো উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ ঘটনার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তুমি যায়িদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে কর, তা কুরআনের কোথায় উল্লেখ আছে?

মহানবী (সা) বানূ নাদীর গোত্রের একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনা সংলগ্ন তাদের বসতি এলাকায় সৈন্য পরিচালনা করেন এবং অবরোধ চলাকালীন ইসলামী ফৌজ আশ-পাশের বাগানসমূহের অনেক গাছ-পালা কেটে ফেলেন যাতে আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিরুদ্ধবাদীরা অপপ্রচার চালায় যে, বাগানসমূহ বিরান করে এবং ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলে মুসলিমরা যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন :[৩২]

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ.

---

৩১. সূরা আল-আহযাব-৩৭

৩২. সূরা আল-হাশর-৫

'তোমরা খেজুর গাছগুলো কেটেছো এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছো– তা তো আল্লাহ তা'আলারই অনুমতিক্রমে।"

এই অনুমতি কুরআন মাজীদের কোন আয়াতে নাযিল হয়েছিল– তা কি কেউ বলতে পারে?

বদরের যুদ্ধ শেষে গনীমতের মাল বন্টনের প্রশ্ন দেখা দিলে সূরা আল-আনফাল নাযিল হয় এবং তাতে গোটা যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এ পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন সেই সময় থেকে যখন মহানবী (সা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে যান এবং এ প্রসঙ্গে মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেন :[৩৩]

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ.

'এবং আল্লাহ যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে– দুই দলের (ব্যবসায়ী কাফিলা এবং কুরাইশ বাহিনী) একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি (অর্থাৎ ব্যবসায়ী কাফিলা) তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।" এখন আমরা সমগ্র কুরআন মাজীদ থেকে এমন কোন আয়াতের উল্লেখ করতে পারবো না যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মদীনা থেকে বদরের যে অভিযাত্রীগণ! আমি দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেব।

বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন :[৩৪]

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

'তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন

৩৩. সূরা আল-আনফাল-৭

৩৪. প্রাগুক্ত-৯

তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন– আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য একাধারে এক হাজার ফেরেশতা পাঠাবো।'

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের দু'আর এই উত্তর কুরআন মাজীদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তা অন্যভাবে রাসূলে কারীমের (সা) নিকট এসেছিল।[৩৫]

কুরআনে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থ একই সময় একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি, বরং তা বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে। (বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬; আল ফুরকান ঃ ৩২) অপরদিকে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, তা সুসংবদ্ধ করে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ - فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ -

"এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।" (সূরা আল-কিয়ামাহ ঃ ১৭-১৮)

এ থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাস সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার অধীনে হয়েছে, মহানবী (সা) নিজের মর্জি মাফিক তার বিন্যাস করেননি। এখন কেউ কি কুরআন মাজীদ থেকে এমন কোন নির্দেশ বের করে দেখাতে পারবে যে, এর সূরাসমূহ বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী পড়তে হবে এবং এর বিভিন্ন আয়াতসমূহকে কোথায় কোন্ প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে? যদি কুরআন মাজীদে এ ধরনের কোন হিদায়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের কোন হুকুম তাতে নেই, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে কুরআন বহির্ভূত কিছু নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (সা) লাভ করে থাকবেন যার অধীনে তিনি এই পবিত্র গ্রন্থ বর্তমান বিন্যাসে পাঠ করেছেন এবং সাহাবীদেরকে পড়িয়েছেন। উপরন্তু সূরা আল-কিয়ামায় (আয়াত-১৯) এও বলেছেন ঃ

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ "অতঃপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব।"

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বিধিবিধান ও শিক্ষার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মহানবী (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে দান করতেন তা তাঁর নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না, বরং যেই মহান সত্তা তাঁর উপর কুরআন নাযিল করতেন,

৩৫. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-১০৩-১০৯

তিনি তাঁকে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন এবং এর যেসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দানের প্রয়োজন ছিল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতেন। কুরআনের উপর ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তিই তা মানতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না।

কুরআন আমাদের বলে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবীর (সা) উপর শুধুমাত্র কুরআনই নাযিল হয়নি, বরং আরো কিছু নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :[৩৬]

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

'আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ্ নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

অনুরূপ বিষয়বস্তুর আয়াত সূরা আল-বাকারায়ও রয়েছে। যেমন :[৩৭]

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ.

'এবং তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমতসমূহের এবং তিনি তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমাত থেকে যা নাযিল করেছেন, যার সাহায্যে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন।'

এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সূরা আল আহযাবে, সেখানে মহানবীর (সা) স্ত্রীগণকে উপদেশ দান করা হয়েছে :[৩৮]

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ.

'আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা ঘরসমূহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবীর (সা) উপর কিতাব ছাড়াও একটি জিনিস "হিকমাহ্"ও নাযিল করা হয়েছিল যার শিক্ষা তিনি লোকদের দান করতেন।

এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, মহানবী (সা) যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে কুরআন মাজীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করতেন এবং

৩৬. সূরা আন-নিসা-১১৩

৩৭. সূরা আল-বাকারা-২৩১

৩৮. সূরা আল-আহযাব-৩৪

নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশের দায়িত্ব পালন করতেন তা শুধুমাত্র তাঁর স্বাধীন ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং তাও আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর নাযিল করেন। অনন্তর তা এমন কোন জিনিস ছিল যা স্বয়ং তিনিই ব্যবহার করতেন না, বরং লোকদের শিক্ষা দিতেন। তবে এই শেখানোর কাজ কথার আকারেও হতে পারে কিংবা বাস্তব কর্মের আকারেও হতে পারে। তাই উম্মাহ মহানবীর (সা) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দুটি জিনিস লাভ করেছিল; একটি কিতাব এবং দ্বিতীয়টি হিকমাহ (কর্মকৌশল)। আর এই হিকমাহ্ তারা লাভ করেছে তাঁর বাণীসমূহের আকারেও এবং কার্যাবলীর আকারেও।

কুরআন মাজীদে আরো একটি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছে যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কিতাবের সাথে নাযিল করেছেন :[৩৯]

اَللّٰهُ الَّذِىْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ.

'আল্লাহ-ই নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব ও মীযান (তুলাদণ্ড)।'

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.[৪০]

'নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সংগে কিতাব ও মীযান (তুলাদণ্ড) দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।'

এই মীযান (তুলাদণ্ড) যা কিতাবের সাথে নাযিল করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবেই দাড়িপাল্লা নয়, বরং এর দ্বারা এমন কোন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত অনুযায়ী মানবীয় জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, তার বিকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে দেয় এবং বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা দূরীভূত করে মানব চরিত, আচার-আচরণ ও আদান-প্রদানকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করে। কিতাবের সাথে এই জিনিস নবী-রাসূলগণের উপর নাযিল করার পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শনের এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যার সাহায্যে তাঁরা আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এই কাজ তাদের

---

৩৯. সূরা আশ-শূ'আরা'-১৭
৪০. সূরা আল-হাদীদ-২৫

ব্যক্তিগত ইজতিহাদী ক্ষমতা ও রায়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত তুলাদণ্ডের সাহায্যে মেপে মেপে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন যে, মানব জীবনের বিভিন্ন উপাদানের কোন অংশের কত ওজন হওয়া উচিত।

কুরআন মাজীদ একটি তৃতীয় জিনিসের খবর দেয় যা কিতাবের অতিরিক্ত নাযিল করা হয়েছে :[৪১]

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا.

'অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যা আমি নাযিল করেছি।'

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ أُنْزِلَ مَعَهٗٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.[৪২]

'অতএব যারা এই রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।'

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ، يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ.[৪৩]

'আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের নিকট এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসে গেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন।'

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তা ছিল কিতাব থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস, যেমন তৃতীয় আয়াতের শব্দসমূহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে। এই নূরও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করা হয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মহানবীকে (সা) যে জ্ঞান, বুদ্ধিবিবেক, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি জীবনের চলার পথসমূহের মধ্যে সঠিক ও ভ্রান্ত

---

৪১. সূরা আত-তাগাবুন-৮

৪২. সূরা আল-আ'রাফ-১৫৭

৪৩. সূরা আল-মায়িদা-১৫-১৬

পথ চিহ্নিত করেছেন, জীবনের সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন এবং যার আলোকে কাজ করে তিনি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং আইন ও রাজনীতির জগতে মহান বিপ্লব সাধন করেছেন– এই নূর বলতে স্পষ্টতই সেই সব শক্তিকেই বুঝায়। এটা কারো ব্যক্তিগত কাজ ছিল না যে, সে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে নিজের বুঝ অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে থাকবে। বরং এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার সেই মহান প্রতিনিধির কাজ যিনি কিতাব লাভের সাথে সাথে সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার নূরও লাভ করেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদ যখন আমাদেরকে অন্যসব জিনিস ত্যাগ করে শুধুমাত্র مَـا أَنْـزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)-এর অনুসরণের নির্দেশ দেয় তখন এর অর্থ কেবলমাত্র কুরআনেরই অনুসরণ বুঝায় না, বরং সেই নূর, হিকমাহ ও মীযানেরও অনুসরণ করা বুঝায় যা কুরআনের সাথে মহানবীর (সা) জীবনাচার, নৈতিকতা, কাজ ও কর্মের মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল। আর কুরআন মাজীদে যেখানে 'নাযিল করা'-র সাথে 'কিতাব' অথবা 'যিক্‌র' অথবা 'কুরআন' ইত্যাদি শব্দ এসেছে কেবলমাত্র সেখানে مَـا أَنْـزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন)-এর দ্বারা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে।[৪৪]

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্যতা

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত আল-কুরআনের মাধ্যমে শরী'আতের বিধি-বিধান লাভ করতেন। অনেক সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হতো সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে। যেমন ছালাতের বিষয়টি। কুরআনে এ সম্পর্কিত হুকুম ছিল সংক্ষিপ্ত। রাক্‌'আতের সংখ্যা, অবস্থা, সময় ইত্যাদি বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা ছিল না। তেমনি যাকাতের হুকুমও ছিল সাধারণভাবে। কি পরিমাণ অর্থে যাকাত ফরয হবে তার কোন ব্যাখ্যা ছিল না, ছিল না অন্যান্য শর্তের কথা। এ ধরনের বহু হুকুম এমন ছিল যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া তার উপর আমল করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) অবশ্যই রাসূলুল্লাহর (সা) শরণাপন্ন হতে হয়েছে। তেমনিভাবে এমন বহু ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ছিল কুরআন সে বিষয়ে কিছু বলেনি। সে বিষয়ে বিধান জানার জন্য

৪৪. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-১১৭-১২০

রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যেতে হয়েছে। কারণ, তিনি তো তাঁর রবের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাতা হিসেবে এসেছেন। সুতরাং তিনিই ভালো জানেন আল্লাহর শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলী, সীমা-সরহদ, পদ্ধতি ও লক্ষ্যসমূহ ইত্যাদি। নিম্নে কুরআন ও হাদীছের আলোকে অতি সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরা হলো:

১। কুরআনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) দায়িত্ব ছিল ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের। আল্লাহ বলেন :[৪৫]

وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"এবং আমরা তোমার উপর এই যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি– যাতে তুমি লোকদের তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার। যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা করে।"

২। মানুষ যখন কুরআনের মর্ম ও ভাবের ব্যাপারে মতপার্থক্যের সৃষ্টি করবে তখন তিনি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করবেন।

আল্লাহ বলেন :[৪৬]

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"আমরা তো তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।"

৩। পারস্পরিক মতবিরোধের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত, মত ও ব্যাখ্যা মানুষের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন :[৪৭]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ

৪৫. সূরা আন-নাহল-৪৪

৪৬. প্রাগুক্ত-৬৪

৪৭. সূরা আন-নিসা'-৬৫

يَجِدُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক মতবিরোধের মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে সে সম্পর্কে নিজেদের মনে দ্বিধা অনুভব না করে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"

এ আয়াত তাঁকে এমন একজন বিচারপতি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, যাঁর নিকট মীমাংসার জন্য রুজু হওয়া এবং যাঁর সিদ্ধান্ত শুধু বাহ্যত নয়, বরং আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ঈমানের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

৪। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেছেন যে, রাসূল (সা) যাতে মানুষকে তাদের দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে পারেন সে জন্য তাঁকে আল-কুরআন ও আল-হিকমাহ্ দান করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন :[৪৮]

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"

জামহূর 'আলিম ও কুরআন বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত হিকমাহ হলো কিতাব তথা কুরআন থেকে ভিন্ন একটি জিনিস। আর তা হলো আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) দীনের যে সকল গোপন বিষয় ও শরী'আতের বিধি-বিধান অবহিত করেছেন তাই। আর 'আলিমগণ তাকে আস-সুন্নাহ্ বলে অভিহিত করে থাকেন। ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) বলেন :[৪৯]

فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من

৪৮. সূরা আলে 'ইমরান-১৬৪

৪৯. আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা-৫০

أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذُكر وأُتْبِعتْه الحكمةُ وذكر اللّهُ مَنَّتَه على خلقه بتعليم الكتاب والحكمة، فلم يجز- والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع الكتاب، وأن افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقولٍ فُرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله لما وصفناه من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به.

"আল্লাহ "আল-কিতাব" উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো আল-কুরআন, তিনি "আল-হিকমাহ্" উল্লেখ করেছেন। আমি শ্রেষ্ঠ আল-কুরআন বিশেষজ্ঞদের বলতে শুনেছি, আল-হিকমাহ্ হলো রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ। আমি যা বললাম- আল্লাহই ভালো জানেন- তাঁরা যা বলেন, তারই কাছাকাছি কথা। কারণ, আল-কুরআন উল্লেখের পরই আল-হিকমাহ্ এসেছে। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে আল-কিতাব ও আল-হিকমাহ্ শিক্ষা দানের অনুগ্রহের কথা বলেছেন। সুতরাং এখানে আল-হিকমাহ্ অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু বলা সঙ্গত হবে না। কারণ, আল-হিকমাহ্ শব্দটি আল-কিতাবের সাথে সংযুক্তভাবে এসেছে। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ফরয করেছেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা অপরিহার্য করেছেন। সুতরাং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সা) ফরয হওয়ার কথা ছাড়া আর কোন কিছু বলা সঙ্গত হবে না। যেমন আমরা বলেছি, আল্লাহ তাঁর উপর ঈমান আনার সাথে তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের কথাও বলেছেন।"

ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) আয়াতে উল্লেখিত আল-হিকমাহ্ দ্বারা যে সুন্নাহ বুঝায় সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কারণ, আল্লাহ আল-হিকমাহ্কে আল-কিতাবের উপর 'আত্ফ অর্থাৎ সংযোগ অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত করেছেন। ফলে দু'টি যে ভিন্ন জিনিস তা বুঝা যায়। আর তা কেবল সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দানের যে অনুগ্রহের কথা বলেছেন, তার মধ্যে সুন্নাহও একটি। আর সত্য ও সঠিক জিনিস ছাড়া আল্লাহর

অনুগ্রহ হতে পারে না। সুতরাং আল-কুরআনের মত সুন্নাহর আনুগত্য-অনুসরণও ওয়াজিব। আমাদের ওপর কেবল আল-কুরআন ও রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ ওয়াজিব। অতএব একথা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হিকমাহ্ হলো আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল কথা ও সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাই।

৫। ব্যাপারটি যখন এরূপ, তখন রাসূলকে (সা) যে আল-কুরআন ও সেই সাথে অন্য যে জিনিসটি দান করা হয়েছে তার আনুগত্য ওয়াজিব। আল-কুরআনে রাসূলের (সা) পরিচয় দিতে গিয়ে সে কথা স্পষ্টভাবে এসেছে এভাবে :[৫০]

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

"সে (নবী) তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ করতে নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ বৈধ করে এবং কলুষ জিনিসসমূহ নিষিদ্ধ করে।"

যেহেতু আয়াতে উল্লেখিত শব্দসমূহ عام বা ব্যাপক অর্থবোধক সেহেতু হারাম-হালালের গণ্ডিও হবে ব্যাপক। এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, তাঁকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন এবং তাতে তাঁর ক্ষমতাকে শুধুমাত্র কুরআনিক বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পর্যন্ত সীমিত করার কোন শর্ত নেই। আর এ কথারই প্রতিধ্বনি করে হযরত মিকদাদ ইবন মা'দিকারাব (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছটি। তিনি বলেন :[৫১]

ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه.

– তোমরা জেনে রাখ, আমাকে আল-কিতাবের অনুরূপ আরেকটি জিনিস দেয়া হয়েছে।"

৭। আল্লাহ বলেন :[৫২]

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক।"

---

৫০. সূরা আল-আ'রাফ-১৫৭

৫১. জালাল উদ্দীন আস-সূয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ ফী আল-ইহতিজাজ বিস সুন্নাহ-১১

৫২. সূরা আল-হাশর-৭

এ আয়াতেও এমন কোন শর্ত নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, তিনি কুরআনের আয়াতের আকারে যা কিছু দেন কেবল তাই গ্রহণ কর।

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্যের কথা এসেছে। যেমন :

৮। وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ.[৫৩]

"আমরা রাসূল এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"

৯। وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.[৫৪]

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে– সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে।"

১০। اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا.[৫৫]

"তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সৎপথ পাবে।"

১১। اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয় এবং এখানেও এমন কোন ইঙ্গিত মোটেই নেই যে, তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশ কুরআনের আয়াতের আকারে দেবেন, কেবল সেই সব নির্দেশেরই আনুগত্য করতে হবে।

১২। আল্লাহ্ বলেন :[৫৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে।" এ আয়াতে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দানের জন্য মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

৫৩. সূরা আন-নিসা'-৬৪

৫৪. প্রাগুক্ত-৮০

৫৫. সূরা আন-নূর-৫৪

৫৬. সূরা আলে 'ইমরান-১৩২

৫৭. সূরা আল-আনফাল-২৪

১৩। আল্লাহ বলেন :[৫৮]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

"বল (হে রাসূল), 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন "فَاتَّبِعُوْا كِتَابَ اللّٰه"-এর পরিবর্তে "فاتبعونى" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বলে গণ্য করা হয়েছে।

১৪। রাসূলে কারীমের (সা) আদেশ অমান্য বা তাঁর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এভাবে :[৫৯]

لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করবে না; তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি।"

১৫। মু'মিনদেরকে রাসূলের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধাচরণের মোটেই সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হয়নি।

আল্লাহ বলেন :[৬০]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا.

---

৫৮. সূরা আলে 'ইমরান-৩১

৫৯. সূরা আন-নূর-৬৩

৬০. সূরা আল-আহযাব-৩৬

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"

১৬। রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকাকালে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়া ঈমানের অনুষঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে :[৬১]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ. إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত কোন ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ইমাম ইবন কায়্যিম আল-জাওযী (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :[৬২]

فإذا جعل (اللّه) من لوازم الإيمان أنهم لايذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ماجاء به على أنه أذن فيه."

"মু'মিনগণ রাসূলের সংগে থাকাকালে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়াকে যখন

৬১. সূরা আন-নূর-৬২

৬২. ইবন কায়্যিম, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৪৯

ঈমানের অনুষঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন ঈমানের অনুষঙ্গ হওয়ার জন্য এটা আরো বেশি উপযুক্ত যে, তারা রাসূলের অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বা মতবাদের দিকে যাবে না, আর তাঁর অনুমতি জানা যাবে তিনি যা নিয়ে এসেছেন এবং তাতে দেয়া তাঁর অনুমতির ভিত্তিতে।"

১৭। আল্লাহ বলেন :[৬৩]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হবে না এবং আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল তার সাথে সেভাবে উঁচুস্বরে কথা বলবে না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কায়্যিম (রহ) বলেন : "রাসূল না বলা পর্যন্ত তোমরা বলবে না, নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নির্দেশ দেবে না, ফাতওয়া না দেয়া পর্যন্ত ফাতওয়া দেবে না, তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।" 'আলী ইবনে আবী তালহা ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন : لاتقولوا خلاف الكتاب والسنة. -

"কিতাব ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কথা বলবে না।" আল-'আওফী ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

نهوا أن يتكلموا بين يدى كلامه.

"তাঁর (রাসূল) কথার আগে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।" আয়াতের মূল কথা হলো, রাসূল (সা) কোন কথা বলা অথবা কোন কাজ করার আগে তোমরা তাড়াহুড়ো করে কোন কথা বলবে না অথবা কোন কাজ করবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন কায়্যিম (রহ) বলেন :

---

৬৩. সূরা আল-হুজুরাত-১-২

فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ودفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟

"যখন রাসূলের কণ্ঠস্বরের চেয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা তাঁদের কর্ম নিষ্ফল হওয়ার কারণ তখন তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার বিপরীত ও অতিরিক্ত মতামত, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি, স্বাদ-আহ্লাদ ও জ্ঞান-গরিমার অবস্থা কেমন হবে? এগুলো কি তাঁদের কর্ম নিষ্ফল হওয়ার জন্য অধিক উপযোগী নয়?"[৬৪]

উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং এ রকম আরো বহু আয়াতের কারণে সাহাবায়ে কিরামের (রা) জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য ছিল। তিনি তাঁদের নিকট কুরআনের আহ্কাম ব্যাখ্যা করতেন, জটিল বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর করতেন, তাঁদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। সাহাবায়ে কিরামও রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধের সীমা যথাযথভাবে মেনে চলতেন এবং তাঁদের জানা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত কাজ ছাড়া তাঁর সকল কাজ, ইবাদাত ও আচরণ হুবহু অনুসরণ করতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) এই আদেশ : صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ – মেনে ছালাতের হুকুম-আহকাম, আরকান ও সার্বিক অবস্থা রাসূলুল্লাহর (সা) ছালাত থেকে গ্রহণ করতেন। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ : خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ – অনুসারে তাঁরা হজ্জের বিধি-বিধান ও নিয়ম-রীতি তাঁর থেকেই গ্রহণ করেন। তিনি যখন জানতেন কোন সাহাবী তাঁকে কোন কাজে অনুসরণ করছেন না তখন অসন্তুষ্ট হতেন। যেমন, একবার একজন সাহাবী ছাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার ব্যাপারে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) উক্ত মহিলাকে জানান যে, রাসূল (সা) ছাওম অবস্থায় তাঁর বেগমদের চুমু দেন। মহিলাটি ফিরে গিয়ে তাঁর স্বামীকে বিষয়টি অবহিত করেন। স্বামী মন্তব্য করেন :

لَسْتُ مِثْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ، يُحِلُّ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ مَا يَشَاءُ ـ

---

৬৪. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-৪৯

– "আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সমকক্ষ নই। আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যা ইচ্ছা হালাল করতে পারেন।"

কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেল। তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন :

إنى أتقاكم الله وأعلمكم بحدوده -

"আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তাঁর বিধি-বিধানের সীমা-সরহদসমূহও তোমাদের চেয়ে বেশি জানি।"

তেমনি তিনি যখন সাহাবায়ে কিরামকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মাথা ন্যাড়া করতে ও ইহরাম ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা তা করলেন না তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই যখন দ্রুত ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা)ও দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করে হালাল হয়ে যান।

একথাও জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলকে (সা) যা করতে দেখতেন তাই করতেন, যা বর্জন করতে দেখতেন, বর্জন করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এই করা বা না করার কারণ বা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানা প্রয়োজন মনে করতেন না। ইমাম আল-বুখারী (রহ) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সোনার আংটি ধারণ করেন, তা দেখে লোকেরাও সোনার আংটি ধারণ করে। অতঃপর তিনি তা খুলে ফেলে বলেন : 'আমি আর কখনো এটি পরবো না।' লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে।

কাজী 'আয়াদ তাঁর (الشفاء) গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সংগে ছালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ সে অবস্থায় জুতো খুলে বাম পাশে রেখে দেন। তা দেখে সাহাবীগণও তাঁদের জুতো খুলে ফেলেন। ছালাত শেষ করে রাসূল (সা) বলেন : তোমরা জুতো খুললে কেন? তাঁরা বললেন : আমরা আপনাকে জুতো খুলতে দেখেছি তাই আমরাও খুলেছি। তিনি বললেন : জিবরীল আমাকে অবহিত করেন যে, আমার জুতো জোড়ায় নাপাকি আছে।[৬৫]

ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমদের সংগে যুহরের ছালাত দু'রাক'আত আদায় করেন। তারপর তাঁকে আল-মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করার নির্দেশ দান করা হয়। তিনি সে দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং মুসলিমদের সকলে তাঁর সাথে ঘুরে যান।[৬৬]

---

৬৫. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৪

৬৬. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত-২/৭

সাহাবায়ে কিরাম (রা) কেবল পরকালীন বিষয়ের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মানতেন তাই নয়, বরং পার্থিব বিষয়েও তাঁর আদেশ একই রকম মানতেন। যেমন ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এক জুম'আর দিনে তিনি মাসজিদে আসলেন। তিনি যখন দরজায়, দেখলেন রাসূল (সা) খুতবা দিচ্ছেন। তাঁর কানে ভেসে এলো রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ (।اجلسوا।) –'তোমরা সকলে বসে পড়।' এ আদেশ কানে যেতেই তিনি মাসজিদের দরজায় বসে পড়েন। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি ডাক দেন :

تعال يا عبد الله بن مسعود - 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ! চলে এসো।[৬৭]

রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) এমনই ছিলেন। তাঁর সকল কথা, কাজ ও নিরব সমর্থনকে শর'ঈ বিধান বলে মানতেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত ছিল না। তাঁদের কেউই কুরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকে সঙ্গত মনে করতেন না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন না।

তবে পার্থিব কোন বিষয়ে রাসূলের (সা) স্বীয় চিন্তাপ্রসূত কোন কথা বা কাজ হলে তাঁরা মত পার্থক্য করতেন। যেমন, বদর যুদ্ধের সময় আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির (রা) শিবির স্থাপনের স্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তেমনিভাবে কোন দীনী বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা আসার পূর্বে রাসূলে কারীমের (সা) চিন্তা-অনুধ্যানপ্রসূত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তাঁরা দ্বিমত পোষণ করতেন। যেমন করেছিলেন 'উমার (রা) বদর যুদ্ধে বন্দীদের ও হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে। আর সাহাবায়ে কিরাম যদি বুঝতে পারতেন, কোন কাজ রাসূলে কারীমের (সা) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তাহলে তাঁরা তা অনুসরণ করতেন না। অথবা তাঁরা যদি বুঝতেন রাসূলের (সা) কোন আদেশ করা বা না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার তাহলে তাঁদের অনেকে তা অনুসরণ করতেন না। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলে কারীমের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ ওয়াজিব

রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় কুরআনের নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কিরামের (রা) উপর তাঁর ইত্তেবা' ও অনুসরণ যেমন ওয়াজিব ঠিক তেমনিভাবে তাঁর ওফাতের পর মুসলিমদের উপর তাঁর সুন্নাহর অনুসরণও ওয়াজিব। সাধারণভাবে

---

৬৭. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৪

যে সকল আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য-অনুসরণ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, তা তাঁর জীবনকালকে সীমিত করে না। তেমনিভাবে কেবল সাহাবায়ে কিরামের (সা) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্তও বুঝা যায় না, বরং পরবর্তী কালের মুসলিমদেরও সন্নিবেশ করে। কারণ, আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার যে মৌল কারণ তা সর্বকালের মানুষকে সন্নিবেশ করে। আর তা হলো, সব যুগের মুসলিমই হলো এমন রাসূলের অনুসারী যাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন, তেমনিভাবে যে কারণে তাঁর আনুগত্য করতে হবে তা তাঁর জীবন কালের মত ওফাতের পরেও বিদ্যমান। যেহেতু তাঁর কথা, কাজ ও আদেশ-নিষেধ এসেছে একজন নিষ্পাপ বিধানদাতা থেকে, যাঁর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং তাঁর জীবনকাল ও ওফাতের পরের কালের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

কুরআন মাজীদ সাক্ষী যে, তা (কুরআন) স্বয়ং একটি বিশেষ যুগে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও যেমন একটি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী নির্দেশনামা, অনুরূপভাবে তার বাহক রাসূলও একটি সমাজে কয়েক বছর যাবত রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও গোটা মানব জাতির জন্য আজ পর্যন্ত এবং অনাগত কাল পর্যন্ত পথপ্রদর্শক। যেভাবে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে :[৬৮]

وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ.

"এই কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে– যাতে আমি এর সাহায্যে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।"

ঠিক তদ্রূপভাবে কুরআনের বাহক রাসূল (সা) সম্পর্কেও বলা হয়েছে :[৬৯]

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

"(হে মুহাম্মাদ) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।"

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا.[৭০]

"আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"

---

৬৮. সূরা আল-আন'আম-১৯

৬৯. সূরা আল-আ'রাফ-৫৮

৭০. সূরা আন-নিসা'-২৮

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.[৭১]

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের শেষ।"

এদিক থেকে কুরআন ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পথ নির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি সাময়িক ও সীমিত হয় তবে উভয়ই হবে, যদি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয় তবে উভয়ই হবে। আমরা সবাই জানি ৬১০ খ্রীস্টাব্দে কুরআন নাযিল শুরু হয় এবং ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তার নাযিলের ধারাবাহিকতা শেষ হয়। আমরা আরো জানি যে, এই কুরআনের সম্বোধনকৃত লোক ছিল তৎকালীন আরব জাতি এবং তাদের অবস্থা সামনে রেখে তাতে পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কিসের ভিত্তিতে এই পথ নির্দেশকে সর্বকালের জন্য এবং আগত-অনাগত গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াতের উৎস বলে স্বীকৃতি দেই? এই প্রশ্নের যে উত্তর হতে পারে, নিম্নোক্ত প্রশ্নেরও ঠিক একই উত্তর হবে যে, এক ব্যক্তির নবুওয়াতী জীবন যা সপ্তম শতকে মাত্র ২৩টি বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বকালের জন্য এবং গোটা মানব জাতির জন্য কিভাবে পথ নির্দেশের মাধ্যম হতে পারে? যারা কেবল কুরআনের সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের মধ্যে কিসের ভিত্তিতে পার্থক্য করে? কোন্ যুক্তিতে তারা কুরআনের পথ নির্দেশ সাধারণ বা ব্যাপক এবং রাসূলের পথ নির্দেশ সীমিত ও নির্দিষ্ট বলে?

রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকারী মুসলিমকে বিশেষতঃ মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকালে সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দেন। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী (রহ) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে :৭২

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال

---

৭১. সূরা আল-আহযাব-৪

৭২. ই'লাম আল-মুওয়াককি'ঈন-১/১৬২; আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-২/৭৭৩

أقضى بما فى كتاب الله، قال : فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال أجتهد برأئى لا آلوا. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাঁকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন : তোমার সামনে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার ফায়সালা করবে কিভাবে? বললেন : আল্লাহর কিতাবে যা কিছু আছে তার দ্বারা আমি ফায়সালা করবো। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়ে কিছু না থাকে? মু'আয (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর দ্বারা করবো। রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করেন : যদি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ্‌তেও কোন সমাধান না থাকে? মু'আয (রা) বললেন : তাহলে আমি আমার চিন্তা-অনুধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব এবং এ ব্যাপারে কোন রকম অলসতা করবো না। তাঁর এ জবাব শুনে রাসূল (সা) বলেন : সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছেন যাতে আল্লাহর রাসূল (সা) খুশী হন।"

রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পরও তাঁর সুন্নাহ্‌র উপর 'আমল করা যে ওয়াজিব তা এত বেশি সংখ্যক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে তার ভাব মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখানে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

١- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى.[৭৩]

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা শক্ত করে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার সুন্নাহ্।"

٢- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل أمتى يدخلون

---

৭৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (রহ)

الجنة إلا من أبى؛ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى.

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার উম্মাতের প্রত্যেকে জান্নাতে যাবে, তবে যে অস্বীকার করবে সে ছাড়া। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করবে? বললেন : যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই হবে আমাকে অস্বীকারকারী।"

'ইরবাদ ইবন সারিয়্যা (রা) বলেন : [৭৪]

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال : عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيا، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিলেন। তাতে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, আমাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হলো। অতঃপর বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন একজন বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কিছু অন্তিম কথা শোনান। বললেন : তোমরা অবশ্যই শুনবে ও আনুগত্য করবে– যদিও সে একজন হাবশী দাস হোক না কেন। তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে খুব শীঘ্র বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাহ্ এবং হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মত শক্তভাবে তা আঁকড়ে থাকবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সকল বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।"

---

৭৪. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৬

উপরোক্ত হাদীছে তিনি সেইসব লোকদের সম্পর্কে সতর্ক করেন যারা সুন্নাহ ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া মত-পথে চলবে। তিনি বলেন :[৭৫]

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

'তোমরা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'

তেমনিভাবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর পরে পৃথিবীতে কিছু অলস ও বিলাসী মানুষ আসবে যারা আমার সুন্নাহ অস্বীকার করবে। তিনি বলেন :[৭৬]

لاَ أُلْفَيَنَّ احدَكُمْ مُتَّكِئًا على أريكته يأتيه الأمْرُ من أمري مما أمرتُ به أو نَهَيْتُ عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا فى كتاب اللّه اتَّبَعْنَاهُ.

'রাসূল (সা) বলেন : আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহর কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করবো।'

মিকদাদ ইবন মা'দিকারাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ألايوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ماحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما حرم اللّه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ...الخ (ابو داود، ابن ماجه، حاكم)

"সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ আরো একটি জিনিস। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, প্রাচুর্যের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান কোন ব্যক্তি নিজের আরাম কেদারায় বসে বলবে, তোমরা কেবল কুরআনের অনুসরণ কর, তাতে যা কিছু হালাল পাবে তা হালাল মানবে এবং যা কিছু হারাম

---

৭৫. মুসনাদে আহমাদ-৪/১২৭; আবূ দাউদ-(৪৬০৭); তিরমিযী (২৬৭৬); ইবন মাজা (৪৩)
৭৬. আবূ দাউদ-(৪৬০৫); তিরমিযী-(২৬৬৩); মিফতাহুল জান্নাহ-১১, ২৫, ৫৪

পাবে তা হারাম মানবে। অথচ রাসূল যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা মূলতঃ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর সমান। সাবধান! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং নখরযুক্ত হিংস্র জন্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়।...

'ইরবাদ ইবন সারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

أيحسب أحدكم على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما فى القرآن، ألاو إنى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء أنها لمثل القرآن وأكثرو أن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن ولا ضرب نساءهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى عليهم - (ابو داود)

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি নিজের আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে একথা মনে করবে যে, কুরআনে যা কিছু হারাম করা হয়েছে তাছাড়া আল্লাহ অন্য কোন জিনিস হারাম করেননি? সাবধান! আল্লাহ্র কসম! আমি যেসব নির্দেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছি তাও কুরআনের অনুরূপ, অথবা তার অধিক। আহ্লি কিতাবদের বাড়ীতে তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ, তাদের স্ত্রীলোকদের মারধর করা এবং তারা তাদের উপর আরোপিত কর আদায় করার পরও তাদের গাছের ফল খাওয়া আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম-করেছেন।"

উপরোক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যকার একটি দল হাদীছ অগ্রাহ্য করবে এবং নিজেদের কেবল কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করবে। এর অন্তর্নিহিত কারণও উক্ত হাদীছে ইঙ্গিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঐসব লোক হবে বিলাসী ও দুনিয়াদার। এরা হাদীছে বর্ণিত ইসলামের বিস্তারিত আদেশ-নিষেধের পাবন্দী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বহাল রাখার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। কারণ কুরআনে মূল বিষয়গুলোই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, ব্যাখ্যা আসেনি।

সুন্নাহ্র এই অপরিসীম গুরুত্বের কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর প্রচার-প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাঁরা মনে করতেন এই সুন্নাহ তাঁদের নিকট

গচ্ছিত রাখা রাসূলুল্লাহর (সা) আমানাত। পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁদের। আর রাসূল (সা) তা পৌঁছানোর উৎসাহ দিয়েছেন এভাবে : [৭৭]

رحم الله امرًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع.

"আল্লাহ সেই লোকটির প্রতি দয়া করুন, যে আমার মুখের কথা শুনবে, অতঃপর যেরূপ শুনলো, সেরূপ বর্ণনা করলো। আমার বাণী যাদের নিকট পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা আমার মুখ থেকে শ্রবণকারীর চেয়েও অধিক ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হবে।"

শরী'আতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্ যারা অস্বীকার করে তাদের যুক্তিসমূহ

এক. আল্লাহ বলেন : [৭৮] مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.

"কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।"

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. [৭৯]

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।"

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং এরূপ আরো আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল-কুরআন তথা আল-কিতাব দীনের সকল বিষয়, সকল হুকুম-আহকাম ধারণ করেছে এবং এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে যে তা বুঝার জন্য সুন্নাহর মত কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আল-কিতাব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সবকিছুর বর্ণনাও সেখানে পাওয়া যাবে না। আর তা হবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ঘোষণার পরিপন্থী, যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং আল-কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহতে কোন কিছু তালাশ করা বা তার উপর 'আমল করার কোন প্রয়োজন

---

৭৭. মিফতাহুল জান্নাহ-৮

৭৮. সূরা আল-আন'আম-৩৮

৭৯. সূরা আন-নাহল-৮৯

নেই। কেবল কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মূলতঃ এ যুক্তি দ্বারা তারা সুন্নাহ অস্বীকার অথবা সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে।

জবাব : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :[৮০]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

"এবং (হে নবী)! এই যিক্‌র তোমার উপর নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পার যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে।"

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মহানবীর (সা) উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম-আহকাম ও পথ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দান করবেন। আর কোন কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সেই কিতাবের মূল পাঠ পড়ে শুনিয়ে দিলেই হয়ে যায় না, বরং ব্যাখ্যা দানকারী তার মূল পাঠের অধিক কিছু বলে থাকেন, যাতে শ্রোতা কিতাবের অর্থ পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। আর কিতাবের কোন বক্তব্য যদি কোন ব্যবহারিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে ভাষ্যকার ব্যবহারিক প্রদর্শনী করে বলে দেন যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এভাবে কাজ করা। তা না হলে কিতাবের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীকে কিতাবের মূল পাঠ শুনিয়ে দেয়াটা মকতবের কোন শিশুর নিকটও ব্যাখ্যা ও ভাষ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এই আয়াতের আলোকে মহানবী (সা) কুরআনের ভাষ্যকার কি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন, না আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভাষ্যকার নিয়োগ করেছিলেন? এখানে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কিতাবের তাৎপর্য তুলে ধরবেন। অতঃপর কিভাবে এটা সম্ভব যে, কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর পদমর্যাদাকে রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে পৃথক সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁর পৌঁছে দেয়া কুরআনকে গ্রহণ করে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হবে? এই অস্বীকৃতি কি সরাসরি রিসালাতের অস্বীকৃতির নামান্তর নয়?[৮১]

ইমাম আল-কুরতুবী (রহ)- مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ - আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :[৮২]

---

৮০. প্রাগুক্ত-৪৪

৮১. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-৬৮

৮২. আল-জামি' লি আহকাম আল-কুরআন-৬/৪২০

ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه فى القران، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الاجماع، أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب.

"কুরআনে নির্দেশনা ছাড়া দীনের কোন কিছু আমি বাদ দেইনি। সেই নির্দেশনা হয় ব্যাখ্যাসহ স্পষ্টভাবে, অথবা সংক্ষিপ্তভাবে– যার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যাবে রাসূল (সা) থেকে, অথবা ইজমা' বা কিয়াস থেকে– যা কিতাব দ্বারা প্রমাণিত।"

ইমাম শাফি'ঈ (রহ)ও উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় অনুরূপ কথা বলেছেন।[৮৩] নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারগণের কেউই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেননি যে, কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সুন্নাহর কোন প্রয়োজন নেই। বরং এমন কথা যারা বলে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

কুরআন কারীম দীনের মৌল নীতি ও সাধারণ বিধি-বিধানের ভিত্তিসমূহ ধারণ করেছে। তার কিছু স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, আর কিছুর ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন মানুষের নিকট তাদের দীনের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করার জন্য এবং তাদের উপর রাসূলের আনুগত্য ওয়াজিব করা হয়েছে, তাই তাঁর হুকুম-আহকামের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই শরী'আতে যাবতীয় বিধি-বিধান যা কুরআন-সুন্নাহ, এমনকি ইজমা'-কিয়াস থেকে উদ্ভূত, সবই আসলে কুরআন থেকে উৎসারিত। হয় প্রত্যক্ষ, না হয় পরোক্ষভাবে। সুতরাং কুরআন تبيانا لكل شئ হওয়া এবং সুন্নাহর হুজ্জাত বা দলীল হওয়ার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

অনেকে মনে করেন, مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ এ-الكتاب দ্বারা (اللوح المحفوظ) লাওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে। তাঁদের যুক্তি হলো সূরা আল-আন'আম মাক্কী সূরা। তখন কুরআনের সামান্য অংশই নাযিল হয়েছে। বহু সূরা, বহু আয়াত, বহু হুকুম-আহকাম, বহু মূলনীতি মদীনায় নাযিল হয়েছে এবং তার পরেই পূর্ণ হয়েছে। তাহলে মক্কায় নাযিল হওয়া এ আয়াতে কিতাব (الكتاب) দ্বারা আল-কুরআন হয় কি করে? কারণ তখনো তো কুরআনে অনেক কিছুই ছিল না। আল-কিতাব অর্থ 'লাওহে মাহফূয'।[৮৪]

---

৮৩. ইমাম আশ-শাফি'ঈ, আর রিসালা-৩৩

৮৪. শুবহাত হাওলাস সুন্নাহ-১/১৬

দ্বিতীয় আয়াত تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। সূরা আন-নাহল মাক্কী সূরা, আয়াতটি মাক্কী। তখনোও শরী'আতের বিধি-বিধানের অনেক কিছুই নাযিল হয়নি। তাহলে আয়াতের আল-কিতাব-এর অর্থ আল-কুরআন বলা সঙ্গত হয় কি করে?

তাছাড়া تِبْيَانًا كُلُّ شَيْئٍ দ্বারা শরী'আতের যাবতীয় শাখা-প্রশাখা জাতীয় আহকামের বিস্তারিত বিবরণ বুঝায় না; বরং এ দ্বারা বিশেষ অর্থও বুঝায়। যেমন আল্লাহ বলেন : [৮৫] تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا - 'আল্লাহর নির্দেশে এটি সবকিছু ধ্বংস করে দেবে।' এ আয়াতে ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা আল্লাহ 'আদ জাতি ও তাদের বাসস্থানসমূহ ধ্বংসের কথা বলেছেন। অথচ আয়াতে এসেছে كل شئ- সবকিছু। এখানে যেমন নির্দিষ্ট ও বিশেষ অর্থে كل شئ বলা হয়েছে, তেমনি আমাদের আলোচিত আয়াত দু'টিও ব্যাপক নয়, বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৬]

সাহাবায়ে কিরামের (রা) ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁরা ছিলেন ফসীহ তথা বিশুদ্ধ আরবী ভাষী, যেখানে পরবর্তীকালের 'আলিমগণের কুরআন ব্যাখ্যার জন্য আরো বহু সহায়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেখানে তাঁদের কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা বহু আয়াতে নবীর (সা) তাফসীরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। যেমন : (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) – এ আয়াতে ظلم (যুলমুন) অর্থ শিরক (شرك); (الخيط الأبيض والأسود) – সাদা ও কালো সূতা অর্থ দিনের ঔজ্জ্বল্য ও রাতের অন্ধকার; সিদরাতুল মুনতাহার নিকটবর্তী স্থানে দ্বিতীয়বার রাসূল (সা) যাঁকে দেখেন তিনি ছিলেন জিবরীল (আ); (أو يأتى بعض آيات ربك) – সেই (آيات) আয়াত হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া; ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة – এ আয়াতে (شجرة) গাছ অর্থ খেজুর গাছ;

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى حياة الدنيا وفى الآخرة. এ আয়াতে (الآخرة) আখিরাত অর্থ কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে– من ربك وما دينك؟ - তোমার রব কে এবং তোমার দীন কী? আহলি কিতাবগণ তাদের আহবার ও রুহবান-কে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করে– এর অর্থ তাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছিল তা তারা হালাল এবং যা হালাল করা হয়েছিল তা হারাম ঘোষণা করে, আর এই আহলি কিতাবগণ তাই অনুসরণ করে; (للذين

৮৫. সূরা আল-আহকাফ-২৫

৮৬. শুবহাত হাওলাস সুন্নাহ-১৪-১৫

(أحسنوا الحسنى وزيادة) - এখানে (زيادة) "যিয়াদা" অর্থ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এ ধরনের বহু আয়াত আছে যা কেবল আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকলেই জানা যাবে না। রাসূলে কারীম (সা) যদি তা বলে না যেতেন তাহলে আমরা অন্ধকারেই থেকে যেতাম।

সুতরাং সুন্নাহ হলো কুরআনের সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা। কুরআনে বলা হয়েছে :

أقيموا الصلوة واتوا الزكاة; كتب عليكم الصيام; আরো বলা হয়েছে- ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ইত্যাদি। নবী (সা) কথা ও কাজের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফারয। তিনি ছালাতের রাক'আত সংখ্যা, শর্ত ও রুকনসমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : (صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّىْ) - "তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ সেভাবে আদায় করবে।" তিনি আরো বলে দিয়েছেন, হায়েয (ঋতুবতী) অবস্থায় আদা ও কাযা কোনভাবেই ছালাত প্রযোজ্য নয়। এভাবে তিনি যাকাতের প্রকৃতি, কার ওপর ওয়াজিব, তার নিসাব কী এবং বস্তু ভেদে তার পরিমাণ কত ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এভাবে ছাওম ও হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি, কার্যাবলী বাস্তবে করে দেখিয়েছেন।

(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) - সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি সিকি দীনারের কম চুরি করলে হাতকাটা যাবে না এবং হাত কোথা থেকে কাটা হবে তাও সুন্নাহর মাধ্যমে জানতে পারি। সুতরাং সুন্নাহ ত্যাগ করলে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আমরা এ সকল বিধান জানতে পারতাম না। তাই কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সুন্নাহর সীমাহীন প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা ভালো করেই জানতেন। জাবির (রা) হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন :[৮৭]

و رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شئ عملنا به.

'রাসূল (সা) আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল, তিনি তার ব্যাখ্যাও জানতেন। তিনি যেটা যেভাবে আমল করতেন, আমরাও সেভাবে আমল করতাম।'

৮৭. সহীহ্ মুসলিম (১২১৮)

একবার ইবন 'উমার (রা) বললেন : রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা রাতে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেবে। একথা শুনে তাঁর ওয়াকিদ নামের এক ছেলে বললেন : তাহলে তারা তো এটা বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে। ছেলের মুখে এমন কথা শুনে ইবন 'উমার (রা) তার বুকে আঘাত করে বলেন : আমি রাসূলুল্লাহর কথা বলছি, আর তুমি "না" করছো?

একবার 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা) শাফা'আত (সুপারিশ) বিষয়ে আলোচনা করলেন। এক ব্যক্তি বললো : ওহে আবূ নাজীদ! আপনারা এমন সব হাদীছ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যার কোন ভিত্তি আমরা কুরআনে খুঁজে পাই না। 'ইমরান খুব রেগে গেলেন এবং লোকটিকে বললেন : তুমি কি কুরআন পড়েছো? বললো : হাঁ, পড়েছি। বললেন : তাতে কি ইশার নামায চার রাক'আত, মাগরিব তিন রাক'আত, ফজর দু'রাক'আত ও আসর চার রাক'আত পড়ার কথা পেয়েছো? বললো : না। 'ইমরান প্রশ্ন করলেন : তাহলে এগুলো কোথায় পেলে? তোমরা কি এসব কিছু আমাদের নিকট থেকে, আর আমরা রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করিনি? তোমরা কি কুরআনে কোথাও পেয়েছো যে, চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল, এতগুলো উটে এতটি উট এবং এত পরিমাণ দিরহামে এত দিরহাম যাকাত দিতে হবে? বললো : না। তাহলে এ বিষয়গুলো কার নিকট থেকে পেয়েছো? তোমরা কি আমাদের নিকট থেকে এবং আমরা রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে পাইনি? তোমরা আল্লাহকে তাঁর কিতাবে একথা বলতে শোননি :

وَمَا أٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

"রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" অবশেষে 'ইমরান বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বহু কিছু গ্রহণ করেছি যার জ্ঞান তোমাদের নেই।[৮৮]

আইউব আস-সিখতিয়ানী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আস-শিখ্খীরকে বললো : আপনারা আমাদের নিকট কুরআন ছাড়া আর কিছু বর্ণনা করবেন না। মুতাররিফ তাকে বললেন : আল্লাহর কসম! আমরা কুরআনের বিকল্প কিছু চাই না। তবে আমরা আমাদের চেয়ে কুরআন বিষয়ে বেশি জ্ঞানী যিনি তাঁকে চাই। অর্থাৎ তাঁর কথাই তোমাদের নিকট উপস্থাপন করতে চাই।[৮৯]

---

৮৮. জামি'উ বায়ান আল-'ইল্‌ম-২/১১৯; আল-মুসতাদরাক-১/১০৯; মিফতাহ আল-জান্নাহ-১১

৮৯. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-২/১১৯৩

তাই আল-আজিরী বলেন :[৯০]

جميع فرائض الله التى فرضها فى كتابه لا يعلم الحكم فيها الإ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الاسلام ودخل فى ملة الملحدين.

"আল্লাহর সকল ফারয যা তাঁর কিতাবে ফারয করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ব্যতীত তার যথাযথ বিধান জানা যাবে না। এ হলো মুসলিম 'আলিমদের কথা। যারা এছাড়া অন্য কিছু বলে তারা ইসলামী মিল্লাত থেকে বের হয়ে গেছে এবং অবিশ্বাসীদের দলে ঢুকে গেছে।"

ইবন হাযম বলেন :[৯১]

لو أن امرأً قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كافرًا باجماع الأمة، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للأكثر فى ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم.

"যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমরা কুরআনে যা কিছু পেয়েছি তাছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করবো না, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা' মতে সে কাফির হয়ে যাবে। তার উপর সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত শুধুমাত্র এক রাক'আত এবং ফজরের সময় আরেক রাক'আত ছালাত ফরয হবে। কারণ ছালাত শব্দ দ্বারা ন্যূনতম এটাই বুঝায়। এ ক্ষেত্রে বেশির কোন সীমা নেই। আর এমন কথা যে বলে সে কাফির, মুশরিক। তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ। আর এমন চিন্তা ও মতের অনুসারী হয়েছে চরমপন্থী রাফিজীরা, যাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা' হয়েছে।"

---

৯০. শুবহাত আল-কুরআনিয়্যীন-১/২০

৯১. আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-২/৮০

'আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন :[৯২]

إن من أنكر كون حديث النبى صلى اللّه عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف فى الأصول ـ حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء اللّه من فرق الكفرة.

"যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর হাদীছ– তা কথা হোক বা কাজ-এর হুজ্জাত বা দলীল হওয়াকে অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, উছূলের ক্ষেত্রে সে হাদীছ প্রসিদ্ধ হবে। সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। হাশরে সে ইহূদী, নাসারা অথবা আল্লাহ কাফিরদের যে উপদলের সাথে চান তাকে উঠাবেন।"

সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্রাণ্ড মুফতী মরহূম 'আল্লামা 'আবদুল 'আযীয ইবন বায (রহ) বলেন :[৯৩]

إن ما تفوّه به رشاد خليفة من انكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة فقد انكر الكتاب، وعن انكرهما أواحدهما فهو كافر بالاجماع، ولايجوز التعامل معه وأمثاله، بل يجب هجرة والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله فى كل مناسبة حتى يتوب إلى اللّه من ذلك معلنة فى الصحف السيارة، لقول اللّه عز وجل : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب، أولئك يلعنهم اللّه ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا او بيّنوا فأولئك أتوب عليهم ـ وأنا التواب الرحيم ـ (البقرة : ١٦٠-١٥٩)

---

৯২. মিফতাহ আল-জান্নাহ-১৪

৯৩. মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাও বি'আ-২/৪০৩

"রাশাদ খলীফা সুন্নাহ্‌র অস্বীকৃতিমূলক ও সুন্নাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই বলে যে মন্তব্য করেছেন তা কুফরী এবং ইসলাম পরিত্যাগমূলক কথা। কারণ, যে সুন্নাহ অস্বীকার করে সে কিতাব অস্বীকার করে। আর যে এ দুটি জিনিস অথবা এর যে কোন একটি অস্বীকার করে সে ইজমা'র ভিত্তিতে কাফির। তার সঙ্গে এবং তার মত অন্যদের সঙ্গে পারস্পরিক কোন রকম কাজ-কর্ম বৈধ নয়। প্রতিটি উপলক্ষে তাকে পরিহার করা, তার এই ফিতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, তার কুফরী ও পথভ্রষ্টতার কথা প্রচার করা ওয়াজিব। এ কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাওবা করে এবং পত্র-পত্রিকায় তাওবার ঘোষণা দেয়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নাত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে, আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরা তারাই যাদের তাওবা আমি কবুল করেছি। আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

তিনি আরো বলেন : 'সকল জ্ঞানী ব্যক্তির একথা জানা যে, ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি হলো সুন্নাহ। কিতাবুল্লাহর পরে ইসলামে সুন্নাহর স্থান দ্বিতীয়। সকল জ্ঞানী ব্যক্তির ইজমা' হয়েছে যে, কিতাবুল্লাহর পরে সুন্নাহই হলো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি এবং সমগ্র উম্মাতের উপর তা স্বতন্ত্র হুজ্জাত বা দলীল। কেউ যদি অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে অথবা উপেক্ষা করা সমীচীন মনে করে এবং কেবল কুরআনকেই যথেষ্টভাবে তাহলে সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হবে এবং এটা তার বড় ধরনের কুফরী কাজ হবে। সে তার এই কথার জন্য ইসলাম পরিত্যাগকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, সে তার এই কথা ও এই বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তাঁরা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মানতে অস্বীকার করে। সে অস্বীকার করে একটা বিশাল মূল ভিত্তিকে যার দিকে প্রত্যাবর্তন ও যার উপর নির্ভর করা এবং আঁকড়ে ধরা আল্লাহ ফারয করেছেন। সে মুসলিম উম্মাহর 'আলিমদের ইজমা'কেও মানতে অস্বীকার করে।"[৯৪]

ইমাম আশ-শাফি'ঈর (রহ) একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করতে চাই। তিনি বলেন :[৯৫]

---

৯৪. শুবহাত আল-কুরআনিয়্যীন-১/২৩

৯৫. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/১৪

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

"মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত (اجماع) হয়েছে যে, কেউ যদি স্পষ্টভাবে জানতে পারে যে, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ, তাহলে কোন মানুষের কথার ভিত্তিতে তা ত্যাগ করার অধিকার তার নেই।"

পরিশেষে তাদের উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে আমরা সংক্ষেপে নিম্নের কথাগুলো বলতে পারি :

১. কুরআন সুন্নাহর উপর আমল করতে বলেছে। সুতরাং সুন্নাহর উপর 'আমল অর্থই কুরআনের উপর আমল। প্রথম থেকে মুসলিম উম্মাহ এভাবে বুঝেছে। একবার বানূ আসাদের এক মহিলা আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) নিকট এসে বলেন :

يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشات والمتنمّصات والمتفلّجات للحُسْن المغيرات خلق الله.

"ওহে আবূ 'আবদির রহমান! আপনার সূত্রে আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, যে সকল মহিলা সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করে দেহে উল্কি আঁকে, আঁকায়, ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং কেটে দুই দাঁতের মাঝখানে ফাঁক করে তাদের আপনি অভিশাপ দেন।" 'আবদুল্লাহ বললেন : আল্লাহর রাসূল (সা) যাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং সে অভিশাপ দানের অনুমতি আল্লাহর কিতাবেও আছে, তাহলে আমি কেন তাকে অভিশাপ দেব না? মহিলা বললেন : আমার কাছে যে মাসহাফ আছে আমি তো তার মধ্যে এ রকম অনুমতি কোথাও পাইনে। 'আবদুল্লাহ বললেন : তুমি যদি ভালো করে কুরআন পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই পেতে। আল্লাহ তো বলেছেন :

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"[৯৬]

২. কুরআন مُجمل বা সংক্ষিপ্ত আর সুন্নাহ مفصل বা বিস্তারিত। পূর্বে উল্লেখিত

৯৬. আল-আমিদী, আল-মুওয়াফিকাত ফী উসূল আল-আহকাম-১৪; জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-২/১৮৮

'ইমরান ইবন হুসাইনের (রা) হাদীছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি সেই প্রশ্নকারী লোকটিকে বলেন : তুমি এক নির্বোধ। ছালাতুয যুহ্‌র যে চার রাক'আত এবং তাতে যে আস্তে কিরআত করতে হবে তুমি তা কুরআনের কোথায় পেয়েছো? তারপর তিনি যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদাতের কথা উল্লেখ করে লোকটির নিকট প্রশ্ন রাখেন : আল্লাহর কিতাবের কোথাও কি তুমি এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাবে? তারপর তিনি মন্তব্য করেন :

إن كتاب الله أبهم هذا وأن السنة تفسر ذلك.

"আল্লাহর কিতাব এসব বিষয় অস্পষ্ট রেখেছে এবং সুন্নাহ তার ব্যাখ্যা দিয়েছে।"[৯৭] তাই ইমাম আল-আওযা'ঈ (রহ) বলেন :

الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب.

"সুন্নাহ যতখানি কিতাবের (কুরআন) মুখাপেক্ষী কিতাব তার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী সুন্নাহর।" ইবন 'আবদিল বার বলেন, আল-আওযা'ঈ আসলে বলতে চেয়েছেন যে, সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা করে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলও বলেছেন :

إن السنة تفسر الكتاب وتبينه -

"সুন্নাহ কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।"[৯৮]

৩. কুরআন মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করার জন্য যে সকল বিধান দিয়েছে তা মূলনীতি পর্যায়ের। আর সুন্নাহ তা ব্যাখ্যা করে শাখা-প্রশাখা বের করেছে।

৪. কুরআন কখনো পরস্পর বিরোধী দুটি হুকুম দেয়। কোন একটি জিনিস দুটির সাথেই সামঞ্জস্যশীল পাওয়া যায়। সুন্নাহ সেখানে জিনিসটিকে যে কোন একটি হুকুমের অধীন করে দেয় অথবা সেই জিনিসটির ব্যাপারে এমন বিশেষ হুকুম দেয় যা দুটির সাথেই সামঞ্জস্যশীল হয়। আবার কখনো কুরআন কোন একটি কারণে কোন বিষয়ে একটি হুকুম দেয়, নবী (সা) কিয়াসের ভিত্তিতে ঐ কারণ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানেও একই হুকুম দিয়েছেন।

পরস্পর বিরোধী দুটি হুকুমের দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ طيبات (পবিত্র বস্তুসমূহ) হালাল এবং خبائث (অপবিত্র বস্তুসমূহ) হারাম করেছেন। কিন্তু কিছু জিনিস এমন আছে যা হালাল কি হারাম তা স্পষ্ট নয়। রাসূল (সা) সেই জিনিসটিকে যে কোন একটি হুকুমের অধীন করে দেন। যেমন, যে সকল হিংস্র জন্তু দাঁত দিয়ে এবং যে সকল পাখি পায়ের পাঞ্জা দিয়ে শিকার করে সেই সকল পশু-পাখির

৯৭. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-২/১৯১
৯৮. প্রাগুক্ত

গোশত খাওয়া রাসূল (সা) হারাম ঘোষণা করেন। তেমনিভাবে হারাম করেন গৃহপালিত গাধার গোশত। অন্যদিকে খরগোশ এবং অনুরূপ কিছু জন্তুকে طيبات এর অন্তর্ভুক্ত করেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, কুরআন মৃত পশু-পাখি হারাম ও আল্লাহর নামে যবেহ করা পশু-পাখি হালাল করেছে। কিন্তু যবেহ করা পশুর পেটের মৃত বাচ্চা কোন্ হুকুমের সাথে যুক্ত হবে তা স্পষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : "ذكاة الجنين ذكاة أمه."

"গর্ভস্থ বাচ্চার যবেহ-এর জন্য তার মায়ের যবেহ যথেষ্ট হবে।"[৯৯]

কিয়াসের দৃষ্টান্ত : কুরআন দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করা হারাম করেছে। তারপর কুরআনে এসেছে :[১০০]

وأحل لكم ماوراء ذلكم -

"উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) যে কারণে দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে তার উপর কিয়াস করে কোন নারী ও তার ফুফু-খালাকে এক সাথে বিয়ে করা হারাম করেন।

৫. কিছু সুন্নাহ এমন আছে যা কুরআনের কোন বিস্তারিত হুকুমের ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন আসলাম গোত্রের সুবায়'আ (রা) তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পনের দিন পর সন্তান প্রসব করেন এবং রাসূলকে অবহিত করেন। রাসূল (সা) বললেন, তোমার 'ইদ্দত শেষ হয়েছে, তুমি এখন হালাল হয়ে গেছ। মূলত তিনি একথা স্পষ্ট করেন যে, যে সকল নারী গর্ভবতী নয় আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী তাদের সাথে সম্পৃক্ত :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.[১০১]

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে।" আর নিম্নের আয়াতটি তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা গর্ভবতী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[১০২]

---

৯৯. আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

১০০. সূরা আন নিসা'-২৪

১০১. সূরা আল-বাকারা-২৩৪

১০২. সূরা আত-তালাক-৪

সুন্নাহর কিসসা-কাহিনী

সুন্নাহর মধ্যে বহু গল্প, প্রবাদবাক্য ও উপদেশ-নীতি কথা আছে। তার কিছু তো কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে এসেছে : যেমন কুরআনে এসেছে :[১০৩]

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. - "তোমরা সাজদাবনত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।" রাসূল (সা) বলেছেন : دَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. - "তারা নিতম্বে ভর দিয়ে নীচু হয়ে প্রবেশ করে।"

কুরআনে এসেছে :[১০৪]

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ.

"কিন্তু যারা অন্যায় করেছে তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বললো।" এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল (সা) বলেছেন :[১০৫]

"قالوا حبة فى شعرة". - "তারা বললো, ছড়ায় শস্যদানা দাও।"

হাদীছে অনেক কিসসা-কাহিনী আছে যা তাফসীর হিসেবে আসেনি, তাতে আকীদাগত কোন কথা বা আমলের কোন কিছুও নেই। সুতরাং কুরআনে এর কোন ভিত্তি থাকা জরুরী নয়। তা সত্ত্বেও কুরআনী কিসসা-কাহিনীর মত তা উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনমূলক বলে বিবেচিত হবে। অতএব তাও প্রথম প্রকারের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন : টাক, কুষ্ঠরোগী, অন্ধের কাহিনী, 'আবিদ জুরাইজ-এর হাদীছ, গুহায় আশ্রয় নেয়া তিন ব্যক্তির কিসসা ইত্যাদি।

তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এই বাণী :[১০৬]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

"আমিই যিক্‌র নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই তার সংরক্ষক।"

এ আয়াতে "যিক্‌র" অর্থ কুরআন। তাই এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ কুরআন হিফাযাতের দায়িত্ব নিয়েছেন, সুন্নাহর নয়। সুন্নাহও যদি কুরআনের মত হুজ্জাত বা প্রমাণ হতো তাহলে অবশ্যই তিনি হিফাযাতের যিম্মাদারী নিতেন।

---

১০৩. সূরা আল-বাকারা-৫৮

১০৪. প্রাগুক্ত-৫৯

১০৫. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৩৯৩

১০৬. সূরা আল-হিজর-৯

জবাব : আয়াতে আল্লাহ যে, "আয-যিক্‌র" সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছেন তা কেবল আল-কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে দীন ও শরী'আত পাঠিয়েছেন তাও এর উদ্দেশ্য। একথার সপক্ষে দলীল হলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এই বাণী :[১০৭]

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

এ আয়াতে (أهل الذكر)। অর্থ আল্লাহর দীন ও শরী'আত বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ যেভাবে কুরআন সংরক্ষণ করেছেন, সেভাবে সংরক্ষণ করেছেন তাঁর রাসূলের সুন্নাহও। তিনি এমন অসংখ্য অগণিত নিবেদিতপ্রাণ মানুষ তৈরী করেছেন যাঁরা তাঁদের বক্ষে ও স্মৃতিতে তাঁদের নবীর (সা) সুন্নাহ অত্যন্ত সততার সাথে সংরক্ষণ করেন, পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেন, নিজেদের মধ্যে পঠন-পাঠন জারী রাখেন, তার মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ভেজাল থেকে তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। এ কাজে তাঁরা তাঁদের জীবন বিলিয়ে দেন। তাঁরা তাঁদের নবীর সুন্নাহ সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যে শ্রম ও সাধনা নিয়োজিত করেন তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠী উপস্থাপন করতে পারেনি। অতঃপর এভাবে সকল সুন্নাহ গ্রন্থাবদ্ধ হয়।

হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ, বিশেষতঃ ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেন, সকল আলিমই মনে করেন, সুন্নাহ সবই বিদ্যমান আছে, কোন কিছুই হারিয়ে যায়নি। হতে পারে তা ব্যক্তি বিশেষের কাছে বেশি বা কম আছে। তবে তাদের সবগুলো একত্র করলে সবই সংরক্ষিত দেখা যায়। প্রত্যেকের সংরক্ষিত সুন্নাহ পৃথক করলে সকলের নিকটই তা ঘাটতি দেখা যাবে। সে ক্ষেত্রে একজনের নিকট যা নেই তা অন্যের নিকট পাওয়া যাবে।[১০৮]

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, ছালাত, যাকাত, হাজ্জ, ছাওম, পারস্পরিক আদান-প্রদান, আচরণ, আবশ্যকীয় কর্মকাণ্ডসমূহে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর কোন কিছুই হারিয়ে যায়নি এবং তাঁর জীবন-যাপন প্রণালী ও তাঁর বাণীর সবকিছুই লিখিত আকারে সংরক্ষিত আছে। যদিও তা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং তার মান ও মর্যাদার ভিন্নতাও আছে। ইবন হাযাম বলেন :

ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحى كله محفوظ يحفظ

১০৭. সূরা আন-নাহল-৪৩
১০৮. আর-রিসালা-৪৩

الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضع منه وأن لا يحرف منه شئ أبدًا تحريفًا لا يأتى البيان ببطلانه.

"ভাষা ও শরী'আত বিশেষজ্ঞদের এ ব্যাপারে কোন রকম মতবিরোধ নেই যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহী হিসেবে যা কিছু নাযিল হয়েছে সবই নাযিলকৃত যিক্‌র। আর ওহীর সবই নিশ্চিতভাবে আল্লাহর হিফাযাতে সংরক্ষিত। আর এটাও নিশ্চিত যে, আল্লাহ যা হিফাযাতের দায়িত্ব নিয়েছেন তার কোন কিছুই বিন্দুমাত্র বিনষ্ট অথবা বিকৃত হতে পারে না।"

তারপর ইবন হাযাম তাঁদের ধারণা খণ্ডন করেন যাঁরা বলেন, আয়াতে উল্লেখিত الذكر-এর অর্থ কেবলমাত্র আল-কুরআন। তিনি বলেন :

هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلادليل.

"যিক্‌র-এর অর্থ আল-কুরআন বলে নির্দিষ্ট করা কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া কেবলই একটি মিথ্যা দাবী।"... الذكر। এমন একটি বিশেষ্য যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর যা কিছু নাযিল করেছেন সবই বুঝায়। তার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি বিদ্যমান। কারণ, সুন্নাহর মাধ্যমে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। আর সেটিও ওহী। তাছাড়া আল্লাহ তো বলেছেন :

وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (نحل : ٤٤)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নবী (সা) কুরআন ব্যাখ্যার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। আর কুরআনে বহু مُجْمَل বা সংক্ষিপ্ত বিধান এসেছে। যেমন : ছালাত, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি বিষয়। এ আদেশগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কী তা আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাখ্যা ছাড়া জানতে পারি না। আর কুরআনের এ সকল مُجْمَل বিধানের রাসূল (সা) কর্তৃক ব্যাখ্যা যদি সংরক্ষিত ও নিরাপদ না থাকে তাহলে কুরআন দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য অসম্ভব হবে। এভাবে শরী'আতের অধিকাংশ বিধান অসারতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং الذكر। দ্বারা কেবল কুরআন অর্থ নেয়া শুদ্ধ ও সঠিক হবে না।[১০৯]

---

১০৯. আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-১/১২১

সুন্নাহ্র হিফাযাত কি আল্লাহ্ করেছেন?

এর উত্তরে আরেকটি পাল্টা প্রশ্ন করা যায় যে, কুরআন মাজীদের হিফাযাতের যে দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন গ্রহণ করেছেন তা কি তিনি সরাসরি হিফাযাত করছেন না মানুষের মাধ্যমে হিফাযাত করছেন? এর উত্তরে এছাড়া আর কিছুই বলা হবে না যে, তার হিফাযাতের জন্য মানুষকেই মাধ্যম বানানো হয়েছে। আর কার্যত তার হিফাযাত এভাবে হয়েছে যে, মহানবীর (সা) নিকট থেকে লোকেরা যে কুরআন লাভ করছিল তা সমসাময়িককালে হাজারো ব্যক্তি অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করে নেন, অতঃপর হাজার থেকে লাখ এবং লাখ থেকে কোটি কোটি মানুষ বংশ পরম্পরায় তা গ্রহণ করেছে এবং মুখস্থ করে আসছে। এমনকি কুরআনের কোন শব্দ দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, অথবা কখনো তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হওয়া এবং সাথে সাথে তা দৃষ্টিতে না পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে গেছে। হিফাযাতের এই অসাধারণ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য কোন পুস্তকের জন্য সম্ভবপর হয়নি এবং তা প্রমাণ করে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

অন্যদিকে সর্বকালের জন্য যে রাসূলকে গোটা দুনিয়াবাসীর রাসূল বানানো হয়েছিল এবং যাঁর পর নবুওয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডের হিফাযাতের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে করেছেন যে, মানব জাতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিগত কোন নবী, কোন পথ প্রদর্শক, নেতা, পরিচালক, বাদশাহ অথবা বিজয়ী বীরের ইতিহাস এভাবে সংরক্ষিত নেই। এই হিফাযাতের ব্যবস্থাও সেইসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে করা হয়েছে যে সবের মাধ্যমে কুরআনের হিফাযাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির ঘোষণার অর্থ স্বয়ং এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিযুক্ত সর্বশেষ রাসূলের পথ প্রদর্শন এবং তাঁর পদাংক কিয়ামাত পর্যন্ত জীবন্ত রাখার যিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন, যাতে তাঁর জীবন সর্বকালে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং তাঁর পরে কোন নতুন নবীর আগমনের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বাস্তবিকই পৃথিবীর প্রতিটি কোণে এই পদচিহ্ন এমন মজবুতভাবে অঙ্কন করে দিয়েছেন যে, আজ কোন শক্তি তা বিলীন করতে সক্ষম নয়।

এই যে, ওযু, পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত, এই আযান, জামা'আত সহকারে মাসজিদের এই ছালাত, 'ঈদের ছালাত, হজ্জের অনুষ্ঠান, 'ঈদুল আযহার কুরবানী, যাকাত, খাতনা, বিয়ে ও তালাক, উত্তরাধিকারের নীতিমালা, হালাল-হারামের নিয়ম-কানুন এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের আরো অসংখ্য মূলনীতি ও পন্থা-পদ্ধতি

যে দিন মহানবী (সা) সূচনা করলেন সেদিন থেকে তা মুসলিম সমাজে ঠিক সেভাবে প্রচলিত হলো যেভাবে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ মানুষের মুখে আবৃত্ত হয়েছে। অতঃপর হাজার থেকে লাখ এবং লাখ থেকে কোটি কোটি মুসলিম পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায় বংশ পরম্পরায় ঠিক সেইভাবে তার অনুসরণ করে আসছে যেভাবে তারা বংশ পরম্পরায় কুরআন বহন করে আসছে।

আমাদের সংস্কৃতির মৌলিক কাঠামো রাসূলে কারীমের (সা) যেসব সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত তা সঠিক ও যথার্থ হওয়ার প্রমাণ হুবহু তাই– যা কুরআন কারীমের সংরক্ষিত থাকার প্রমাণ হিসেবে গণ্য। এটাকে যে চ্যালেঞ্জ করে সে মূলত কুরআনকেই চ্যালেঞ্জ করার পথ ইসলামের দুশমনদেরকে দেখিয়ে দেয়।

ভেবে দেখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনাচার এবং তাঁর যুগের সমাজের কেমন বিস্তারিত চিত্র, কেমন খুঁটিনাটি বর্ণনা সহকারে, কেমন নির্ভরযোগ্য রেকর্ডের আকারে আজ আমরা পাচ্ছি। এক একটি ঘটনা এবং প্রতিটি কথা ও কাজের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) বর্তমান রয়েছে যা যাচাই করে যে কোন সময় জানা যেতে পারে, বর্ণিত হাদীছ বা সুন্নাহ কতটা নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র এক ব্যক্তির কথা ও কাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সেই যুগের প্রায় ছয় লাখ লোকের জীবন-ইতিহাস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে কোন ব্যক্তি এই মহামানবের নামে কোন্ কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে রায় কায়েম করা যেতে পারে যে, আমরা তাঁর বর্ণনার ওপর কতটা নির্ভর করতে পারি। ঐতিহাসিক সমালোচনার একটি ব্যাপক বিষয় একান্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হলো যে, এই অনুপম ব্যক্তিত্বের সাথে যে কথাই সংশ্লিষ্ট হবে তা যে কোন দিক থেকে পর্যালোচনা করে যেন তার যথার্থতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর গোটা ইতিহাসে এমন আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, কোন ব্যক্তির সার্বিক অবস্থার সংরক্ষণের জন্য মানবীয় হাতের সাহায্যে এইরূপ চেষ্টা বাস্তবরূপ লাভ করেছে? যদি না পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও না, তবে তা কি এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এই চেষ্টার পেছনেও সেই মহান আল্লাহর পরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে যা কুরআন কারীম হিফাযাতের জন্য কার্যকর রয়েছে?

হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধারণা হলো, কুরআন যেহেতু লিখিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছিল তাই তা সুরক্ষিত আর হাদীছ যেহেতু মহানবী (সা) স্বয়ং লিখিয়ে সংকলনাবদ্ধ করাননি তাই তা অরক্ষিত। কিন্তু তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, মহানবী (সা) যদি কুরআন মাজীদ শুধুমাত্র লিখিত আকারেই রেখে দিতেন এবং

হাজার হাজার লোক তা মুখস্থ করার পর পরবর্তী বংশধরদের নিকট মৌখিকভাবে পৌঁছিয়ে না দিতেন তবে এই লিখিত পাণ্ডুলিপি কি পরবর্তী কালের লোকদের জন্য এই কথার চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারতো যে, এটা সেই কুরআন যা মহানবী (সা) লিখিয়েছিলেন? তাও তো স্বয়ং সাক্ষ্য-প্রমাণের মুখাপেক্ষী হতো। কারণ যতক্ষণ না কিছু লোক এই সাক্ষ্য দিত যে, মহানবী (সা) তাদের সামনে এই কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন ততক্ষণ ঐ লিপিবদ্ধ গ্রন্থখানির নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যেত।

আসলে কোন জিনিসের নির্ভরযোগ্য হওয়াটা শুধুমাত্র তার লিখিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং জীবিত লোকেরা যতক্ষণ এর অনুকূলে সাক্ষ্য না দেয় ততক্ষণ তা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয় না। আজ পৃথিবীর কোথাও মহানবীর (সা) উদ্যোগে লিখিত কুরআন মাজীদের কপি বর্তমান নেই, কিন্তু তার ফলে কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতার উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে না। ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন বাচনিক বর্ণনার মাধ্যমে তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যে কুরআন মাজীদ লিখিয়েছিলেন তাও স্বয়ং বাচনিক বর্ণনার ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অন্যথায় মূল পাণ্ডুলিপি এই দাবীর সমর্থনে পেশ করা যেত না। আর তা যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে এটা প্রমাণ করা যেত না যে, এটাই সেই ছহীফা যা মহানবী (সা) লিখিয়েছিলেন। অতএব লেখার উপর যত জোর দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ ভুল। মহানবী (সা) নিজের সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ রেখে যান যার জীবনের প্রতিটি দিকের উপর তাঁর সুন্নাহর সীলমোহর লাগানো ছিল। এ সমাজে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন, তাঁর কাজকর্ম দেখেছেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এমন হাজার হাজার লোক বর্তমান ছিলেন। এই সমাজ পরবর্তী বংশধরদের নিকট এই চিহ্ন পৌঁছে দিয়েছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। দুনিয়ার কোন সর্বজন স্বীকৃত সাক্ষ্যের মূলনীতি অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আর একথা বলাও ঠিক নয় যে, এসব নিদর্শন কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং এসব নিদর্শন সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া মহানবীর (সা) যুগেই শুরু হয়েছিল। প্রথম হিজরী শতকে এদিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিছগণ জীবন্ত সাক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য– উভয়ের সাহায্যে এই গোটা স্মৃতি সংকলনের আওতায় নিয়ে আসেন।[১১০]

---

১১০. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-১২১-১২২, ১৩৭-১৩৮

সুন্নাহ কি কুরআনের মত ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত আছে?

একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে উত্থিত হয় যে, কুরআনের অনুরূপ আমাদের নিকট এমন কোন গ্রন্থ কি বর্তমান আছে যার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান? অর্থাৎ কুরআনের মত সুন্নাহরও কি কোন পূর্ণাঙ্গ কিতাব আছে?

এর জবাবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুন্নাহকে স্বয়ং ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তা জানার উপায় কি? মুসলিম উম্মাহ এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে বার বার। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কী সুন্নাহ রেখে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দুইটি ঐতিহাসিক সত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় :

এক. কুরআন কারীমের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামের সূচনাতে যে সমাজ প্রথম দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জীবন্ত রয়েছে, তা গোটা জীবনকালে এক দিনের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং তার সবগুলো প্রতিষ্ঠান এই সময়কালে উপর্যপুরি কর্মতৎপর থাকে। আজ পৃথিবীর সকল মুসলিমের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা পদ্ধতি, নৈতিক মূল্যবোধ, ইবাদাত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, জীবনদর্শন ও জীবন পদ্ধতির মধ্যে যে গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যার মধ্যে মতভেদের তুলনায় ঐক্য ও মিলনের উপাদান অধিক পরিমাণে বর্তমান, যা তাদেরকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সত্ত্বেও একই উম্মাত হিসেবে গেঁথে রাখার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কারণ হয়ে রয়েছে– তা প্রমাণ করে যে, এই সমাজকে কোন একক সুন্নাহ্র উপরই কায়েম করা হয়েছিল এবং সেই সুন্নাহ এই দীর্ঘকালের পরিক্রমায় ক্রমাগতভাবে অব্যাহত রয়েছে। এটা কোন লুপ্ত জিনিস নয় যার অন্বেষণের জন্য আমাদের অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

দুই. এটাও এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক সত্য যে, মহানবীর (সা) পর থেকে প্রতিটি যুগে মুসলিমগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে জানতে চেষ্টা করে যে, প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ কী এবং নতুন কী জিনিস কোন কৃত্রিম পন্থায় তাদের জীবন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে। যেহেতু সুন্নাহ তাদের নিকট আইনের মর্যাদাসম্পন্ন এবং এর ভিত্তিতে তাদের বিচারালয়সমূহে রায় প্রদান করা হতো এবং তার ভিত্তিতে তাদের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হতো, তাই এর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই বিশ্লেষণের উপায়-উপকরণ এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রাথমিক খিলাফাত থেকে শুরু

করে আজ পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করেছি এবং কোন বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রতিটি বংশধরের সম্পাদিত কাজ সংরক্ষিত রয়েছে।

এই দুটি সত্যকে যদি কেউ উত্তমরূপে অনুধাবন করে এবং সুন্নাহ্‌কে জানার মাধ্যমসমূহ যথারীতি অধ্যয়ন করে তবে সে কখনও এমন সন্দেহের শিকার হতে পারে না যে, আজ হঠাৎ সে এক অসমাধানযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

মহানবী (সা) তাঁর নবুওয়াতী জীবনে মুসলিমদের জন্য কেবল একজন পীর-মুরশিদ ও ধর্মীয় বক্তাই ছিলেন না, বরং কার্যত নিজের জামা'আতের নেতা, পথ প্রদর্শক, আইন প্রণেতা, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষক সবকিছুই ছিলেন এবং আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সম্পূর্ণ গঠন তাঁরই নির্দেশিত, শেখানো এবং নির্ধারিত পন্থায় হয়েছিল। এজন্য কখনও এটা হয়নি যে, তিনি ছালাত, ছাওম ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদির যে শিক্ষা দান করে থাকবেন কেবল তাই মুসলিমদের মধ্যে চালু আছে এবং সব কথা তারা কেবল ওয়াজ-নসীহত হিসেবে শুনেই ক্ষান্ত থাকবেন। বরং বাস্তবে যা ঘটেছে তা এই যে, যেভাবে তাঁর শেখানো ছালাত সাথে সাথে মাসজিদে চালু হয় এবং জামা'আতসমূহও কায়েম হতে থাকে, ঠিক সেভাবেই বিয়ে-শাদী, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে আইন কানুন তিনি নির্ধারণ করেন, মুসলিম পরিবারগুলোতে তার বাস্তব অনুসরণ শুরু হয়ে যায়। লেনদেন ও আদান-প্রদানের যে নিয়ম-রীতি তিনি নির্ধারণ করে দেন, বাজারসমূহে তার প্রচলন হয়ে যায়। মোকদ্দমাসমূহের যে রায় তিনি প্রদান করেন তা-ই রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সাথে তিনি যে আচরণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে বিজিত এলাকার জনগণের সাথে তিনি যে আচরণ করেন তা-ই মুসলিম রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয় এবং সার্বিকভাবে ইসলামী সমাজ ও তার জীবন ব্যবস্থা তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাসহ সেইসব সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বয়ং তিনি যার প্রচলন করেন অথবা পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে যেগুলোকে বহাল রেখে তিনি ইসলামী সুন্নাহর অংশে পরিণত করেন।

এগুলো ছিল জ্ঞাত, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সুন্নাহ যেগুলো মাসজিদ থেকে শুরু করে পরিবার, বাজার, বিচারালয়, রাজপ্রাসাদ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত মুসলিমদের সামাজিক জীবনের সমস্ত শাখা ও বিভাগ মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায়ই কার্যকর হতে থাকে এবং পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো তার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর ধারাবাহিক সূত্র একদিনের জন্যও কর্তিত হয়নি। যদি

কোন বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়ে থাকে তবে তা শুধুমাত্র সরকার, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ ইত্যাকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যত এলোমেলো হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। এসব সুন্নাহর ব্যাপারে একদিকে হাদীছের নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত এবং অন্যদিকে উম্মাহর অব্যাহত আমল– দুটিই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এসব জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ সুন্নাহ ব্যতীত আরেক প্রকারের সুন্নাহ এরূপ ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি, সেগুলো বিভিন্ন সময়ে মহানবী (সা)-এর কোন সিদ্ধান্ত, বাণী, আদেশ-নিষেধ, মৌন সমর্থন ও অনুমতি অথবা কাজ দেখে বা শুনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গোচরে এসেছিল এবং সাধারণ লোকেরা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি।

এসব সুন্নাহর জ্ঞান, যা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, উম্মাহ সেগুলো সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা মহানবীর (সা) ইনতিকালের পরপরই শুরু করে দেয়। কারণ খলীফা, প্রশাসকবর্গ, বিচারকমণ্ডলী, মুফতী ও জনসাধারণ সকলে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আগত সমস্যা সম্পর্কে কোন ফায়সালা অথবা কাজে নিজের রায় ও মাসআলা প্রদান করার পূর্বে এটা জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন যে, এই প্রসঙ্গে মহানবীর (সা) কোন পথ নির্দেশ বর্তমান আছে কিনা। এই প্রয়োজনের তাকিদেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করা শুরু হয় যার নিকট সুন্নাহর কোন জ্ঞান ছিল। আর যার নিকটই এই জ্ঞান বর্তমান ছিল তিনি তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়া স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। এটাই হাদীছ রিওয়ায়াতের সূচনা বিন্দু এবং হিজরী ১১ থেকে হিজরী ৩য়-৪র্থ শতক পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এই সুন্নাহ একত্রিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। জাল-হাদীছ প্রণয়নকারীরা তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটানোর যত অপচেষ্টাই করেছে তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। কারণ যেসব সুন্নাহর মাধ্যমে কোন জিনিস প্রমাণিত অথবা পরিত্যক্ত হত, যার ভিত্তিতে কোন জিনিস হারাম অথবা হালাল সাব্যস্ত হতো, যার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করতো অথবা কোন অপরাধী মুক্তি পেত, মোটকথা যেসব সুন্নাহর উপর আইন-কানুনের ভিত্তি ছিল সেগুলো সম্পর্কে সরকার, বিচার বিভাগ এবং ফাতওয়া বিভাগের এতটা বেপরোয়া হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না যে, হঠাৎ দাঁড়িয়েই কোন ব্যক্তি 'قال النبى صلى الله عليه وسلم' - "নবী (সা) বলেছেন" বলে দিত আর একজন বিচারক, প্রশাসক অথবা মুফতী তা মেনে নিয়ে কোন হুকুম দিয়ে বসতেন। এজন্য যেসব সুন্নাহ আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত ছিল সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণরূপে অনুসন্ধান চালানো হয়। সমালোচনার কঠোর চালুনি দ্বারা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রিওয়ায়াতের মূলনীতির আলোকেও তা পরখ

করা হয় এবং দিরায়াত (বুদ্ধি-বিবেচনা)-এর মূলনীতির কোন্ ভিত্তিতে রিওয়ায়াত গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়েছে সেগুলোও সংকলিত করে রাখা হয়েছে, যাতে পরবর্তী কালে প্রতিটি ব্যক্তি তা গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।[১১১]

হাদীছসমূহের সুরক্ষিত থাকার আসল কারণ

সাহাবায়ে কিরামের জন্য বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছসমূহ স্মরণ রাখা এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করার পেছনে নিম্নের বিষয়গুলো ক্রিয়াশীল ছিল :

১. তাঁরা সর্বান্তকরণে মহানবীকে (সা) আল্লাহর রাসূল এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতেন। তাঁদের অন্তরের মধ্যে তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের নিকট মহানবীর (সা) বক্তব্য এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও অবস্থার মর্যাদা সাধারণ মানবীয় ঘটনাবলীর মত ছিল না যে, তা নিজেদের স্মরণশক্তির হাওয়ালা করে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। তাঁরা মহানবীর সাহচর্যে যে সময় অতিবাহিত করতেন তার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাঁদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এবং তাকে নিজেদের স্মৃতিতে ধরে রাখাকে তাঁরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন মনে করতেন।

২. তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি ভাষণ, প্রতিটি বক্তব্য এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্যক্রম থেকে এমন শিক্ষা লাভ করতেন যা তাঁরা ইতিপূর্বে কখনো লাভ করতে সক্ষম হননি। তাঁরা নিজেরাও জানতেন যে, তাঁরা ইতিপূর্বে চরম অজ্ঞ, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিলেন এবং এই পবিত্রতম মানুষটি তাঁদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন এবং সুসভ্য মানুষের মত জীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁর প্রতিটি কাজ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন। কারণ তাঁদেরকে নিজেদের বাস্তব জীবন তদনুযায়ী গঠন করতে হতো, তারই হুবহু অনুসরণ করতে হতো এবং তারই নির্দেশনায় কাজ করতে হতো। এই চেতনা ও অনুভূতি সহকারে মানুষ যা কিছু দেখে ও শুনে থাকে তা স্মরণ রাখার ব্যাপারে তারা এতটা সহজ হতে পারে না যতটা তারা কোন মেলায় অথবা কোন বাজারে শ্রুত ও দৃষ্ট কথা স্মরণ রাখার ব্যাপারে হতে পারে।

৩. তাঁরা কুরআনের আলোকেও জানতেন এবং মহানবী (সা) বারবার তাকিদ দেয়ার কারণেও তাঁদের প্রবল অনুভূতি ছিল যে, আল্লাহর নবীর উপর মিথ্যা আরোপ অতীব মারাত্মক অপরাধ, যার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া। এ

১১১. প্রাগুক্ত-৩৪-৩৮

কারণে তাঁরা মহানবীর (সা) সাথে কোন কথা সংযুক্ত করে বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যায় না যে, কোন এক সাহাবীও নিজের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে অথবা নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মহানবীর (সা) নাম অবৈধভাবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে যখন মতবিরোধের সূচনা হয় এবং দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে যায় সে সময়ও উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তিও মনগড়াভাবে কোন হাদীছ রচনা করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেননি। পরবর্তীকালের অসৎ ও আল্লাহর প্রতি ভয়হীন লোকেরা অবশ্যই এ ধরনের জাল হাদীছ রচনা করেছে, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের ঘটনাবলীর মধ্যে এর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৪. পরবর্তী বংশধরদের নিকট মহানবীর (সা) জীবনাচার এবং তাঁর হিদায়াত ও শিক্ষা সম্পূর্ণ যথার্থ আকারে পৌছে দেয়া এবং তার মধ্যে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা মিশ্রণ না ঘটানোকে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন। কারণ তাঁদের নিকট এটাই ছিল আল্লাহর দীন এবং তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন সাধন করাটা কোন সামান্য অপরাধ নয়, বরং তা ছিল এক মারাত্মক প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সাহাবায়ে কিরামের জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁরা হাদীছ বর্ণনা করার সময় থরথর করে কেঁপে উঠতেন। তাঁদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। যেখানে সামান্যতম সন্দেহ হতো যে, হয়তো রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যবহৃত শব্দ অন্য কিছু, সেখানে বক্তব্য নকল করার সাথে সাথে "أَوْ كَمَا قَالَ" (অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন) বাক্যাংশ বলে দিতেন, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁদের ব্যবহৃত শব্দাবলীকে হুবহু মহানবীর (সা) ব্যবহৃত শব্দ মনে না করে বসে।

৫. প্রবীণ সাহাবীগণ বিশেষভাবে সাধারণ সাহাবীদেরকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শনকেও তাঁরা কঠোরভাবে প্রতিহত করতেন এবং কখনো কখনো তাঁদের নিকট মহানবীর (সা) কোন হাদীছ শুনলে তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য তলব করতেন, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অন্যরাও সংশ্লিষ্ট হাদীছ শুনেছে। এই নিশ্চয়তা লাভের জন্য সাহাবীগণ একে অপরের স্মরণশক্তির পরীক্ষাও নিতেন। যেমন, একবার হজ্জের মৌসুমে 'আয়িশা (রা)-এর নিকট 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ পৌছে। পরের বছর হজ্জের মৌসুমে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) পুনরায় একই হাদীছ সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর নিকট লোক পাঠান।

মাঝখানে এক বছরের ব্যবধানের পরও 'আবদুল্লাহর (রা) দু'বারের বর্ণনার মধ্যে একটি শব্দেরও পার্থক্য ছিল না। এর উপর 'আয়িশা (রা) মন্তব্য করেন, বাস্তবিকই 'আবদুল্লাহর সঠিক কথা স্মরণ আছে।'

৬. মহানবীর (সা) শিক্ষা ও হিদায়াতের এক উল্লেখযোগ্য বিরাট অংশ– যা শুধু মৌখিক বর্ণনাই ছিল না, বরং সাহাবায়ে কিরামের সমাজে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে, তাঁদের পরিবারে, তাঁদের অর্থনীতি, সরকারী প্রশাসন ও বিচারালয়সমূহে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর ছিল, যার প্রভাব ও প্রকাশ লোকেরা দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র দেখতে পেত। এমন এক জিনিস সম্পর্কে কোন ব্যক্তি স্মৃতিশক্তির ভ্রান্তি অথবা নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁকপ্রবণতার ভিত্তিতে কোন বিচ্ছিন্ন কথা নিয়ে এসে পেশ করলে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারতো? অতএব কখনো কোন অপরিচিত ও বিচ্ছিন্ন হাদীছ সামনে এসে পড়লেও তার বর্ণনাকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মুহাদ্দিছগণ বলে দিয়েছেন যে, ঐ বিশেষ বর্ণনাকারী ছাড়া এই কথা আর কেউ বর্ণনা করেনি অথবা তদনুযায়ী 'আমল করার কোন নযীর বর্তমান নেই।[১১২]

তিন. তাদের তৃতীয় যুক্তি হলো, সুন্নাহ যদি সত্যিই দলীল-প্রমাণের স্তরের হতো তাহলে অবশ্যই নবী কারীম (সা) তা লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর পরে সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরাম (রা) তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণে উদ্যোগী হতেন। তাতে তা ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, ভুল করা ইত্যাদি সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতো এবং সন্দেহাতীত অবস্থায় সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছতো। কারণ, সন্দেহযুক্ত জিনিস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না। আল্লাহ বলেন : وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.[১১৩] - "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।"

অন্যত্র তিনি আরো বলেন : إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ.[১১৪] - "তোমরা তো শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর।" আর লেখা ছাড়া সুন্নাহর অকাট্যতা প্রমাণিত হয় না। যেমন আল-কুরআনের ক্ষেত্রে হয়েছে।

পক্ষান্তরে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলে কারীম (সা) তা লিখতে নিষেধ করেছেন। এমনকি যারা কিছু লিখেছিলেন তা মুছে ফেলতে নির্দেশ দেন। সাহাবা ও

---

১১২. প্রাগুক্ত-৩১৭-৩১৯

১১৩. সূরা আল-ইসরা'-৩৬

১১৪. সূরা আল-আন'আম-১১৬

তাবি'ঈন কিরামও এমন করেছেন। আল-হাকিম 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[১১৫]

أن أبا بكر رضى الله عنه أحْرق خمسَمَائَة حديث كتبها، وقال : خشيت أن أموت فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثنى فأكون قد نقلت ذلك.

"আবূ বাকর (রা) পাঁচ শো হাদীছ যা তিনি লিখেছিলেন পুড়িয়ে ফেলেন এবং তিনি বলেন : আমার ভয় হয়, আমি মারা যাব এবং এই লেখার মধ্যে এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ থাকবে যাকে আমি বিশ্বস্ত ও আমানতদার মনে করেছি। সে আমাকে যেমন বলেছে, ব্যাপারটি তেমন নয়। অথচ আমি তার কথাই বর্ণনা করেছি।"

এমন কাজই করেছেন যায়িদ ইবন ছাবিত (রা)। তিনি মু'আবিয়ার (রা) নিকট যান। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে একটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করেন। মু'আবিয়া (রা) একজনকে সেই হাদীছটি লিখে রাখার নির্দেশ দেন। তখন যায়িদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তার হাদীছের কোন কিছু না লিখি। একথা শোনার পর মু'আবিয়া (রা) তা মুছে ফেলেন।

'উমার (রা) একবার সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলেন :

إنى كنت أريد أن أكتب السنن فإنى ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإنى - والله - لا أشوب كتاب الله بشئ أبداً.

"আমি সুন্নাহ লেখার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি আপনাদের পূর্ববর্তী কোন কোন জাতির কথা স্মরণ করলাম যারা গ্রন্থাকারে কিছু লিপিবদ্ধ করে, অতঃপর তারা আল্লাহর কিতাব ছেড়ে তাই নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহর কসম! আমি কখনো আল্লাহর কিতাবের সাথে কোন কিছুরই মিশ্রণ ঘটাবো না।"

এমনিভাবে 'আলী (রা)ও যাঁরা কিছু হাদীছ লিখেছিলেন তাদেরকে তা মুছে ফেলতে বলেন। ইবন মাস'ঊদ (রা) তাঁর লিখিত হাদীছের একটি ছহীফা

---

১১৫. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৫

(পুস্তিকা) মুছে ফেলেন। তাবি'ঈদের মধ্যে 'আলকামা, 'উবাইদ, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, আশ-শা'বী, আন-নাখা'ঈ, মানসূর, মুগীরা, আল-আ'মাশ (রহ) প্রমুখ হাদীছ লেখার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন, অথবা সীমিত বর্ণনার কথা বলেছেন। ভুল-ভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গ্রাসে পতিত হওয়ার পর অনেক দেরীতে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তখন তাতে অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সুতরাং বিধান হিসেবে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছে।

জবাব : যে সকল হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, সুন্নাহ বা হাদীছ লেখার ব্যাপারে রাসূল (সা) কোন নির্দেশ দেননি বা নিষেধ করেছেন, তাতে কিন্তু হাদীছের হুজ্জাত বা দলীল না হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং এর কারণ হলো, তখন যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক লিখতে জানতেন তাদেরকে কেবলমাত্র কুরআন লেখার কাজে নিয়োজিত রাখা, তাদের সেই লেখাতে যেন অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ না ঘটে এবং মুসলিমগণ যেন কুরআন হিফ্জ ও সংরক্ষণে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত থাকে। তাছাড়া হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, রাসূল (সা) কুরআন লেখার যে নির্দেশ দেন তা ছিল সরকারী নির্দেশ, হাদীছের ব্যাপারে তেমন সরকারী নির্দেশ ছিল না। তবে বেসরকারীভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সময় ও পরবর্তীকালে অনেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশেষে 'উমার ইবন আবদিল আযীয (রহ) হাদীছ লেখার জন্য সরকারী ফরমান জারি করেন।

দলীল-প্রমাণ (হুজ্জাত) হওয়া কেবল লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং এ যুক্তি সঠিক নয় যে, সুন্নাহ যদি দলীল হতো তাহলে নবী (সা) তা লেখার জন্য নির্দেশ দিতেন। দলীল হয় অনেক কিছুর ভিত্তিতে। যেমন : মুতাওয়াতির হওয়া, ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া, লিপিবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। এমনকি কুরআনের ক্ষেত্রেও তো কেবল লেখার উপর নির্ভর করা হয়নি, বরং সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যেকটি আয়াত স্মৃতিতে ধারণ করেছেন এবং অন্যদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আর লেখার চাইতে মুখস্থ পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন অংশে কম নয়। বিশেষতঃ আরব জাতি, যারা তাদের প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য কিংবদন্তীতুল্য, যাদের স্মৃতিরশক্তির ব্যাপারে বহু বিস্ময়কর কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে, তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিষয়ের যথার্থতা নিয়ে তো কোন রকম প্রশ্নই উঠতে পারে না।

একজন আরব একটি কাসীদা (দীর্ঘ কবিতা) কেবল একবার শুনে মুখস্থ করে ফেলতো। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা) এক বৈঠকে কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আর একটি কাসীদা মুখস্থ করেন। তেমনিভাবে অনেকে এক বৈঠকে যে সকল হাদীছ শুনতেন সবই মুখস্থ করে ফেলতেন। পরে যখন অন্যকে শোনাতেন তখন তার একটি হরফও বাদ পড়তো না।

ইবন 'আসাকির যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর-এর বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে মদীনাবাসীদের ভূমিকার নিন্দা করে 'আবদুল মালিক তাদের নিকট একটি পত্র লেখেন। পত্রটি ছিল দু'টি পুস্তিকার আকারে। মাসজিদে সমবেত মানুষের সামনে তা পাঠ করে শোনানো হয়। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি সেখানে উপস্থিত তাঁর ছাত্রদের নিকট পত্রটির বিষয়বস্তু জানতে চাইলেন। তারা যেভাবে যা কিছু বললো তিনি তাতে তৃপ্ত হলেন না। অবশেষে যুহরী (রহ) বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! আপনি কি তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই জানতে চান? বললেন : হাঁ। অতঃপর যুহরী (রহ) তাঁকে পত্রটি হুবহু মুখস্থ শোনান। তার একটি হরফ বাদ পড়েনি।[১১৬] এ ধরনের তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির কথা ইমাম শাফি'ঈ (রহ) ও আরো অনেকের সম্পর্কে জানা যায়। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ পঠন-পাঠন ও বর্ণনা করতেন তার মূল ভিত্তি ছিল তাঁদের স্মৃতিশক্তি। আর আমরা জানি, স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরতা ছাত্রকে অধিক যোগ্য করে তোলে গ্রন্থের উপর নির্ভরতা অপেক্ষা। এ কারণে সুন্নাহর দলীল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহবাদীরা যাদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা সুন্নাহ লেখেননি, তাঁরা মূলতঃ গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁদের স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করতে চাননি। তাই তাঁরা লেখা-লেখি পছন্দ করেননি।

এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবন 'আবদিল বার-এর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরামের (রা) মধ্যে যাঁরা হাদীছ লিবিপদ্ধ করা পছন্দ করতেন না তাঁদের বিষয়ে আলোচনার পর তিনি বলেন :

من ذكرنا قوله فى هذا الباب فإنما ذهب فى ذلك مذهب العرب، لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك، والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبى وابن شهاب والنخعى وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم، كانوا قد

---

১১৬. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১৫৯

طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة، ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول : إنى لأمُرُّ بالبقيع فاسد أذنىً مخافة أن يدخل فيها شئ من الخنا فوالله ما دخل أذنى شئ قط فنسيته.

'এ পরিচ্ছেদে আমি যাঁদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা আরবদের মত-পথের অনুসারী ছিলেন। কারণ মুখস্থ করা ছিল তাঁদের স্বাভাবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য। আর যাঁরা লেখা অপছন্দ করেছেন, যেমন : ইবনুল 'আব্বাস, শা'বী, ইবন শিহাব, নাখা'ঈ, কাতাদা (রা) এবং তাঁদের পথ যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মত স্বভাব-প্রকৃতি সম্পন্ন হয়েছেন, তাঁরা সকলে স্মৃতিতে ধারণের বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মেছেন। তাঁদের অনেকে স্মৃতি শক্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন। ইবন শিহাব সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা একটু লক্ষ্য করুন। তিনি বলতেন : আমি আল-বাকী'তে যখন চলাফেরা করি তখন আমি আমার কান বন্ধ করে রাখি এই ভয়ে যে, কোন বাজে কথা আমার কানে ঢুকে যায়। আল্লাহর কসম! আমার কানে কখনও কোন কিছু ঢুকেছে আমি তা ভুলে গেছি, এমনটি হয়নি।" আশ-শা'বী ও অন্যদের থেকেও এমন কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা সকলে ছিলেন আরব। নবী কারীম (সা) বলেছেন :

نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب.

"আমরা হলাম উম্মী জাতি, লিখি না, হিসাবও করি না।"[১১৭]

একথা সত্য যে, আরবরা মুখস্থ শক্তির দ্বারা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর যে কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা) তাঁর লিখিত হাদীছের একটি পুস্তিকা জ্বালিয়ে ফেলেন। যদি এ বর্ণনা সত্য হয় তাহলে, তিনি তা করেন এই ভয় ও আশংকায় যে, যা তিনি লিখে রেখেছেন, তাতে হয়তো ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, আর তেমন হলে, সেটা হবে খুবই মারাত্মক একটা কাজ। এ তাঁর একান্তই সতর্কতা, এ দ্বারা সুন্নাহ হুজ্জাত না হওয়া প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া ইমাম যাহাবী বলেছেন, আবূ বাকর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত কথাটি সঠিক নয়।[১১৮]

আর কেউ কেউ যে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলেন, তা ছিল মূলতঃ

১১৭. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/৬৫

১১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫

দীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে। তাদের ভয় ছিল, না জানি রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বলে যা কিছু বলবেন তাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। তবে যাঁরা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তাঁরা কোন দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনুল 'আব্বাস, ইবন মাস'উদ, আবূ হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী। যায়িদ ইবন ছাবিত (রা) তাঁর বর্ণিত কোন হাদীছ লিখতে বারণ করতেন। কারণ হিসেবে বলতেন :[১১৯]

أتدرون لعل كل شئ حدثتكم به ليس كما حدثتكم به.

'তোমরা কি জান, হয়তো আমি যা কিছু তোমাদেরকে বর্ণনা করছি তা সেভাবে নয় যেভাবে আমি তোমাদেরকে বলছি।' সুতরাং একথা সত্য যে, কেউ কেউ যে, লিখতে নিষেধ করেছেন, অথবা বর্ণনার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন, তা ছিল কেবল তাদের দীনের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার কারণে। অপর দিকে সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরাম যে হাদীছ লিখেছেন সেরূপ বর্ণনাও আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সনদে পৌঁছেছে। এ সকল বর্ণনা প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের এবং কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। এ বিষয়ে আরো অবগতির জন্য ইবন 'আবদিল বার-এর جامع بيان العلم ও খতীব আল-বাগদাদীর تقييد العلم গ্রন্থ দু'টি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

আর যে কথাটি বলা হয় যে, সুন্নাহ অনেক দেরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর সেই কারণে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আসলে এমন কথা যারা বলে তারা হাদীছ বিকৃতি ও জাল হাদীছ প্রতিরোধে মুসলিম মনীষীদের চেষ্টা সাধনার ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞ। অধিকাংশ সুন্নাহ প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী অতি বিশ্বস্ত রাবীগণ মুখপরম্পরায় শুনে স্মৃতিতে ধারণ করেছেন, আর কিছু লিপিবদ্ধও হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে হিজরী প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর 'উমার ইবন আবদিল 'আযীযের (রা) সরকারী নির্দেশে ইমাম যুহরী (রহ)সহ অন্যরা তা গ্রন্থাবদ্ধ করেন। এই সংরক্ষণের কাজটি ছিল একান্ত ধারাবাহিক, কখনো তাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। এখন থাকে জাল হাদীছের বিষয়টি। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই মুসলিম মনীষীগণ সতর্ক ছিলেন। তাঁরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এমন ভাবে তা চিহ্নিত করেন যে,

১১৯. জামি'উ বায়ান আল-আল-'ইলম-১/৬৫

মূল সুন্নাহর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না। এমনকি সুন্নাহ দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা ইলমে ইয়াকীন-এর (দৃঢ় প্রত্যয়) স্তরে পৌছে। তা সত্ত্বেও আমরা একথা বলি না যে, আল-আহাদীছ আল-আহাদ (মূলতঃ তার সংখ্যাই বেশি) দ্বারা ইলমে ইয়াকীন অর্জিত হয়। আমরা বরং বলি তা দ্বারা ظن বা ধারণা অর্জিত হয়, আর এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই এবং তা হুজ্জাত হতেও কোন বাধা নেই।

দীনের বিধি-বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়যুক্ত ও অনুমান ভিত্তিক কিছু হওয়া সঙ্গত নয় বলে যে দাবী করা হয়, মূলতঃ তা দীনের মৌল নীতি ও ভিত্তির ব্যাপারে সত্য, যাতে সন্দেহ পোষণ করলে অথবা অস্বীকার করলে কুফরীর পর্যায়ে চলে যেতে হয়। যেমন আল্লাহর একত্ব, রিসালাতের সত্যতা, আল-কুরআন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নাযিলকৃত গ্রন্থ এবং অনুরূপভাবে ছালাত, যাকাত ও এ জাতীয় দীনের অন্যান্য বিধান। তবে দীনের শাখা-প্রশাখামূলক বিধানের ক্ষেত্রে তেমন নয়। যাঁরা এ দাবী করেন যে, দীনের সকল বিধান অকাট্য ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তারাও কিন্তু কুরআনের উপর ইজতিহাদের ভিত্তিতে গৃহীত বিধানকে স্বীকার করেন। কারণ কুরআনে আছে আম, খাস, মুতলাক, মুকায়্যাদ, মুজমাল, মুবায়্যান ইত্যাদি। এর থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যে দূরবর্তী অর্থ ও ভাব গ্রহণ করা হয় তাও সকলে অকাট্য বলে স্বীকার করেন। আর এটাই ইসলামী বিধানের মৌলিক নীতিমালা। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) তাঁর সময়ের হাদীছের শরী'আতের উৎস ও দলীল হওয়াকে অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করেন এভাবে যে, তোমরা সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ জারী করে থাক, অথচ সেই সাক্ষীর মিথ্যা বলা অথবা ভুল সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে তোমরা কি করে বলতে পার, যে দলীলে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সম্ভাবনা আছে তা দ্বারা শরী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না?[১২০]

চার. তাদের ৪র্থ যুক্তি হলো, রাসূলে কারীম (সা) থেকে এমন সব বাণী বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা সুন্নাহ যে হুজ্জাত ও দলীল নয় তা বুঝা যায়। যেমন তিনি বলেন :

إن الحديث سيفشوعنى فما أتاكم يوافق القرآن فهوعنى وما أتاكم عنّى يخالف القرآن فليس منى.

'অদূর ভবিষ্যতে আমার নামে হাদীছ ছড়িয়ে পড়বে। কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল

১২০. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১৬১

যা তোমাদের নিকট পৌঁছবে তা হবে আমার, আর যা কুরআন বিরোধী হবে তা আমার নয়।'

সুতরাং বর্ণিত যে সুন্নাহ দ্বারা নতুন কোন শর'ঈ বিধান প্রমাণিত হবে তা অবশ্যই কুরআনের মুওয়াফিক বা সামঞ্জস্যশীল হবে না। আর যদি নতুন কোন বিধান না দেয় তাহলে তা হবে কেবলই তাকীদ। তখন কুরআনই হবে মূল দলীল ও হুজ্জাত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন :

إذ حُدثتم عنى حديثا تعرفونه ولاتنكرونه قلته أو لم أقله، فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولاينكر، وإذا جُدثتُ عنى حديثا تنكرونه قتله أو لم أقله، فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف.

"যখন আমার থেকে কোন হাদীছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যা তোমরা জান এবং তোমরা অস্বীকার কর না তা সে হাদীছ আমি বলে থাকি বা না বলি, তোমরা তা বিশ্বাস করবে। কারণ, আমি পরিচিত এবং অস্বীকার করা হয় না এমন কথাই বলি। আর যখন আমার নামে তোমাদের নিকট এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করা হয় যা তোমরা জান না, তা সে হাদীছ বলে থাকি বা না বলি, তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। কারণ যা অপরিচিত ও অস্বীকার করা হয়, এমন কথা আমি বলি না।"[১২১]

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় রাসূলে কারীমের (সা) নামে যা কিছু বর্ণনা করা হবে তা মুসলিমদের নিকট পরিচিত আল্লাহর হুকুমের সাথে মিলানো ওয়াজিব। সুতরাং সুন্নাহ শরী'আতের কোন উৎস বা হুজ্জাত নয়। মূল উৎস আল-কুরআন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীমের (সা) আরেকটি উক্তি :

إني لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه.

'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল করেছেন তাছাড়া আমি আর কিছু হালাল করি না এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু হারাম করেছেন তাছাড়া আমি আর কিছু হারাম করি না।[১২২] মোটামুটি এই হলো তাদের যুক্তি।

---

১২১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১৫৪

১২২. প্রাগুক্ত-১৫৫

জবাব : তারা যে সকল হাদীছ উল্লেখ করে থাকে তার জবাব নিম্নরূপ :

প্রথম হাদীছ– "إن الحديث سيفشوعنى الخ"

ইমাম আল-বাইহাকী (রহ) বলেন, এই হাদীছের একজন রাবী খালিদ (مجهول) অজ্ঞাত ব্যক্তি, আরেকজন রাবী আবূ জা'ফার সাহাবী নন। সুতরাং হাদীছটি منقطع. ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেন :

انما هى رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية فى شئ.

"এ একটি منقطع বর্ণনা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির সূত্রে। কোন ক্ষেত্রেই আমরা এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করি না।"[১২৩]

উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী হুসাইন ইবন 'আবদিল্লাহ সম্পর্কে ইবন হাযাম বলেন :

الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندقة.

"আল-হুসাইন ইবন 'আবদিল্লাহ একজন যিনদীক হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্জিত ব্যক্তি।[১২৪]

ইমাম আল-বাইহাকী (রহ) বলেন :

والحديث الذى روى فى عرض الحديث على القرآن باطل لايصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن.

"কুরআনের বিপরীতে হাদীছ উপস্থাপনের ব্যাপারে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন, সঠিক নয়। তা নিজেই বাতিল বলে প্রমাণিত। অতএব কুরআনের বিপরীতে হাদীছ দাঁড় করানো কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়।"[১২৫]

হাদীছটি সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণ যা কিছু বলেছেন তা মূলতঃ উপরের আলোচনার অনুরূপ। তাঁদের বক্তব্য সনদকে কেন্দ্র করে। তাঁরা কিন্তু হাদীছটি জাল বলে ঐকমত্য পোষণ করেননি। বরং কেউ কেউ যেমন শাফি'ঈ ও আল

১২৩. আর-রিসালা-২২৫; মিফতাহ আল-জান্নাহ-১৫

১২৪. আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-২/৭৬

১২৫. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১৬১

বাইহাকী হাদীছটিকে জ'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। তবে হাদীছটির মতনের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে এভাবে :

فما وافق فاقبلوه وما خالف أو لم يوافق فردوه.

হাদীছটির এ ভাষ্যের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই। তবে পূর্ববর্তী বর্ণনাটি যে জাল বা বানোয়াট সে ব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই। কারণ, এ ব্যাপারে সকল হাদীছ বিশারদ একমত যে, যা কিছু কিতাব ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত সুন্নাহর পরিপন্থী হবে তা অবশ্যই জাল। সুতরাং এমন হাদীছকে তাবীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। আমরা সেটাকে জাল হাদীছ বলবো। তবে কোন কোন বর্ণনায় হাদীছটি এভাবে এসেছে :

فما وجدتموه فى كتاب الله فاقبلوه ومالم تجدوه فى كتاب الله فردوه.

এটি যে অসার ও মিথ্যা বর্ণনা সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, যে সকল হাদীছ দ্বারা শরী'আতের আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা যে কুরআনে নেই সে ব্যাপারে 'আলিমগণ একমত। সেই সকল হাদীছ সর্বজন স্বীকৃত সহীহ এবং তার হুকুম অবশ্য পালনীয়।

সারকথা হলো, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সহীহ সুন্নাহ কখনো কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী হবে না। কোন বর্ণনায় যদি এমনটি দেখা যায় তাহলে তা পরিত্যাজ্য– এ ব্যাপারে সকলে একমত।

ইবন হাযাম বলেন : ليس فى الحديث الذى صح شئ يخالف القرآن.

'যে হাদীছ সহীহ বলে স্বীকৃত তাতে কুরআনের পরিপন্থী কিছু নেই।'

আর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুসাররাহ্ বলেন :

الحديث ثلاثة أقسام : فحديث موافق كما فى القرآن فالأخذ به فرض، وحديث زائد على ما فى القرآن فهو مضاف إلى ما فى القرآن. والأخذ به فرض، وحديث مخالف لما فى القرآن فهو مطرّح.

"হাদীছ তিন প্রকার : কিছু হাদীছ এমন যা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা গ্রহণ করা ফারজ, কিছু হাদীছ কুরআনে যা কিছু আছে তার অতিরিক্ত, তাও গ্রহণ করা ফারজ, আর কিছু হাদীছ আছে যা কুরআনের পরিপন্থী, তা পরিত্যাজ্য।"

'আলী ইবন আহমাদ (ইবন হাযাম) বলেন :

لاسبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف لما فى القرآن أصلاً، وكل خبر شريعة فهو إما مضاف إلى ما فى القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته، وإما مستثنى منه مبين لجملته، ولا سبيل إلى وجه ثالث.

"কুরআনের ভাব বিরোধী কোন বিশুদ্ধ হাদীছের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। শরী'আতের প্রতিটি খবর হয় কুরআনের অতিরিক্ত ও তার ব্যাখ্যা, অথবা তার ব্যাখ্যা ও ব্যতিক্রম। তৃতীয় কোন কিছু হওয়ার কোন উপায় নেই।"

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছটির মতন (মূল পাঠ) যদি হয় فما لم يوافق أو ما خالف فمردود তাহলে জাল বলা যাবে না।[১২৬]

বিষয়টি যখন এমন তখন হাদীছটির মূল বক্তব্যকে জাল বলা যাবে না, যখন তার শব্দগুলো এমন হবে– فما لم يوافق أو ما خالف فمردود.

ইমাম শাতিবী (রহ) এই হাদীছের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন তাতে আমাদের পূর্বোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

إن الحديث وحى من الله لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله، نعم يجوز أن تأتى السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، بل بما يكون مسكوتًا عنه فى القرآن، إلا اذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز فحينئذ لابد فى كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما صرح الحديث المذكور، فمعناه صحيح، صح سنده أو لا.

---

১২৬. আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-২/৮০-৮২

“হাদীছ হলো ওহী, কিতাবুল্লাহর সাথে এর বিরোধ সম্ভব নয়। হাঁ, কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী নয় এবং সামঞ্জস্য পূর্ণও নয়, এমন বিষয় সুন্নাহ দিতে পারে। এমনকি যে বিষয়ে কুরআন নিরব থেকেছে তাও সুন্নাহ দিতে পারে। তবে এই বৈধতার বিপরীতে যদি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তখন কিতাবুল্লাহর সাথে হাদীছের অবশ্য সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যেমনটি উল্লেখিত হাদীছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব হাদীছটির অর্থ সঠিক, এর সনদ সঠিক হোক বা না হোক।

সুতরাং হাদীছটির সনদ সঠিক হলেও হাদীছের হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের পক্ষের দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় হাদীছ :

إذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه ولاتنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به الخ.

হাদীছটির সনদ দুর্বল। ইবন হাযাম বলেছেন, এ একটা মুরসাল হাদীছ এবং বর্ণনাকারী আল-আসবাগ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। হাদীছটি যে মিথ্যা তা “فصدقوا به، قلته أو لم قله” কথা দ্বারা বুঝা যায়।

রাসূল (সা) নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনার অনুমতি কখনো দিতে পারেন না। মুতাওয়াতির হাদীছ এসেছে :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।”

রাসূল (সা) যে কথা বলেননি তা তাঁর প্রতি আরোপ করে যিনদীক কাফির ছাড়া কোন মুসলিম বর্ণনা করতে পারে না। এমন কথাই বলেছেন ইবন হাযাম।[১২৭] হাঁ, উল্লেখিত হাদীছটি একটি সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে قلته أولم أقله - বক্তব্যটি নেই। সুতরাং তখন হাদীছটি আর অস্বীকারকারীদের পক্ষে দলীল হতে পারে না।

তৃতীয় হাদীছ :

---

১২৭. প্রাগুক্ত-২/৭৮

إنى لا أحل الا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه.

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেন : এ একটা مُنْقَطَعْ হাদীছ। রাসূল (সা) এমনই করেছেন। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। ইমাম বাইহাকী বলেন, হাদীছটির মূল বক্তব্যে (فِىْ كِتَابِهِ) কথাটি যদি সঠিক হয় তাহলে তার অর্থ হবে আল্লাহ যা কিছু তাঁর প্রতি ওহী করেছেন। আর ওহী দু'প্রকার : ১. ওহী মাতলূ, ২. ওহী গায়র মাতলূ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হাদীছটি সুন্নাহকে অস্বীকারকারীদের দলীল হবে না। কারণ, কিতাব অর্থ কেবল কুরআন নয়, বরং সুন্নাহও এর অন্তর্গত।

এভাবে সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের প্রত্যেকটি হাদীছ যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে একটিও তাদের মত ও যুক্তির পক্ষে দলীল হতে পারে না।

সারকথা হলো, সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ হওয়াকে অস্বীকার করা এবং দাবী করা যে, ইসলাম কেবলই আল-কুরআন– একথা এমন কোন মুসলিম বলতে পারে না যার আল্লাহর দীন ও শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আছে। এমন কথা বাস্তবতার পরিপন্থী। কারণ, শরী'আতের অধিকাংশ হুকুম সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে যে সকল আহকাম এসেছে তার প্রায় সবই مُجْمَلْ (সংক্ষিপ্ত) ও মূলনীতি হিসেবে। ইবন হাযাম তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

ونسأل قائل هذا القول الفاسد : فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا؟

"এমন অসার ও অসত্য কথার ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন্ কুরআনে আছে, জুহর চার রাক'আত ও মাগরিব তিন রাক'আত, রুকু এমন, সিজদা এমন, কিরাআত এমন ও সালাম এমন? তেমনিভাবে যাকাতের নিসাব, গরু, ছাগল, মহিষ, সোনা-রূপা ইত্যাদির নিসাব ও অংশ, তেমনিভাবে হজ্জের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ইহরাম, রাময়ুল জিমার, হদের নিয়ম-নীতি, তালাকের অবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, সুদের পরিচয় ইত্যাদি কুরআনের কোথায় আছে?"[১২৮] এসবের কথা কুরআনে অতি সংক্ষেপে মূলনীতি আকারে এসেছে।

১২৮. প্রাগুক্ত-

যদি আমরা সুন্নাহ্ পরিত্যাগ করি তাহলে ঐসব বিধান বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হবে তা আমাদের জানা নেই। সে সকল বিষয় বুঝার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহই একমাত্র উপায়। সুতরাং কেউ যদি বলে, কেবল কুরআনে যা কিছু আছে তাই আমরা মানবো তাহলে সে কাফির হবে।"

রাসূলে কারীমের (সা) ব্যক্তি সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার মধ্যে পার্থক্য করার পদ্ধতি

ইসলামী শরী'আতে একথা সম্পূর্ণ স্বীকৃত যে, মহানবী (রা) রাসূল হিসেবে যে সব-কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন তা সবই সুন্নাহ এবং তার অনুসরণ উম্মাতের জন্য বাধ্যতামূলক। আর তিনি ব্যক্তি হিসেবে যেসব কথা বলেছেন অথবা কার্যত যেসব কাজ করেছেন তার প্রতি অবশ্য সম্মান দেখাতে হবে, কিন্তু অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা"-য় "বাবু বায়ানি আকসামি 'উলূম আন-নাবিয়্যি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাংগ ও অর্থবহ আলোচনা করেছেন। এখানে তার থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :[১২৯]

وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشئ من رأيى فإنما أنا بشر.

"দ্বিতীয় প্রকার হলো যা রিসালাতের তাবলীগ অধ্যায়ের অন্তর্গত নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী হলো : আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই, তোমরা তা গ্রহণ কর। আর আমি যখন নিজের রায় (মত ও সিদ্ধান্ত) থেকে কোন নির্দেশ দিই, সে ক্ষেত্রে আমি একজন মানুষ।"

যে ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) উপরোক্ত কথাগুলো বলেন তা একাধিক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি পূর্ণ পরিচ্ছেদে হাদীছগুলো সংকলন করেছেন এবং শিরোনাম দিয়েছেন :

---

১২৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা-১/৮১

باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره (ص) من معايش الدنيا على سبيل الرأى.

"পরিচ্ছেদ : নবী (সা) শরী'আতের বিধান হিসেবে যা বলেছেন তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক, পার্থিব জীবন যাপন বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবে যা বলেছেন তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।"

ইমাম মুসলিম (রহ) রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী (সা) মদীনায় এসে দেখতে পান যে, মদীনার লোকেরা খেজুর গাছের পুং কেশর স্ত্রী কেশরের সাথে মিলাচ্ছে। তিনি বলেন : তোমরা কী করছো? তারা বললো : আমরা আগে থেকে এমনটি করে আসছি। তিনি বললেন : তোমরা যদি তা না করতে তবে মনে হয় ভালো হতো। অতএব তারা একাজ ত্যাগ করে। ফলে খেজুরের ফলন কম হয়। তাঁরা একথা রাসূলের (সা) নিকট বর্ণনা করলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

ইমাম মুসলিম একই বিষয়ে তালহা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। সেই হাদীছে রাসূলে কারীমের (সা) বক্তব্য এসেছে এভাবে :

إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإنى لن أكذبَ على الله.

"আমি একটি ধারণা করেছিলাম। সুতরাং ধারণা ভিত্তিক কথার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করবে না। তবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের যা কিছু বলি তোমরা তা গ্রহণ কর। কারণ, আমি আল্লাহর নামে কখনো অসত্য বলি না।"

একই প্রসঙ্গে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (সা) আরো বলেন : أنتم أعلم بأمر دنياكم. "তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে বেশি জান।"[১৩০]

উল্লেখিত হাদীছসমূহের ভিত্তিতে ইমাম নাওবী (রহ) বলেন :

قالوا ورأيه صلى الله عليه وسلم فى أمور المعايش وظنه كغيره.

"'আলিমগণ বলেছেন, পার্থিব বিষয়ে রাসূলের (সা) মত ও ধারণা অন্যদের মতই।"

এ ব্যাপারে যায়িদ ইবন ছাবিতের (রা) একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি

১৩০. সহীহ মুসলিম, বাবু উজূবি ইমতিছালি মা কালাহু শারআন দূনা মা যাকারাহু (সা) মিন মা'আয়িশিদ দুনইয়া 'আলা সাবীলির রায়; ইবন তায়মিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া-১৮/১২

আরো স্পষ্ট হবে। একদিন কিছু লোক তাঁর নিকট এসে তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীছ শোনানোর আবেদন জানালো। তিনি বললেন :

كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিবেশী। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি এসে তাঁকে লিখে দিতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন আমরা কোন পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করতাম, তিনি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। যখন আমরা পরকালীন বিষয়ে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। আবার কোন খাদ্য-খাবার বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও সে বিষয়ে আলোচনা করতেন।"১৩১

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মহানবীর (সা) ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে কে এই সিদ্ধান্ত দেবে যে, তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ সুন্নাহর অনুসরণ অপরিহার্য এবং কোন্গুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের? একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা স্বয়ং এই পার্থক্য ও সীমা নির্দেশ করার অধিকারী নই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর কোন ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে নয়, বরং তার ভিত্তি এই যে, তিনি তাঁকে রাসূল বানিয়েছেন। এই দিক থেকে একটি মতাদর্শ হিসাবে তাঁর ব্যক্তি মর্যাদা ও নববী মর্যাদার মধ্যে নিশ্চিতই পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যেহেতু একই সত্তার মধ্যে কার্যত ব্যক্তি মর্যাদা ও নববী মর্যাদার সম্মিলন ঘটেছে এবং আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই আমরা স্বয়ং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নই যে, আমরা মহানবীর (সা) অমুক কথা মানবো, কারণ তিনি রাসূল হিসেবে তা করেছেন বা বলেছেন এবং অমুক কথা মানবো না, কারণ এর সম্পর্ক রয়েছে তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে। এই পার্থক্য করাটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) কাজ ছিল। ব্যক্তিগত ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি লোকদের কেবল স্বাধীনতাই প্রদান করেননি, বরং স্বাধীন মত

---

১৩১. ইমাম আন-নাওবী, শারহু মুসলিম-১৫/১১৬; হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা-১/২৮২

প্রদানের প্রশিক্ষণও দিতেন এবং রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে আনুগত্য করাতেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রদত্ত, যার মূলনীতি ও সীমা রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের একচ্ছত্র স্বাধীনতা নয়।

বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, যেগুলো স্পষ্টতই ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন এক ব্যক্তির পানাহার, পোশাক-পরিধান, বিয়ে, পুত্র-পরিজনের সাথে বসবাস, সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদন, গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন, পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি সব কাজও মহানবীর (সা) জীবনে একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ভুক্ত নয়, বরং তার মধ্যেও শরী'আতের সীমা ও পন্থা এবং নিয়ম-কানুনের শিক্ষাও শামিল রয়েছে। যেমন মহানবীর (সা) পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারের বিষয়। এর একটি দিক তো এই ছিল যে, তিনি একটি বিশেষ মাপকাঠির পোশাক পরতেন, যা তৎকালীন আরবে প্রচলিত ছিল এবং যা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগত রুচিও যুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে সমসাময়িক আরব পরিবারগুলোতে যে ধরনের খাদ্য পাকানো হতো, তিনি সেই ধরনের খাবারই খেতেন। এই খাদ্য নির্বাচনেও তাঁর রুচির দিকটিও যুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দিকটি এই ছিল যে, এই খাদ্য ও পরিধানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের কাজ ও কথার মাধ্যমে শরী'আতের সীমা এবং ইসলামী শিষ্টাচারের শিক্ষা দিতেন। এখন একথা আমরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) শেখানো শরী'আতের মূলনীতি থেকে জানতে পারি যে, এর মধ্যে একটি জিনিস তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় দিকটি তাঁর নববী সত্তার সাথে জড়িত ছিল। কারণ যে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন, লোকেরা কিভাবে নিজেদের পোশাক সেলাই করবে, নিজেদের খাদ্য কিভাবে রান্না করবে– শরী'আত তা নিজ কার্যসীমার আওতাভুক্ত করেনি। অবশ্য পানাহার ও পরিধানের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা নির্দিষ্ট করার বিষয়টি এবং ঈমানদার লোকদের নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচারের শিক্ষা শরী'আত তার আওতাভুক্ত করেছে।

মহানবীর (সা) ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে যে পার্থক্যই থাক তা আল্লাহ তা'আলার নিকট এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট রয়েছে এবং আমাদেরকে এ সম্পর্কে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে অবহিত করা হয়েছে যে, আমরা যেন কোথাও আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহকে আল্লাহর পরিবর্তে আনুগত্য পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী মনে না করে

বসি। কিন্তু উম্মাতের জন্য তো কার্যত তাঁর একটিই মর্যাদা বা সত্তা রয়েছে এবং তা হচ্ছে রাসূল হওয়ার মর্যাদা। এমনকি মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোন স্বাধীনতা থেকেই থাকে তবে তাও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার কারণেই; এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহই (সা) তাঁর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর এই স্বাধীনতা প্রয়োগের প্রশিক্ষণও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-ই দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ আমরা এভাবে করতে পারি যে, এই পার্থক্য কেবল দুটি পন্থায়ই করা যায় :

১. মহানবী (সা) স্বয়ং তাঁর কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দিয়ে থাকবেন যে, তা তাঁর ব্যক্তিগত পর্যায়ের।

২. মহানবীর (সা) প্রদত্ত শিক্ষা থেকে শরী'আতের যে মূলনীতি নির্গত হয় তার আলোকে বিষয় বিশেষজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সতর্ক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমগণ ব্যাপক বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে, তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ ধরনের কথা ও কাজগুলো তাঁর নবুওয়াতী সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর কোন্ ধরনের কথা ও কাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফেলা যায়। এ কোন আনাড়ি, আধাদক্ষ ও উদ্দেশ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজ নয়। যে কেউ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলে তার জন্য শর্ত এই যে, তাকে কুরআন ও সুন্নাহর এবং ইসলামী ফিকহের মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অধ্যয়নে জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হবে। এটা অন্তত সাধারণ লোকদের করার মত কাজ নয়।

এখন প্রশ্ন হলো বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের মধ্যেই যদি মত পার্থক্য হয়? সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, তাঁরা যখনই কোন জিনিসকে সুন্নাহ সাব্যস্ত করা বা না করার ক্ষেত্রে মত বিরোধ করেন তখন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে অবশ্যই দলীল পেশ করবেন। তাঁদের অবশ্যই বলে দিতে হয় যে, শরী'আতের মূলনীতিসমূহের মধ্যে কোন্ নীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁরা কোন জিনিসকে সুন্নাহ প্রমাণ করছেন, অথবা তার সুন্নাহ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছেন। এই অবস্থায় যেটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে তাই টিকে থাকতে পারবে এবং যে কথাই টিকে যাবে সে সম্পর্কে সকল বিশেষজ্ঞ 'আলিম জ্ঞাত হবেন যে, তা কোন্ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে টিকে গেছে। এই প্রকৃতির মত বিরোধ আতংকিত হওয়ার মত কোন জিনিস নয়।[১৩২]

---

১৩২. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-৪৮, ১৩৫-১৩৬

হাদীছসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি

فن الحديث (হাদীছ শাস্ত্র) সমালোচনারই (অর্থাৎ ঐতিহাসিক সমালোচনা) অপর নাম। হিজরী ১ম শতক থেকে আজ পর্যন্ত এ শাস্ত্রের এই সমালোচনার ধারা অব্যাহত আছে এবং কোন মুহাদ্দিছ অথবা ফকীহ একথা বলেননি যে, ইবাদাত সংক্রান্ত হোক অথবা আচার-ব্যবহার ও লেনদেন সংক্রান্তই হোক– যে কোন বিষয় সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সংযুক্তকারী কোন হাদীছ ঐতিহাসিক সমালোচনা ব্যতিরেকেই حُجَّتْ বা প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হবে। এই শাস্ত্র বাস্তবিকপক্ষে উপরোক্ত সমালোচনার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক যুগের উত্তম থেকে সর্বোত্তম ঐতিহাসিক সমালোচনাকেও অতিকষ্টে উপরোক্ত সমালোচনার যোগফল অথবা বিকশিত রূপ বলা যেতে পারে। বরং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হাদীছবেত্তাগণের সমালোচনার নীতিমালার মধ্যে এমন মাধুর্য ও সূক্ষ্মতা রয়েছে– যে পর্যন্ত বর্তমান কালের ইতিহাস সমালোচকগণের বুদ্ধিমত্তা এখনো পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীতে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (সা)-এর সুন্নাহ ও জীবনাচার এবং তাঁর যুগের ইতিহাসের রেকর্ডই এমন যা মুহাদ্দিছগণের এই কঠোর সমালোচনার মানদণ্ডের পরীক্ষা সহ্য করতে পেরেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ এবং কোন যুগের ইতিহাস সমালোচনার এরূপ কঠোর মানদণ্ডের সামনে টিকে থেকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তথাপি একথা বলা যায় যে, আরো অধিক সংশোধন ও উন্নতির পথ রুদ্ধ নয়। আজ যদি কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের অনুসৃত মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করার পর তার মধ্যে কোন স্ববিরতা ও ত্রুটি নির্দেশ করেন এবং অধিক সন্তোষজনক সমালোচনার জন্য কিছু মূলনীতি যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণসহ পেশ করেন তাহলে অবশ্যি তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য আনাড়ি, অনভিজ্ঞ ও উদ্দেশ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুটি মাত্র পদ্ধতি : ১. রিওয়ায়াত; ২. দিরায়াত। বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীছের দুটি অংশ : সনদ ও মতন। সনদ হলো বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা, আর মতন হলো সনদের শেষ প্রান্তে থাকা মূল পাঠ। রিওয়ায়াত হলো সনদের সাথে সম্পৃক্ত। একটি হাদীছের সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীছটির স্থান নির্ণয়

করাই হলো রিওয়ায়াত পদ্ধতিতে হাদীছের মূল্যায়ন। একটি হাদীছ, তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা নির্ণয়ের প্রধান পদ্ধতি হলো এই সনদ বিশ্লেষণ। কোন ব্যক্তির কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন সনদসহকারে বর্ণনার উদ্ভাবক আরববা। তাঁরা তাঁদের নবীর কথা ও জীবনের সকল ঘটনা সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য এই সনদ আবিষ্কার করেন। ইমাম আন-নাওবী (রহ) বলেন :[১৩৩]

"الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة مؤكدة."

"সনদ এই উম্মাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং একটি পূর্ণ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।" এ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠীর নেই।

ইবন হাযাম বলেন : 'কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির অন্য কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে বর্ণনা এবং এভাবে উপরের দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছানো– এ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠীকে দেননি, কেবলমাত্র মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন। তবে ইহূদীদের মধ্যে মুরসাল ও মু'দাল তথা বিচ্ছিন্ন সনদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যা তাঁদের নবী মূসা পর্যন্ত নয়, বরং শাম'উন পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। আর খ্রীস্টানদের নিকট কেবল তালাক হারাম ঘোষণার বিষয়টি ছাড়া এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির আরেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে ধারাবাহিক সনদের মাধ্যমে বর্ণনার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে বিশ্বস্ত ও মিথ্যাবাদী অথবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সনদে বহু বর্ণনা ইহূদী-নাসারাদের মধ্যে আছে।

আর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সনদে সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরামের কথা ও কাজ মুসলিম উম্মাহ বর্ণনা করেছেন, ইহূদীরা তাদের নবীর সংগী-সাথী অথবা তাদের সংগী-সাথীদের কোন কিছু তদ্রূপ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়নি। আর খ্রীস্টানরা তো কোনভাবেই শাম'উন ও বুলিস-এর উপরে পৌঁছতে সক্ষম নয়।[১৩৪]

আবূ 'আলী আল-জিবায়ী বলেন :[১৩৫]

خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء، لم يعطها مَنْ قَبْلَهَا : الاسناد والأنساب والإعراب.

---

১৩৩. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাদবীর আর-রাবী-১/১৫৮

১৩৪. প্রাগুক্ত-১৬০

১৩৫. প্রাগুক্ত

'আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস দ্বারা এই উম্মাতকে বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ করেছেন যা তাদের পূর্বে আর কাউকে দেননি। ১. সনদ, ২. নসব (বংশ), ৩. ই'রাব (আরবী শব্দের শেষ বর্ণের স্বরচিহ্ন)।

আল হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী :[১৩৬]

اِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

"পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর।"

এখনে أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ - দ্বারা মাতার আল-ওয়াররাক সনদ বুঝেছেন।[১৩৭] মুজাহিদ (রহ)ও অনুরূপ কথা বলেছেন, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : (أو أحد يأثر علما) - "অথবা এমন ব্যক্তিকে আন যে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য বর্ণনা করতে পারে।[১৩৮] তাই তো আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলেন :[১৩৯]

الإسناد من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.

'সনদ দীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা বলে দিত।' সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা (রহ) বলেন : যুহরী (রহ) একদিন একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। আমি বললাম : সনদ ছাড়াই হাদীছটি বর্ণনা করুন না। যুহ্রী (রহ) বললেন : আমি কি সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে উঠবো? সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন : اَلْاِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ। - সনদ হলো মু'মিন ব্যক্তির অস্ত্র।[১৪০]

আসলে সনদ হলো কোন তথ্যের মূল উৎসের সন্ধান করা। তথ্যটির যথার্থতা যাচাই করার জন্য তার সূত্রের সন্ধান করা। যে মাধ্যমে তথ্যটি পৌঁছেছে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা অবগত হওয়ার জন্য সনদ অত্যন্ত জরুরী। মূলত মুসলিমরাই সর্বপ্রথম তাঁদের নবীর সুন্নাহর হিফাযাতের জন্যই এই সনদের প্রচলন করে। তথ্যের মূল উৎসের সন্ধান দীনের একটি অংশ এবং সুন্নাহ বলে মুসলিম মনীষীগণ বিশ্বাস করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন :

---

১৩৬. সূরা আল-আহকাফ-৪

১৩৭. তাদবীর আর-রাবী-১৬০

১৩৮. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৩১৫

১৩৯. তাদবীর আর-রাবী-১৬০

১৪০. প্রাগুক্ত

(طلب العلو فيه سنة) - সনদের উচ্চতর সূত্রের সন্ধান করা একটি সুন্নাহ। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন : সনদের উচ্চতর সূত্রের সন্ধান করা পূর্ববর্তীদের থেকে চলে আসা একটি সুন্নাহ। কারণ আবদুল্লাহ ইবন উমারের (রা) অনুসারীরা তাঁর মুখ থেকে শোনা হাদীছের প্রথম সূত্র তথা উচ্চতর সূত্র উমারের (রা) নিকট থেকে শোনার জন্য কূফা থেকে মদীনায় আসতেন। মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-তুসী বলেন : সনদের নিকটবর্তী হওয়া তথা উচ্চতর সূত্রের কাছাকাছি যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।[১৪১]

এ কারণে সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরাম একটি সনদে একটি হাদীছ শোনার পর মধ্যবর্তী এক বা একাধিক সূত্র বাদ দিয়ে উচ্চতর সূত্রের মুখ থেকে হাদীছটি শোনার জন্য দিনের পর দিন ভ্রমণ করেছেন। আল-হাকিম বলেন, আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীছটি তাঁদের প্রমাণ। আনাস বলেন : একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললো, আপনার দূত আমাদের নিকট গিয়ে এমন এমন কথা বলেছেন। আসলে লোকটি উচ্চতর সূত্র থেকে কথাটির সত্যতা যাচাই করতে এসেছিল। যদি এ কাজটি অনুচিত হতো তাহলে রাসূল (সা) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং তাঁর দূতের কথার উপর নির্ভর করার নির্দেশ দিতেন। একটি মাত্র হাদীছের প্রথম তথা উচ্চতর সূত্রে পৌছার জন্য অনেক সাহাবী উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে দিনের পর দিন ভ্রমণ করেছেন।

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ আইউব আল-আনসারী (রা) মদীনাতে অবস্থানকালে একটি সনদে রাসূলুল্লাহর (সা) এই হাদীছটি শোনেন :

من ستر مؤمنا فى الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة.

"কেউ যদি দুনিয়াতে কোন মু'মিন ব্যক্তির বিপদ-আপদে ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাকে রক্ষা করবেন।' এই সনদে প্রথম সূত্র ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী 'উকবা ইবন 'আমির (রা)।

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে হাদীছটি যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল 'উকবা ছাড়া আর কেউ তখন জীবিত ছিলেন না। তাই আবু আইউব সেই মিসর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং 'উকবার মুখ থেকে হাদীছটি পুনরায় শোনেন।[১৪২]

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জনৈক সাহাবীর

---

১৪১. প্রাগুক্ত

১৪২. মিতফাহুল জান্নাহ্-৩৭-৩৯

সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ শুনি, যা আমি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। তাই সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শোনার জন্য আমি একটি উট কিনলাম এবং তার পিঠে সাওয়ার হয়ে একাধারে এক মাস ভ্রমণের পর শামে পৌঁছলাম। দেখলাম সেই ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবন উনাইস আল-আনসারী (রা)। আমি তাঁকে সেই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে হাদীছটি শুনেছি। তাবি'ঈদের মধ্যেও সনদের উচ্চতর সূত্রে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘপথ ভ্রমণের অনেক ঘটনা হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলতেন, আমি একটি মাত্র হাদীছের সন্ধানে বহু দিন ও বহু রাত্রির পথ অবশ্যই পাড়ি দেব।[১৪৩] উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল সুন্নাহ কেন, সকল প্রকার তথ্যের জন্যই সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীছ বিশারদগণ সেই সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের সমাপ্তি পর্যন্ত এত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, কোন দুর্বৃত্ত যেন তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাসূলে কারীমের (সা) নামে কোন জাল হাদীছ ছড়িয়ে দিতে না পারে। তাঁরা সনদে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরই হাদীছটি গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমালোচনার জন্য তাঁরা যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অনুসরণ করেছেন তা যেমন লিপিবদ্ধ আছে তেমনি যে সকল বর্ণনাকারীকে সমালোচনা করেছেন তাদের জীবন-চরিতও সংরক্ষিত আছে। "ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল" ও "ইলমু আসমায়ির রিজাল" নামে যে দুটি শাস্ত্র আছে তা মূলত এই জ্ঞানেরই ভাণ্ডার।

হাদীছসমূহের যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতের সাথে দিরায়াতের ব্যবহারও একটি সর্বসমর্থিত জিনিস। দিরায়াত অর্থ অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞান। তবে কেবলমাত্র এমন লোকদের দিরায়াত গ্রহণযোগ্য হবে যাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ফিকহের অধ্যয়ন ও চর্চায় নিজেদের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখিত কালের অধ্যবসায় ও অনুশীলনে এক বিশেষ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে এবং যাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে ইসলামী চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থার পরিসীমার বাইরের মতবাদ, মূলনীতি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে ইসলামী ঐতিহ্যকে ঐগুলোর মানদণ্ডে পরখ করার ঝোঁকপ্রবণতা নেই।

---

১৪৩. প্রাগুক্ত-৪০-৪১

স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা আধা দক্ষ লোকেরা যদি আনাড়ির মত কোন হাদীছকে মনোপুত পেয়ে গ্রহণ এবং কোন হাদীছকে নিজের মর্জির বিরুদ্ধ পেয়ে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে অথবা ইসলাম বিরোধী কোন চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত ব্যক্তিরা হঠাৎ উত্থিত হয়ে বিজাতীয় মানদণ্ডের আলোকে হাদীছসমূহের গ্রহণ বর্জনের পসরা বসায় তাহলে মুসলিম উম্মাহর নিকট তাদের দিরায়াত না গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আর না এই জাতির সামগ্রিক বিবেক ঐ ধরনের অর্থহীন বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের উপর কখনো আশ্বস্ত হতে পারে। ইসলামের সীমার মধ্যে তা কেবল ইসলামের আলোকে লালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধিই এবং ইসলামের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানই সঠিক কাজ করতে পারে। বিজাতীয় রং ও মেজাজ রঞ্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা প্রশিক্ষণহীন জ্ঞান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ব্যতীত কোন গঠনমূলক কাজ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে করতে পারে না।

বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার করে এভাবে বলা যায় যে, যাঁরা আরবী ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শী এবং যাঁরা ভাসাভাসাভাবে কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হাদীছ অধ্যয়ন করেননি, বরং গভীর দৃষ্টিতে হাদীছের সব গ্রন্থ অথবা অন্ততপক্ষে কোন একটি গ্রন্থ, যেমন সহীহ আল বুখারী অথবা সহীহ মুসলিম আদ্যপান্ত পাঠ করেছেন তাঁদের নিকট একথা গোপন থাকার কথা নয় যে, রাসূলে কারীমের (সা) নিজস্ব একটি ভাষা এবং নিজস্ব একটি প্রকাশ ও বাচনভঙ্গী রয়েছে যা সমস্ত সহীহ হাদীছসমূহে সম্পূর্ণ এক রূপ এবং রং-এ দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআনের মত তাঁর সাহিত্য ও স্টাইলে এতটা স্বাতন্ত্র বিদ্যমান যে, তার অনুকরণ অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বই সবাক অনুভূত হয়। তাতে তাঁর উন্নত মর্যাদা ও অত্যুজ্জ্বল অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। তা পড়তে পড়তে মানুষের অন্তর সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, একথা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বলতে পারে না। যেসব লোক অধিক পরিমাণে হাদীছসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং রাসূলের (সা) ভাষা ও বাচনভঙ্গী উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পেরেছেন তাঁরা হাদীছের সনদসমূহের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শুধু মূল বক্তব্য পাঠ করে বলে দিতে পারেন যে, হাদীছটি সহীহ অথবা মনগড়া কিনা। জাল হাদীছের ভাষাই বলে দেয় যে, তা রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষা নয়। এমনকি সহীহ হাদীছের মধ্যে পর্যন্ত শব্দগত বর্ণনা ও অর্থগত বর্ণনার (رواية باللفظ ورواية بالمعنى) মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। কারণ বর্ণনাকারী যেখানে মহানবীর (সা) বক্তব্য নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সেখানে তাঁর ভাষা ও স্টাইল সম্পর্কে অভিজ্ঞ

ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারেন যে, এই চিন্তাধারা ও বর্ণনা তো মহানবীর (সা), কিন্তু ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হাদীছসমূহের মধ্যে কখনো পাওয়া যেত না, যদি অসংখ্য দুর্বল হাফিয এগুলো ভুল পন্থায় নকল করে থাকতেন এবং অসংখ্য মস্তিষ্কের কার্যকারণ এগুলোকে নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী চুরমার করে থাকতেন। অসংখ্য মস্তিষ্ক একত্র হয়ে একটি একইরূপ বৈশিষ্ট্যের সাহিত্য সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব।

এ ব্যাপারটি কেবল ভাষা ও সাহিত্যের গণ্ডি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা থেকে সন্ধি ও যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী পর্যন্ত জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগসমূহে এবং ঈমান-আকীদা ও নীতি-নৈতিকতা থেকে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যন্ত সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সহীহ হাদীছসমূহ এমন এক চিন্তা ও কার্য পদ্ধতি পেশ করে যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব একক গঠন প্রকৃতির অধিকারী এবং যার সমস্ত অংশ ও শাখার মধ্যে পুরোপুরিভাবে যুক্তি সংগত মিল রয়েছে। এতটা সুবিন্যস্ত, সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা এবং এতটা পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড ব্যবস্থা অপরিহার্যরূপে একই চিন্তাধারা থেকে গড়ে উঠতে পারে, বিভিন্ন চিন্তার অধিকারী মস্তিষ্ক একতাবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবস্থা গঠন করতে পারে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার সাহায্যে শুধু জাল হাদীছই নয়, বরং সন্দেহযুক্ত হাদীছ পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব। সনদসূত্র দেখার পূর্বেই গভীর দৃষ্টির অধিকারী কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ এই প্রকার কোন হাদীছের বিষয়বস্তু দেখেই পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারেন যে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীছসমূহ একত্র হয়ে ইসলামের যেই চিন্তা পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থা গঠন করেছে তার মধ্যে এই বিষয়বস্তু কোনভাবেই ঠিকভাবে খাপ খায় না। কারণ এর মেজাজ প্রকৃতি পুরো জীবন ব্যবস্থার বিপরীত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।[১৪৪]

আমাদের পূর্বসূরী হাদীছ বিশেষজ্ঞদের হাদীছ যাচাই নীতিমালা

বিষয়টির প্রতি আরো একটু মনোযোগ দেব এজন্য যে, বর্তমানকালে প্রায়ই একটি অভিযোগ শোনা যায়, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ কেবলই সনদের দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে হাদীছ যাচাই বাছাই করেছেন। তাঁরা মতন তথা মূল হাদীছ সমালোচনার দিকে মনোযোগী হতে ব্যর্থ

১৪৪. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-৩১৯-৩২০

হয়েছেন। ফলে বহু জাল হাদীছ যেমন সহীহ হাদীছের মধ্যে ঢুকে গেছে তেমনি অনেক সহীহ হাদীছ বাদও পড়েছে। এখানে আমরা একটু খতিয়ে দেখতে চাই যে, তাঁরা যতটুকু করে গেছেন, বর্তমান যুগে তার চেয়ে বেশি কিছু করার সুযোগ আছে কি?

মনে করুন, যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাকে কোন কথা বলে তখন তথ্য দানকারীর সার্বিক অবস্থা, বিশ্বস্ততা, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে আপনার মন বলবে, সে সত্যবাদী। যখন আপনি তার তথ্যে আস্থাশীল হলেন তখন আপনি সেই তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেবেন। এবার দেখবেন যার সম্পর্কে তথ্যটি দেওয়া হয়েছে তার কথা, কাজ ও সার্বিক অবস্থা। এ অবস্থায় তার সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানলেন তার সাথে আপনার প্রাপ্ত তথ্যটি যদি মিলে যায় তাহলে তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সত্যতার ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ থাকবে না। তার প্রতি আপনি আস্থাশীল হবেন। আর যদি না মেলে তাহলে তথ্যটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করবেন। তথ্য প্রদানকারীর প্রতি সন্দেহের কারণে নয়, কারণ তার সততায় আপনি আস্থাশীল; বরং তথ্যটিতেই আপনার সন্দেহ জন্মেছে। সে ক্ষেত্রে হতে পারে তথ্য প্রদানকারী সন্দেহের ভিত্তিতে তথ্যটি দিয়েছেন অথবা তিনি ভুল করেছেন।

তেমনিভাবে এও সঠিক হতে পারে যে, এর মধ্যে গোপন কোন রহস্য আছে যা এখন প্রকাশ পাচ্ছে না, ভবিষ্যতে হয়তো তা প্রকাশ পাবে এবং আপনি তখন সবকিছু জানতে পারবেন। এমতাবস্থায় যদি আপনি অপেক্ষায় না থেকে তথ্য প্রদানকারীকে মিথ্যাবাদী বলে সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা ত্রুটিমুক্ত হবে না। কারণ এমন একজন তথ্য প্রদানকারীকে আপনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন যাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেন।

আমাদের পূর্ববর্তী হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টান্ত এমনিই। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বা সুন্নাহ হিসেবে সামনে যা পেয়েছেন, তা দুটি পর্যায়ে সমালোচনা করেছেন : ১. সনদের সমালোচনা, ২. মতন তথা মূল পাঠের সমালোচনা।

সনদ সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা রাবীর (বর্ণনাকারী) 'আদালত গুণসম্পন্ন হওয়া, পূর্ণ ধারণ ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়ার শর্ত করেছেন। সেই সাথে প্রত্যেক রাবী অবিচ্ছিন্নভাবে ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে শুনবেন এবং এভাবে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছবে। রাবীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা যে রীতি ও পন্থা অবলম্বন করেন তা কোন চরমপন্থা বলে কেউ অভিযোগ করতে পারে না। তাঁরা

রাবীদের বর্ণিত হাদীছ বা সুন্নাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্ত নির্ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে শ্রম, সাধনা ব্যয় করেন তা অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁরা মতন (মূল পাঠ) পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমালোচনার জন্যও কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেন, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. হাদীছটির ভাষা এমন দুর্বল হবে না যে, তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষীর মুখের ভাষা হওয়া অসম্ভব মনে হবে।

২. স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের পরিপন্থী হবে না, যাতে তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়।

৩. বিজ্ঞতা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম-নীতির পরিপন্থী হবে না।

৪. পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না।

৫. চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার পরিপন্থী হবে না।

৬. এমন নোংরামি ও নিকৃষ্টতার দিকে আহ্বানমূলক হবে না, দুনিয়ার সকল মত-পথের মানুষ যা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করে।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিফাত বা গুণাবলীতে বিশ্বাসের মূলনীতির যৌক্তিকতার পরিপন্থী হবে না।

৮. সৃষ্টি জগত ও মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাহ তথা রীতি-পদ্ধতির পরিপন্থী হবে না।

৯. এমন নির্বুদ্ধিতা ও স্থূল ভাব সম্পন্ন হবে না যা থেকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষ পরিচ্ছন্ন থাকে।

১০. কুরআন, মুতাওয়াতির সুন্নাহ, অথবা এতদুভয় থেকে উৎসারিত নিয়ম-নীতি, ইজমা' অথবা দীনের অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না।

১১. রাসূলের (সা) যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী হবে না।

১২. রাবী বিশেষ মত-পথে বিশ্বাসী এবং তিনি সে দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, হাদীছটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

১৩. অসংখ্য মানুষের সামনে সংঘটিত কোন বিষয়ের বর্ণনাকারী কেবল একজন বা দু'জন হলে হবে না।

১৪. হাদীছটি বর্ণনার পেছনে রাবীর ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ কাজ করেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

১৫. ছোট্ট একটা আমলের জন্য বিরাট ছাওয়াব বা প্রতিদানের কথা, অথবা সামান্য একটা অপরাধের জন্য চরম শাস্তির ভাবপূর্ণ হবে না।

উল্লেখিত পরিচ্ছন্ন ও শক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে মুহাদ্দিছগণ তাঁদের নিকট পৌঁছা সুন্নাহর মতনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেউ যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তাঁদের এই নীতিমালার শক্তি, স্বচ্ছতা, গভীরতা ও যথার্থতা মোটেই অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা কেবল উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে মতন পরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং আরো নানা মাপকাঠিতে পরীক্ষা করেছেন। যেমন : হাদীছটি মুদতারাব, শায, মু'আল্লাল, মাকলূব, মুদরাজ ইত্যাদি দোষে দুষ্ট হবে না।

এত গুরুত্ব সহকারে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও তাঁরা বলেছেন, সনদের দিক দিয়ে হাদীছ আহাদ হলে সহীহ বলে বিবেচিত হবে না। এ কারণে তাঁরা বলেন, আহাদীছে আহাদ দ্বারা 'ইলমে জন্নী বা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয় এবং তার ভিত্তিতে 'আমল করা ওয়াজিব। নিঃসন্দেহে এ তাঁদের চূড়ান্ত রকমের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

শুধুমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে কি হাদীছ গ্রহণ বা বর্জন করা যায়?

সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মানুষ কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির পরিপন্থী বলে মুহাদ্দিছগণের নিকট স্বীকৃত ও সহীহ বলে বিবেচিত অনেক হাদীছ অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তাঁরা মুসলিম উম্মাহর পরম আস্থাভাজন হাদীছ বিশারদগণের উপর আস্থা রাখতে না পারলেও নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞানের নির্ভুলতার উপর পূর্ণ আস্থাশীল। তাঁদের বুদ্ধি-জ্ঞান যে অপূর্ণ এবং তা ভুল করতে পারে, তা তারা ভুলে যান। পূর্ববর্তীকালে দার্শনিক, মু'তাযিলা ও উদ্দেশ্যপ্রবণ লোকেরা নিজেদের মত ও পথের সমর্থন না পাওয়ায় অনেক সহীহ হাদীছ নিছক তাঁদের বুদ্ধির পরিপন্থী বলে বাদ দিয়েছে। একালেও তাদের অনুসারীরা বিদ্যমান। তবে সেকালের বুদ্ধিবাদীদের উপর ভর করেছিল প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ, আর এ কালের বুদ্ধিবাদীদের মোহিত করেছে পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শন। তারা কুরআন-সুন্নাহকে গ্রীক চিন্তা-দর্শনের আলোকে বুঝতে গিয়ে যে ভুল করেছিল, আধুনিককালের এসব চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও একই ভুল করে চলেছে। মনে রাখতে হবে, রাসূলে কারীমের (সা) নামে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবই হাদীছ নয়। হাজার হাজার মুহাদ্দিছ অক্লান্ত পরিশ্রম করে অত্যন্ত যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ বর্ণনা থেকে যাচাই-বাছাই করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। তাঁদের যাচাই-বাছাইয়ের

নীতিমালার একটি নীতি এই ছিল যে, হাদীছ অবশ্য যুক্তি ও বাস্তব সত্যের পরিপন্থী হবে না। বিশুদ্ধ হাদীছ ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। যদি তেমন বিরোধ দেখা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যটি অথবা উভয়টি বুঝার অক্ষমতার কারণে হয়েছে। তেমনিভাবে আপাত দৃষ্টিতে বুদ্ধি ও যুক্তির বিরোধী কোন সুন্নাহ বাদ দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কারণ, গভীরভাবে অধ্যয়নের পর হয়তো জানা যাবে যে, তারা যে ব্যাখ্যা করছে তা ভুল এবং হাদীছ সঠিক। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য উপস্থাপন করে আমাদের আলোচনা শেষ করবো।

ইমাম আল-বাইহাকী (রহ) হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[১৪৫]

لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخفين أحق بالمسح عن ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما.

"দীন যদি যুক্তি ও অভিমতের ভিত্তিতে হতো তাহলে দুই মোযার উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তরে মাসেহ (স্পর্শ) করা অগ্রাধিকারসম্পন্ন ছিল। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দুই মোযার উপরিভাগে মাসেহ করতে দেখেছি।"

ইমাম আশ-শা'বী (রহ) বলেন, 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) বলেছেন :[১৪৬]

إياكم وأصحاب الرأى فانهم أعداء السنن.

"আপনারা যুক্তিবাদীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। কারণ তারা সুন্নাহর শত্রু।"

হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি যখন সম্পাদিত হচ্ছিল তখন রাসূল (সা) বললেন, লেখ : بسم الله الرحمن الرحيم, প্রতিপক্ষ বললো, না। লিখতে হবে- باسمك اللّهم; রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে রাজী হয়ে গেলেন। 'উমার (রা) তাঁর চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহর (সা) এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। রাসূল (সা) বললেন : ওহে 'উমার! তুমি দেখছো, আমি সম্মতি দিয়েছি, তারপরেও তুমি মানতে অস্বীকার করছো? 'উমার (রা) তখন সুন্নাহর বিপরীত নিজের চিন্তা

---

১৪৫. ইবন কায়্যিম আল-জাওযী, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৫৪; মিফতাহুল জান্নাহ-৪৮

১৪৬. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৫৬

ও যুক্তি থেকে সরে আসেন। পরবর্তীকালে এক ভাষণে তিনি সে কথা বলেন এভাবে :[১৪৭]

أيها الناس، اتهموا الرأى فى الدين، فلقد رأيتنى وإنى لأرد أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برأى فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبى جندل والكتاب يُكتب وقال : اكتبوا بسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال : يُكتب باسمك اللهم، فرضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبيتُ، فقال : يا عمر ترانى قد رضيت وتأبى؟

"ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা দীনের মধ্যে যুক্তি ও অভিমতকে অভিযুক্ত করুন। আবূ জান্দালের দিন অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল এবং রাসূল (সা) বললেন, লেখ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, প্রতিপক্ষ বললো : না, লেখা হবে– বিইসমিকা আল্লাহুম্মা- এবং রাসূল (সা) তাতে রাজি হয়ে গেলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহর এ কাজের প্রতিবাদ করেছিলাম আমার নিজের মত ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে। আমি তা মানতে অস্বীকার করি। রাসূল (সা) বলেন : ওহে 'উমার! তুমি আমাকে দেখছো যে, আমি রাজি হয়েছি, তারপরেও অস্বীকৃতি জানাচ্ছো?"

সেই সন্ধি সম্পাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরেকজন সাহাবী সাহল ইবন হুনাইফ (রা) ঠিক একই কথা বলেছেন :[১৪৮]

أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لرددته.

"ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা দীনের বিপরীতে নিজেদের যুক্তি ও অভিমতকে দোষারোপ করুন। আবূ জান্দালের দিনে আমার মধ্যে যুক্তি এত প্রবল ছিল যে, আমার ক্ষমতা থাকলে রাসূলুল্লাহর (সা) সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করতাম।"

ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুত'ইম একটি

১৪৭. প্রাগুক্ত-১/৫২

১৪৮. প্রাগুক্ত-১/৫৫

কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সংগে একদিন মু'আবিয়ার (রা) নিকট বসা ছিলেন। এক পর্যায়ে মু'আবিয়া (রা) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন :[১৪৯]

أما بعد، فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جُهالكم.

"অতঃপর এই যে, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, তোমাদের কিছু লোক এমন সব কথা বলে বেড়ায় যা আল্লাহর কিতাবে যেমন নেই, তেমনি তা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকেও বর্ণিত হয়নি। আসলে তারাই তোমাদের অজ্ঞ-মূর্খ লোক।"

ইবরাহীম আত-তাইমী (রহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) একবার একটি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) নিকট লোক পাঠালেন। প্রশ্নটি হলো : এই উম্মাতের কিতাব একটি, নবী একজন এবং কিবলাও একটি, তারপরেও তারা বিভক্ত হবে কিভাবে? ইবনুল 'আব্বাস (রা) জবাবে বললেন :[১৫০]

يا أمير المؤمنين! إنا انزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يعرفون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأى فإذا كان لكل قوم فيه رأى اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.

"ওহে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের নিকট কুরআন নাযিল হয়েছে, আমরা তা পাঠ করেছি এবং জেনেছি কোন প্রেক্ষাপটে তা নাযিল হয়েছে। কিন্তু আমাদের পরে এমন সব দল ও সম্প্রদায় হবে যারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায়ের থাকবে স্বতন্ত্র যুক্তি ও অভিমত। আর যখন প্রত্যেক দলের নিজস্ব মত ও যুক্তি থাকবে তখন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। আর যখন তারা বিভক্ত হবে মারামারি-কাটাকাটি করবে।"

---

১৪৯. প্রাগুক্ত-১/৫৬

১৫০. মিফতাহুল জান্নাহ-৫৬

আসলে সুন্নাহকে সরাসরি অস্বীকার করা এবং সহীহ সুন্নাহকে যুক্তি বিরোধী বা বুদ্ধির অগম্য বলে প্রত্যাখ্যান করা উভয়ই সমান। এতে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকতর মত বিরোধের সৃষ্টি হবে এবং মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিও বৃদ্ধি পাবে। একথাই ইবনুল 'আব্বাসের (রা) বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইবন কায়্যিম আল-জাওযী (রহ) রায় তথা যুক্তি-অভিমতের নিন্দায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) বহু বক্তব্য বর্ণনার পর সব শেষে যে মন্তব্য করেছেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরে এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন :[১৫১]

فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى الأشعرى رضى اللّه عليه عنهم يخرجون الرأى عن العلم، ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيابه، ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن، وأنه ليس على ثقة منه وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان وأن اللّه رسوله برئ منه.

"আবু বাকর আস-সিদ্দীক, 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, 'উসমান ইবন 'আফফান, 'আলী ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, যায়িদ ইবন ছাবিত, সাহল ইবন হুনাইফ, মু'আয ইবন জাবাল, মু'মিনদের মামা মু'আবিয়া, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)– এ সকল সাহাবীর প্রত্যেকে রায় তথা যুক্তি ও অভিমতকে 'ইলম তথা জ্ঞানের সীমা থেকে বের করে দেন। (অর্থাৎ তাঁরা রায়কে জ্ঞান বলে স্বীকার করেন না) তাঁরা এর নিন্দা করেন, এর ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং এর উপর ভিত্তি করে কোন ফাতওয়া দিতে বারণ করেন। তাদের কেউ কখনো কোন রায় বা মতামত প্রকাশ করতে বাধ্য হলে সংগে সংগে বলে দিতেন যে, এ তাঁর ظن বা ধারণা, দৃঢ় প্রত্যয় নয়। এ রায় তার নিজের থেকে যেমন হতে পারে, তেমনি তা হতে পারে শয়তানের থেকেও। আল্লাহ ও রাসূল (সা) এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।"

১৫১. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৫৬

মাওদূ' বা জাল হাদীছ

হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে মাওদূ" বা জাল হাদীছের উপস্থিতি ও আলোচনা দেখা যায়। হাদীছ-বিশারদগণ সেই সব হাদীছকে মাওদূ' বলে চিহ্নিত করেছেন যার সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন এক স্তরে অন্তত একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছে– যাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলে কারীম (সা) যে কথা বলেননি সে কথাকে তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ, যার পরকালীন পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (সা) বলেন :[১৫২]

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার বসার স্থানটি খুঁজে নেয়।"

রাসূলে কারীমের (সা) এসব কঠোর সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও 'মাওদূ' হাদীছের সূচনা হলো কিভাবে তা একটু পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

মাওদূ' হাদীছের সূচনা হলো কখন এবং কিভাবে?

হাদীছ অস্বীকারকারীরা একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, জাল হাদীছ স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তাদের ধারণার পেছনে যে ঘটনাটি কাজ করেছে তার রহস্য এই যে, জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি মদীনার কোন এক গোত্রের কন্যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল; কিন্তু কন্যাপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হিজরাতের পর প্রথমদিকেই ঐ ব্যক্তি একটি জুব্বা পরে সেই গোত্রে গিয়ে পৌঁছে এবং কন্যা পক্ষের নিকট গিয়ে বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে আমাকে এই জুব্বা পরিয়েছেন এবং আমাকে এই গোত্রের প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। গোত্রের লোকেরা তাকে বাহন থেকে নামিয়ে নেয় এবং গোপনে ব্যাপারটি মহানবীকে (সা) অবহিত করে। মহানবী (সা) বলেন ঃ "মিথ্যা বলেছে আল্লাহর এই দুশমন"। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, "যাও, তাকে যদি জীবন্ত পাও হত্যা কর। আর যদি মৃত পাও, তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দাও।" এই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে দেখে, সাপের কামড়ে সে মারা গেছে। অতএব নির্দেশ অনুযায়ী তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর মহানবী (সা) সাধারণ্যে ঘোষণা দিতে থাকেন, যে আমার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলে সে

---

১৫২. মাজমূ' ফাতাওয়া -১৮/১৬ ; মিফতাহুল জান্নাহ্-৫৪।

জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে যায়।[১৫৩] এই কঠোর সতর্কতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রায় ৩০-৪০ বছরের মধ্যে মনগড়া হাদীছ ছড়ানোর দ্বিতীয় কোন ঘটনা আর ঘটেনি।

আমরা হিজরী ৪০ সনকে নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্ন সুন্নাহ এবং মিথ্যা ও জাল সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্যকারী সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে মুসলিমদের বহু রক্ত ঝরে এবং মুসলিম উম্মাহ দৃশ্যত অনেক দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'আলী-মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্বে গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলিম আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন। খারিজীরা 'আলীর (রা) প্রবল সমর্থক থাকার পর এক সময় আলী-মু'আবিয়া উভয়ের ঘোরতর দুশমনে পরিণত হয়। আলীর (রা) শাহাদাতের পর উমাইয়্যা খিলাফাতকালে নবী বংশের সদস্যরা ও খারিজীদের একটি অংশ খিলাফাতে তাদের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা উমাইয়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করে। এভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী মুসলিম ঐক্যকে বিভক্ত করে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করে। দুঃখের বিষয় এই বিভক্তি একটা দীনী রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে ইসলামে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভাবনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

প্রতিটি দল-উপদলই নিজ নিজ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেকটি দলের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাই কোন কোন দল কুরআন ও সুন্নাহর অপ-ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, আবার অনেকে নিজেদের দাবীর সমর্থনে রাসূলুল্লাহর (সা) নামে মিথ্যা সুন্নাহ বানিয়ে নেয়। মিথ্যা আয়াত তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়া তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। কারণ, কুরআন তো লিখিত ও অসংখ্য হাফিজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল এবং লক্ষ-কোটি মানুষ সব সময় তার তিলাওয়াত ও চর্চায় নিয়োজিত ছিল। তাই তারা কৃত্রিম সুন্নাহ বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এই হলো মাওদূ' হাদীছের জন্ম ইতিহাস।

জালকারীরা সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি বিশেষের গুণ-মহত্ব বিষয়ক, নেতৃবৃন্দের গুণ ও মর্যাদা বিষয়ক বহু মনগড়া হাদীছ ছড়িয়ে দেয। ইতিহাসে দেখা যায় সর্বপ্রথম এ

১৫৩. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আদী রচিত 'আল-কামিল ফী মা'রিফাতিদ দু'আফা' ওয়াল মাতরূকীন' গ্রন্থের সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। পৃ. ২৯২-২৯৩।

কাজটি যারা করে তারা হলো দল-উপদল নির্বিশেষে শী'আ সম্প্রদায়। ইবন আবিল হাদীদ 'শারহু নাহ্‌জিল বালাগা' গ্রন্থে বলেন :[১৫৪]

اعلم أن أصل الكذب فى أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة

'জেনে রাখুন! মহত্ব ও মর্যাদা বিষয়ক হাদীছসমূহে মিথ্যার মূল শী'আদের দিক থেকে এসেছে।' আহলুস সুন্নাহর অনেক অজ্ঞ লোকও চুপ করে বসে থাকেনি, তারাও জাল হাদীছ দ্বারা শী'আদের জবাব দিয়েছে।[১৫৫] ইমাম আশ-শাফিঈ (রহ) বলেন :[১৫৬]

ما فى أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة

"প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে রাফেজীদের চেয়ে বেশি মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী অন্য কোন সম্প্রদায় নেই।"

কোন প্রজন্মে জাল হাদীছের সূচনা হয়?

সাহাবায়ে কিরাম (রা) এমন কাজ করেছেন, এমন কথা কল্পনাও করা যাবে না। তাঁরা তাঁদের জীবন, ধন-সম্পদ-সবই রাসূলের (সা) জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন, আত্মীয়-পরিজন, ঘর-বাড়ী ইসলামের জন্য ত্যাগ করেছেন এবং আল্লাহ-ভীতি ও আল্লাহ-প্রেম তাঁদের রক্তে-মাংসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা যে রাসূলুল্লাহর (সা) নামে মিথ্যা কথা প্রচার করবেন– তা যত প্রয়োজনই হোক না কেন– তা একেবারেই কল্পনার অতীত ব্যাপার। বিশেষত তাঁদের প্রিয়তম নবীর (সা) মুখ থেকে একথা শোনার পর :[১৫৭]

ان كذبًا علىَّ ليس ككذب على أحد، ومن كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

"নিশ্চয় আমার নামে মিথ্যা বলা অন্য কারো নামে মিথ্যা বলার মত নয়। আর

---

১৫৪. ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহ্‌জিল বালাগা-২/১৩৪।

১৫৫. আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৭৬।

১৫৬. মিফতাহুল জান্নাহ-৩৮।

১৫৭. সহীহ মুসলিম, বাবু তাগলীজ আল-কিয্‌ব আলা রাসূলিল্লাহ (সা); এ একটি মাশহূর হাদীছ। অনেক মুহাদ্দিছ এটিকে মুতাওয়াতির হাদীছ বলেছেন। ৭০ (সত্তর) জন সাহাবী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। (মাজমূ ফাতাওয়া-১৮/১৬।)

যে কেউ আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার স্থানটি খুঁজে নেয়।"

সাহাবায়ে কিরামের (রা) জীবন-ইতিহাস, তা রাসূলের (সা) জীবন কালেই হোক বা তাঁর ওফাতের পর হোক, আমাদেরকে একথা বলে যে, তারা পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ ভীতির উপর অটল ছিলেন। আর এই আল্লাহ-ভীতিই তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের নামে বানোয়াট কথা প্রচার করা থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখে। তাঁরা শরী'আতের বিধি-বিধানের সাথে একাত্ম হয়ে যান এবং নিজেরা যেমন তা পালন করতেন, তেমনি প্রচারও করতেন, ঠিক তেমনিভাবে যেভাবে তারা আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট থেকে পেয়েছিলেন, তা থেকে বিন্দু মাত্র এদিক ওদিক হওয়া মোটেই সহ্য করতেন না। আর এ কাজে তাঁদের ওপর যত কঠিন বিপদ-আপদ আসতো, তাঁরা একটুও পরোয়া করতেন না। দীন থেকে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয়েছে এমন কাউকে দেখলে, তা তিনি আমীরই হোন বা হোন খলীফা, তাঁরা কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন। তাঁরা তিরস্কার, ক্ষতি, মৃত্যু কোন কিছুর ভয় করতেন না।

খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) একদিন মসজিদে খুতবা দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন : ওহে জনগণ! নারীদের মাহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। যদি অধিক মাহর আল্লাহর নিকট সম্মানজনক হতো তাহলে এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহই (সা) উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। সাথে সাথে এক মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) উপস্থিতিতে 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন : উমার, একটু থামুন! আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন, আর আপনি তা নিষেধ করছেন? আল্লাহ কি বলেননি :[১৫৮]

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا.

"এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা হতে কিছুই প্রতি গ্রহণ করো না"।

উমার (রা) বললেন : একজন নারী ঠিক বলেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে।

খলীফা আবু বাকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে 'উমার (রা) দ্বিমত পোষণ করলেন। তিনি দলীল হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) এই হাদীছটি খলীফাকে শোনালেন :[১৫৯]

১৫৮. সূরা আন-নিসা-২০।

১৫৯. হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

أُمِـرْتُ اَنْ اُقَـاتِـلَ النَّـاسِ حَـتّى يَقُـوْلُوْا لاَ اِلـهَ اِلاَّ اللّهُ، فَـاِذَا قَـالُوْاهَا فَـقَـدْ عَـصَـمُـوْا مِنِّى دِمَـائَهُمْ وَاَمْـوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَـقِّـهَـا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ.

"লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা একথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যখন তারা তা বলবে, তারা নিজেদের রক্ত ও ধন আমা হতে বাঁচাবে। তবে ইসলামের অধিকার বাদে এবং তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহর কাছে।"

আবু বাকর (রা) বললেন : রাসূল (সা) اِلاَّ بِحَـقِّـهَا। (ইসলামের অধিকার) বলেননি? আর সেই হক বা অধিকার হলো যাকাত। আবু বাকর (রা) এই বাধা সেই 'উমারের (রা) নিকট থেকে পান যিনি তাঁর উঁচু মর্যাদা ও অগ্রগামিতার প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনিই সাকীফায়ে বানু সা'য়িদায় সর্বপ্রথম তাঁর হাতে বাই'আত করেন। আবু বাকরের (রা) প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সম্মানবোধ থাকা সত্ত্বেও যেটাকে তিনি সত্য বলে বুঝেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে কোন রকম দ্বিধা করেননি।

খলীফা 'উমার (রা) একবার এক ব্যভিচারিণীকে গর্ভাবস্থায় 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করার নির্দেশ দিলে 'আলী (রা) কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ ঐ মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আপনাকে দিয়েছেন, তবে তার গর্ভে যা আছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেননি। 'উমার (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি মন্তব্য করেন : 'আলী না থাকলে উমারের ধ্বংস ছিল অনিবার্য।

উমাইয়্যা শাসনকালে মদীনার ওয়ালী মারওয়ান একবার 'ঈদের জামা'আতে খুতবা দিলেন সালাতের পূর্বে। প্রখ্যাত সাহাবী আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) গর্জে উঠলেন। বললেন : সে সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে এবং এমনভাবে কাজ করেছে যেভাবে রাসূল (সা) করতেন না।

উমাইয়্যা শাসন আমলের আরেকজন স্বৈরাচারী আঞ্চলিক গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, আর এদিকে শ্রোতাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললেন :

عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله.

"আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর হারাম (মক্কা) কে হালাল করেছে, বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করেছে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে হত্যা করেছে।"

আরেকদিন হাজ্জাজ মসজিদে ভাষণের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি আল্লাহর কালাম (বাণী) পরিবর্তন করে ফেলেছেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ করলেন :

كذب لم يكن ابن الزبير يستطيع ان يبدل كلام الله ولا انت.

'মিথ্যে কথা, আল্লাহর কালাম পরিবর্তনের ক্ষমতা ইবনুয যুবাইরের নেই, তোমারও নেই।' হাজ্জাজ ধমকের সুরে বলেন, আপনি বুড়ো হয়ে বোধশোধ হারিয়ে ফেলেছেন, বসুন! ইবন 'উমারও হুঙ্কার ছেড়ে বলেন :

أما إنك لو عدت عدت.

'ওহে, যদি আপনি আবার এমন কথা বলেন, তাহলে আমিও বলবো।'[১৬০]

সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃঢ়তার এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়, তারা যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তাতে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না এবং তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় কারো চোখ রাঙ্গানিকেও পরোয়া করতেন না। সত্যের সাথে তারা সকলে এমনভাবে একাকার হয়ে যান যে, আল্লাহর রাসূলের নামে মিথ্যা কোন কিছু বলবেন তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, এমন কাজ কেবল প্রবৃত্তির অনুসারী ও পার্থিব কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তিরাই করতে পারে। আর ভীরু-কাপুরুষরাই মিথ্যা বলে। কিন্তু তাঁরা এর কোনটিই ছিলেন না। আর এটাও তাঁদের জন্য অসম্ভব ছিল যে, কেউ আল্লাহর রাসূলের (সা) নামে মনগড়া কথা বলবে, আর তাঁরা চুপ থাকবেন। এমন কি কেউ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর কোন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও তারা সেখানে মৌনতা অবলম্বন করতেন না।

মারওয়ান ইবন আল-হাকাম বলেন, আমি একবার 'আলী ও 'উসমানের (রা) হজ্জের সফরে মক্কা-মদীনার মাঝখানে তাঁদের সাথে দেখা করলাম। 'উসমান হজ্জে তামাত্তু' (تمتع) তথা হজ্জ ও উমরা এক সাথে করতে নিষেধ করছেন, আর 'আলী তা প্রত্যাখ্যান করে দুটিই এক সাথে করার জন্য জোরে জোরে তালবিয়্যা পাঠ করছেন। এ অবস্থা দেখে উসমান (রা) আলীকে বলছেন : আমি একটি

১৬০. ইমাম আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩৭, ৩৯।

জিনিস করতে নিষেধ করছি, আর আপনি সেটাই করছেন? জবাবে 'আলী (রা) বলছেন :[১৬১]

ماكنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس.

"কোন মানুষের কথায় আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ত্যাগ করতে পারি না।"

আল-বাইহাকী আল-বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন :[১৬২]

ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب.

"আমাদের সবাই নবীর (সা) হাদীছ সবসময় শুনতে পারতো না। কারণ আমাদের ছিল ক্ষেত-খামার ও বিভিন্ন রকম কাজ। তবে লোকেরা মিথ্যা বলতো না। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত থাকা লোকেরা অনুপস্থিতদের নিকট বর্ণনা করতো।"

কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার আনাস (রা) একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন জানতে চাইলেন : আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অথবা তিনি বললেন :

حدثني من لم يكذب والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب.

"আমাকে সেই ব্যক্তি বলেছেন যিনি মিথ্যা বলেন না, আল্লাহর কসম! আমরা মিথ্যা বলি না এবং মিথ্যা কি তাও জানি না।"[১৬৩]

আমাদের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জাল হাদীছ সাহাবীদের দ্বারা, তা সে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় হোক বা তাঁর পরে, হয়নি। কারণ তাঁরা সকলে ছিলেন পরস্পরের নিকট বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাঁরা একজন আরেকজনের নিকট কখনো মিথ্যা বলতেন না। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে ফিকহী মতপার্থক্য হয়েছে তা কোন দীনী বিষয়ে নিজ নিজ চিন্তা-গবেষণার পার্থক্যের কারণে হয়েছে। এর বেশি কিছু নয়। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন সত্য-সন্ধানী।

---

১৬১. মিফতাহুল জান্নাহ্-৩৫।

১৬২. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৭৮।

১৬৩. মিফতাহুল জান্নাহ্-৩৫।

অতঃপর তাবিঈদের যুগ। বয়ো:জ্যেষ্ঠ তাবিঈদের যুগের চেয়ে বয়ো:কনিষ্ঠদের সময়ে জাল হাদীছের প্রচার হয়েছে বেশি। কারণ এ সময়ের দ্বিতীয় যুগের চেয়ে প্রথম যুগে মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সম্মানবোধ, তাকওয়া ও দীনদারী অনেক বেশি ছিল। অনুরূপভাবে এ যুগের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক বিভক্তিও কম ছিল। সুতরাং প্রথম যুগে হাদীছ জাল করণের কারণও ছিল সীমিত। এর সঙ্গে আরো যোগ করা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম ও বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ তাবিঈনের উপস্থিতিও এর পশ্চাতে কাজ করেছে। তাঁদের জ্ঞান, ধার্মিকতা, আদল-ইসনাফ ও সচেতনতাই এর মূল কারণ। তাঁরা মিথ্যাবাদীদের মূলোৎপাটন করেছেন এবং তাদের সকল ষড়যন্ত্রের বীজ বেছে ফেলেছেন অথবা মিথ্যা কর্মতৎপরতাকে চিহ্নিত করেছেন।

হাদীছ জাল করণের কারণসমূহ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফাতের শেষ দিকে ও হযরত 'আলীর (রা) খিলাফাতকালে যে রাজনৈতিক বিভেদ ও বিভক্তি দেখা দেয় তা-ই ছিল হাদীছ জাল করণের প্রত্যক্ষ কারণ। একথাও উল্লেখ করেছি যে, সর্বপ্রথম এ দু:সাহসী কাজ যারা করে তারা হলো শী'আ সম্প্রদায়। এই বানোয়াট কারবারের প্রথম সূতিকাগার হলো ইরাক। পূর্ববর্তীকালের হাদীছ বিশারদগণ এমন কথাই বলেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ইমাম যুহরী (রহ) বলেন :[১৬৪]

يخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع من العراق ذراعا.

"আমাদের নিকট থেকে এক বিঘত পরিমাণ হাদীছ বেরিয়ে যায় এবং তা এক হাত লম্বা হয়ে ইরাক থেকে ফিরে আসে।"

ইমাম মালিক (রহ) ইরাককে "دار الضرب" (দারুদ দারব) বলতেন। অর্থাৎ সেখানে হাদীছ ছাঁচে ঢেলে নতুন করে তৈরী করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হতো, যেমন দিরহাম তৈরী করে লেনদেনের জন্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক বিভেদ যখন হাদীছ জাল হওয়ার মূল কারণ তখন জাল হাদীছের পরিধি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণেরও উদ্ভব ঘটেছিল। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো।

এক. রাজনৈতিক বিরোধ

রাজনৈতিক দলগুলো কম-বেশি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপে জড়িয়ে

---

১৬৪. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৭৯।

পড়ে। তাদের মধ্যে এ কাজে বেশি অগ্রগামী ছিল রাফিজী সম্প্রদায়। এই রাফিজীদের সম্পর্কে একবার ইমাম মালিককে (রহ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :[১৬৫]

لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون.

"তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের থেকে কোন কিছু বর্ণনা করবে না। কারণ, তারা মিথ্যা বলে।" কাজী শুরাইক ইবন 'আবদিল্লাহ, যিনি একজন মধ্যপন্থী শী'আ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বলেন :[১৬৬]

احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا.

"একমাত্র রাফিজী ছাড়া যার সাথে সাক্ষাৎ হবে তার থেকে গ্রহণ করবে। কারণ রাফিজীরা হাদীছ বানায় এবং তা দীন হিসেবে গ্রহণ করে।" হাম্মাদ ইবন সালামা বলেন, রাফিজীদের একজন প্রবীণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে বলেছেন :[১৬৭]

كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا فجعلناه حديثًا

"আমরা যখন একত্র হই এবং কোন জিনিস ভালো মনে করি তখন সেটাকে হাদীছ বানিয়ে নিই।" আর রাফিজীদের সম্পর্কে ইমাম আশ-শাফিঈর (রহ) মন্তব্য পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আহলুস সুন্নাহ রাফিজীদের হাদীছ জাল করার প্রমাণ হিসেবে তাদের (الوصية فى غدير خم) হাদীছটি উপস্থাপন করে। সেটির সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জ থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে غدير خم (গাদীরে খুম) নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করে সহযাত্রী সাহাবায়ে কিরামকে (রা) একত্র করেন এবং 'আলীর (রা) হাত ধরে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন :

هذا وصى وأخي والخليفة من بعدى فاستمعوا له وأطيعوا.

"এ আমার অছি (ভারপ্রাপ্ত), ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা। তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।" আহ্লুস সুন্নাহ বলেন : নিঃসন্দেহে এ একটি মিথ্যা হাদীছ, রাফিজীরা এটা তৈরী করেছে। এই হাদীছে আরো আছে :

---

১৬৫. ইবন তায়মিয়্যা, মিনহাজ আস-সুন্নাহ্-১/১৩।

১৬৬. প্রাগুক্ত

১৬৭. প্রাগুক্ত

من أراد أن ينظر إلى ادم فى علمه وإلى نوح فى تقواه وإلى إبراهيم فى حلمه وإلى موسى فى هيبته وإلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى علىّ.

"কেউ যদি আদমকে তাঁর জ্ঞানে, নূহকে তার তাকওয়ায়, ইবরাহীমকে তাঁর বিচক্ষণতায়, মূসাকে তাঁর সশ্রদ্ধ ভীতিতে এবং 'ঈসাকে তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগীতে দেখতে চায় সে যেন 'আলীকে দেখে।" এ হাদীছে আরো যা কিছু আছে তা নিম্নরূপ :

أنا ميزان العلم وعلى كفتاه والحسن والحسين خيوطه وفاطمة علاقته والأئمة منا عمود توزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا... حب على حسنة لا يضر معها سيئة، بغضه سيئة لا ينفع معها حسنة.

"আমি হচ্ছি দাড়িপাল্লা, 'আলী তার দু'পাশ, হাসান-হুসাইন তার রশি, ফাতিমা (পাল্লা) ঝুলানোর কাঁটা এবং আমাদের ইমামগণ ঝুলানোর খুঁটি। এই পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে আমাদেরকে যারা ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে তাদের আমলসমূহ ... 'আলীকে ভালোবাসা এমন পুণ্যের কাজ যা কোন পাপ কাজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আর তাকে হিংসা করা এমন পাপ কাজ যার সাথে কোন পুণ্যের কাজ সুফল দেয় না।"

এ হাদীছে তারা হযরত ফাতিমার (রা) মহত্ব ও মর্যাদার কথাও সংযুক্ত করতে ভুল করেনি। যেমন, ইসরা' ও মি'রাজের রাতে জিবরীল (আ) যখন নবীর (সা) নিকট আসেন তখন জান্নাতের سفرجل (পেয়ারা জাতীয় এক প্রকার) ফল সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি সেই ফল খান। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) ফাতিমাকে (রা) গর্ভে ধারণ করেন। এ কারণে নবী (সা) যখন জান্নাতের ঘ্রাণ নিতে চাইতেন তখন ফাতিমাকে শুঁকতেন।

এই বর্ণনাটির মধ্যে যে মনগড়া অনেক কথা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন ফাতিমার (রা) জন্ম হয় ইসরা ও মি'রাজের পূর্বে এবং খাদীজার (রা) ওফাতও হয় সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে। সালাত ফরয হয় ইসরার রাতে।[১৬৮]

---

১৬৮. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৭৯-৮০।

তারা 'আলী (রা) ও আহলি বাইতের অতিরঞ্জিত মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু হাদীছ বানিয়েছে, সেই সাথে সাহাবায়ে কিরাম (রা), বিশেষত: আবু বাকর (রা), 'উমার (রা) ও উঁচু স্তরের সাহাবীদের নিন্দামূলক বহু হাদীছ বানাতে ভুল করেনি। ইবন আবিল হাদীদ যিনি নিজেও একজন শী'আ, এ জাতীয় অনেক বর্ণনা আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন :[১৬৯]

فكل ذلك لا أصل عند أصحابنا ولا يثبته أحد منهم، ولا رواه أهل الحديث ولايعرفونه، وإنما هو شئ تنفرد الشيعه بنقله.

"আমাদের সঙ্গী-সাথীদের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই, তাদের কেউ তা প্রমাণ করতে পারেনি, হাদীছ বিশারদগণ তা বর্ণনা করেননি এবং তাঁরা জানেনও না। এসব জিনিস কেবল শী'আরা বর্ণনা করেছে।"

মু'আবিয়ার (রা) নিন্দায় তারা বানিয়েছে :[১৭০]

إذا رأيْتم معاوية على منبرى فاقتلوه.

"তোমরা যখন মু'আবিয়াকে আমার মিম্বারের উপর দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে।"

এভাবে রাফিজীরা তাদের খেয়াল-খুশী মত রাসূলের (সা) নামে অসংখ্য হাদীছ তৈরী করেছে। একথা বর্ণিত হয়েছে যে, রাফিজীরা 'আলী (রা) ও আহলি বাইতের অতিরঞ্জনমূলক মহত্ব ও মর্যাদা প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রায় তিন লক্ষ হাদীছ বানিয়েছে। হয়তো এ বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে, তবে এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা প্রচুর জাল হাদীছ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের এমন দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড দেখে একজন মুসলিম বিস্মিত না হয়ে পারে না। এসব রাফিজীর অধিকাংশ ছিল পারস্যের এবং তারা ইসলামের ঐক্য ছিন্ন-ভিন্ন করার গোপন মিশন নিয়ে শী'আ মতবাদের আড়ালে কর্মতৎপর হয়। অথবা তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের পূর্বের ধর্মবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। তাই তারা রাসূলে কারীমের (রা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে কোন রকম দ্বিধা করেনি।

রাফিজীদের এ কর্মতৎপরতার বিপরীতে আহলি সুন্নাতের কিছু অজ্ঞ লোকও বসে

---

১৬৯. শারহু নাহ্জিল বালাগা-১/১৩।

১৭০. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৮০।

থাকেনি। অল্প পরিসরে হলেও তারা মিথ্যার জবাব মিথ্যা দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। যেমন তারা বানিয়েছে :

ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منها لا إله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه ابو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين.

"জান্নাতের মধ্যে এমন কোন গাছ নেই যার প্রত্যেকটি পাতায় একথা লেখা নেই!

لا إله إلا اللّٰه محمد رسول اللّٰه أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين.

মু'আবিয়া (রা) ও উমাইয়্যা বংশের সমর্থকেরাও বসে থাকেনি। অন্যদের মত তাঁদের প্রশংসায় হাদীছ বানিয়ে নেয়। যেমন তারা রাসূলের (সা) নামে বলতে থাকে :

الآمناء ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية.

"বিশ্বস্ত তিনজন : আমি, জিবরীল ও মু'আবিয়া।"

"أنت منى يا معاوية وأنا منك."

"ওহে মু'আবিয়া! তুমি আমার অংশ এবং আমি তোমার অংশ।"

لا افتقد فى الجنة إلا معاوية فيأتى انفا بعد وقت طويل، فأقول : من أين يا معاوية؟ فيقول : من عند ربى يناجينى وأناجيه، فيقول : هذا بما نيل من عرضك فى الدنيا.

"জান্নাতে আমি মু'আবিয়াকে ছাড়া কাউকে হারাবো না। দীর্ঘ সময় পর সে আসবে। আমি বলবো : ওহে মু'আবিয়া! কোথা থেকে আসলে? সে বলবে : আমার রবের নিকট থেকে। তিনি ও আমি গোপনে আলাপ করছিলাম। তিনি বলবেন : দুনিয়াতে তোমার যে সম্মান-ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে তুমি এটা তার বিনিময়ে লাভ করেছো।"

আব্বাসী বংশের সমর্থকরাও হাদীছ বানানোর ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। তারা 'আলীর (রা) অছি হওয়ার বানোয়াট হাদীছের বিপরীতে আব্বাসের অছি হওয়ার মিথ্যা হাদীছ প্রচার করে। যেমন তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নামে প্রচার করে :

العباس وصى ووارثى.

"আল আব্বাস আমার অছি ও ওয়ারিছ।"

তাদের বানানো আরেকটি হাদীছ হলো :

اذا كان سنة خمس وثلاثين ومائة فهى لك ولولدك - السفاح والمنصور والمهدى.

"যখন এক শো পঁয়ত্রিশ সন আসবে তখন তা হবে তোমার এবং তোমার সন্তান আস-সাফফাহ, মানসূর ও আল-মাহদীর জন্য।"[১৭১]

এরপর আসে খারিজীদের কথা

খারিজীরা প্রথমে হযরত 'আলী (রা) সমর্থক ছিল, কিন্তু সিফফীন যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা) তাহকীম তথা শালিশী প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পর তাঁরা পক্ষ ত্যাগ করে। আর এ কারণে তাদের নাম হয় খারিজী। হাদীছ বিশারদগণ বলেন, ইসলামী দল-উপদলগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে তারাই কম মিথ্যাবাদী। এর কারণ হলো, তারা বিশ্বাস করে কাবীরা গুনাহ্ অথবা যে কোন ধরনের গুনাহ্ করা কুফরী কাজ। তাই তারা মিথ্যা বলা এবং কোন ধরনের পাপ করা বৈধ মনে করতো না। তাকওয়া-পরহেযগারিতে তারা খুব শক্ত অবস্থানে ছিল। তা সত্ত্বেও কোন কোন নেতা রাসূলুল্লাহর (সা) নামে মিথ্যা আরোপ করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন :[১৭২]

إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هو ينا أمرا صير ناه حديثا.

"এই সকল হাদীছ হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখবে কাদের নিকট থেকে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছো। আমরা যখন কোন কিছু চাইতাম সে বিষয়ে হাদীছ তৈরী করে নিতাম।"

এ ধরনের আরো কিছু জাল হাদীছের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে হাদীছ বিশারদগণ মনে করেন তা খারিজীদের প্রতি আরোপ করা সঠিক নয়। আসলে সেগুলোর প্রণয়নকারী হলো যিনদীক তথা অবিশ্বাসী ও রাফিজীরা। ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ বলেন :[১৭৩]

لقد حاولت أن أعثر على دليل علمى يؤيد نسبة الوضع إلى

---

১৭১. প্রাগুক্ত-৮১।

১৭২. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-লা-লী আল-মাসমূ'আ-২/৪৮৬।

১৭৩. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৮৩।

الخوارج، ولكنى رأيت الآدلة العلمية على العكس، تنفى عنهم هذه التهمة.

"আমি এমন একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি যা হাদীছ জাল করার সাথে খারিজীদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করবে। কিন্তু আমি এমনসব বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ এর বিপরীতে দেখতে পেয়েছি যা তাদের প্রতি আরোপিত এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।" কারণ খারিজীরা কবীরা গুনাহ্‌কারীদেরকে কাফির বলে জানে। মিথ্যা বলা তো কবীরা গুনাহ, আর সে মিথ্যা যদি হয় আল্লাহ্‌র রাসূলের নামে তাহলে তো তা আরো মারাত্মক। মুবাররিদ বলেন :[১৭৪]

الخوارج فى جميع أصنا فها تبرؤا من الكاذب ومن ذوى المعصية الظاهرة.

"খারিজীদের সকল শ্রেণী মিথ্যাবাদী ও প্রকাশ্য পাপাচারী থেকে নিজেদের দায় মুক্তির কথা বলে।"

এই খারিজীরা ছিল নির্ভেজাল আরব। অনারব যিনদীক ও জাতীয়তাবাদীরা তাদের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে কোন রকম প্ররোচনা দিতে সক্ষম হয়নি, যেমন হয়েছিল রাফিজীদের ক্ষেত্রে। ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে তারা ছিল ভীষণ দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। এ ব্যাপারে তারা শী'আদের মত "তাকিয়া" ও লুকোচুরি পছন্দ করতো না। এমন গুণ-বৈশিষ্ট্যের মানুষ ছিল তারা। তাই মিথ্যার সাথে তাদের কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নামে মিথ্যা বলা যদি তারা বৈধ মনে করতো তাহলে অবশ্যই তারা পরবর্তী খলীফা, আমীর-উমারা এবং স্বৈরাচারী শাসকগণ, যেমন যিয়াদ, হাজ্জাজ প্রমুখের নামেও মিথ্যা বলা সঙ্গত মতে করতো। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা প্রকাশ্যে ও মুখোমুখি তাদের বিরোধিতা করেছে, তাদের সামনে সত্য উচ্চারণ করেছে। সুতরাং তারা মিথ্যা বলবে কেন? তাই তাদের সম্পর্কে ঈমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন :

ليس فى أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج.

"প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে খারিজীদের চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কেউ নেই।"

ইবন তাইমিয়্যা (রহ) বলেন :

---

১৭৪. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল আদাব-২/১০৬।

ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعول من الخوارج.

"প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে খারিজীদের চেয়ে বেশি সত্যবাদী ও বেশি ন্যায় পরায়ণ দ্বিতীয় কেউ নেই।

তিনি আরো বলেন :[১৭৫]

ليسوا ممن يتعمدون الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال : إن حديثهم من أصح الحديث.

"যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে তারা তাদের মধ্যে নয়, বরং তারা সত্যবাদী হিসেবে এত প্রসিদ্ধ যে, বলা হয় : তাদের বর্ণিত হাদীছ সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছের অন্তর্গত।"

দুই. ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের লোকদেরকে যিন্দীক বলা হয়। ইসলামের ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এরা ভীষণ ঘৃণা করতো। ইসলামের সূচনা লগ্নের পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে বহু জাতি-গোষ্ঠী ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যারা পূর্ণরূপে ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ইসলামের প্রবল প্রবাহের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এমন শক্তি ও সাহসও তাদের ছিল না। তাই তারা ভিন্নপথ অবলম্বন করে। তারা মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য শক্তির মূল উৎস তাদের বিশুদ্ধ আকীদা (প্রত্যয়) কলুষিত ও তার সৌন্দর্য বিনষ্ট করে তাদের অটুট ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ কাজের সহায়ক হিসেবে তারা সুন্নাহ জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। কখনো তারা শী'আ মত-পথের অনুসারী বলে দাবী করে, আবার কখনো যুহদ ও তাসাওফের কথা বলে, আবার কখনো নিজেদের কথাকে দর্শন ও বিজ্ঞতা বলে প্রচার করে। আর এ সবের মূল লক্ষ্য ছিল মুহাম্মাদ (সা) ইসলামের যে মহা সৌধ রচনা করেন তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা। কিন্তু তারা তাতে সফল হয়নি।

তারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের নিকট ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে এমন সব কথা মহানবীর (সা) নামে ছড়ায় যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে তাদের মনগড়া হাদীছের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

---

১৭৫. মিনহাজ আস-সুন্নাহ্।

ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة.

"আমাদের প্রতিপালক আরাফার দিন সন্ধ্যায় একটি হৃষ্ট-পুষ্ট উটে আরোহণ করে অবতরণ করেন এবং বাহনের পিঠে আরোহনকারীদের সাথে হাত মিলান ও পায়ে চলা লোকদের সাথে বুক মিলান।"

خلق الله الملائكة من شعر ذراعه وصدره.

"আল্লাহ নিজের দু'বাহু ও বুকের লোম দ্বারা ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন।"

إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرقت فخلق نفسه منه.

"আল্লাহ যখন নিজ আত্মাকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন ঘোড়া সৃষ্টি করে দাবড়ান। তারপর ঘোড়া ঘেমে যায় এবং সেই ঘাম থেকে নিজ আত্মা সৃষ্টি করেন।"

إن الله لما خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الألف.

"আল্লাহ যখন (আরবী) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন তখন ب বর্ণটি সাজদা করে এবং ألف বর্ণটি সোজা দাঁড়িয়ে থাকে।"

النظرو إلى الوجه الجميل عبادة.

"সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত।"

الباذنجان شفاء من كل داء.

"বেগুন সর্বরোগের ঔষধ।"[১৭৬]

ইসলাম বিদ্বেষী যিন্দীকরা এভাবে আকীদা, আখলাক, হালাল-হারাম, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য জাল হাদীছ ছড়িয়ে দেয়। একজন যিন্দীক খলীফা আল-মাহদীর সামনে স্বীকার করে যে, তার বানানো এক শো হাদীছ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যখন আবদুল কারীম ইবন আবিল-'আওজা'কে হত্যার জন্য

১৭৬. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৮৪।

উপস্থিত করা হয় তখন সে স্বীকার করে যে, সে হালাল-হারাম বিষয়ক চারহাজার জাল হাদীছ ছড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা ধ্বংস করার অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে যে এই যিন্দীকরা কাজ করছিল তা আব্বাসীয় খলীফাদের অনেকে অবহিত ছিলেন। তাঁরা এই যিন্দীকদের শায়েস্তা করার নানাবিধ কর্মপন্থা হাতে নেন। তাদের অনেককে হত্যা, অনেককে জেল-জরিমানা ও দেশান্তরিত করেন। খলীফা আল-মাহদী তাদের সার্বিক পরিচয় ও কর্মকাণ্ড নজরদারির জন্য পৃথক একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের গোপন পরিকল্পনা অবহিত হওয়া এবং কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত লোকদের মধ্য থেকে তাদের নেতৃবৃন্দকে নজরদারি করা এই দফতরের কাজ ছিল। হাদীছ জালকারী এই যিন্দীকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলো : ১। আবদুল কারীম ইবন আবিল 'আওজা'। বসরার আমীর মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান ইবন 'আলী তাকে হত্যা করেন। ২। বায়ান ইবন সাম'আন আল-মাহদী। তাকে হত্যা করেন খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসরী। ৩। মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-মাসলূব। খলীফা আবু জা'ফার আল-মানসূর তাকে হত্যা করেন।[১৭৭]

তিন. জাতি, গোত্র, ভাষা, শহর ও ইমামের প্রতি অন্ধ ভক্তি ও পক্ষপাতিত্ব

যেমন শু'উবী তথা জাতীয়তাবাদীরা একটি হাদীছ বানায় :

ان الله إذا غضب أنزل الوحى بالعربية وإذا رضى أنزل الوحى بالفارسية.

"আল্লাহ যখন রেগে যান তখন আরবীতে ওহী নাযিল করেন, আর যখন সন্তুষ্ট থাকেন তখন ফারসীতে ওহী নাযিল করেন।" ইরানী জাতীয়তাবাদীদের এই মনগড়া হাদীছের বিপরীতে মুর্খ আরবরাও হাদীছ বানায় :

إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالفارسية وإذا رضى أنزل الوحى بالعربية.

"আল্লাহ যখন রেগে যান তখন ফারসীতে ওহী নাযিল করেন, আর যখন সন্তুষ্ট থাকেন তখন আরবীতে ওহী নাযিল করেন।"

---

১৭৭. প্রাগুক্ত-৮৫।

আগেরটির ঠিক বিপরীত অর্থ।

ইমাম আবু হানীফার (রহ) অন্ধ ভক্তরা তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হাদীছ বানায় :

سيكون رجل فى امتى يقال له أبوحنيفة النعمان هو سراج أمتى.

"অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের মধ্যে আবু হানীফা আল-নু'মান নামে একজনের জন্ম হবে। সে হবে আমার উম্মাতের প্রদীপস্বরূপ।"

ইমাম শাফি'ঈর (রহ) বিরোধীরা তাঁর মর্যাদা খর্ব করার জন্য হাদীছ বানায় :

سيكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتى من إبليس.

"খুব শিগগির আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সে হবে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীসের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।"

এভাবে ব্যক্তি, শহর, গোত্র, সময় ইত্যাদির মহত্ব ও মর্যাদা এবং দোষ-ত্রুটিমূলক বহু বানোয়াট হাদীছ ছড়ানো হয়, হাদীছ বিশারদগণ সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেছেন।

চার. কিসসা-কাহিনী ও ওয়াজ-নসীহত

সে সময় বহু লোক কিসসা-কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করতো। এ সকল কাহিনীকারদের অনেকের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির অভাব ছিল। তাদের উদ্দেশ্য হতো মানুষকে কাঁদানো এবং তাদের কথা শুনে মানুষ বিস্ময়বোধ করুক। এ জন্য তারা যে সব বানোয়াট কিসসা-কাহিনী শোনাতো তা রাসূলুল্লাহর (সা) নামে চালিয়ে দিত। যে সব কারণে হাদীছে বিকৃতি প্রবেশ করে ইবন কুতাইবা তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :[১৭৮]

والوجه الثانى القصاص فإنهم يميلون وجه العوام إليهم، يشيدون ما عند هم بالمناكيرو والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام عند القاص القعود ما كان حديثه عجيبا خارجا عن نظر المعقول، أوكان رقيقا يحزّن القلب فاذا ذكر

১৭৮. ইবন কুতাইবা, তা'বীলু মুখতালাফ আল-হাদীছ-৩৭৫।

الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران وعجيز تهاميل فى ميل، يبوئ الله وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة، فى كل مقصورة سبعون ألف قبة فلا يزال هكذا فى السبعين ألفا لا يتحول عنه.

"দ্বিতীয় প্রকার হলো গল্প ও কাহিনীকার। তারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতো। তারা নানা রকম মন্দ ও মিথ্যা কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করতো। সাধারণ মানুষের কাজ ছিল কাহিনীকারের সামনে বসে থাকা। কাহিনীকার যে সব কথা মানব বুদ্ধির বাইরের অথবা অতিসূক্ষ্ম বিষয়ক হতো, তা এমনভাবে বর্ণনা করতো যে, মানুষের অন্তরকে ব্যথিত করে তুলতো। যখন সে জান্নাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতো, বলতো : সেখানে আছে মিশক অথবা জা'ফরানের সৃষ্টি বড় ও সুন্দর নয়ন বিশিষ্ট নারী, তাদের পিছনভাগ মাইলের পর মাইল চওড়া। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে সত্তর হাজার কক্ষ বিশিষ্ট সাদা মুক্তোর তৈরী একটি প্রাসাদ দান করবেন, আর প্রত্যেক কক্ষের উপর থাকবে সত্তর হাজার গম্বুজ। এভাবে একের পর এক সত্তর হাজারের মধ্যে চিরকাল থাকবে, তার থেকে বের হবে না।"

তাদের বানানো আরেকটি হাদীছ হলো :

من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان.

"যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতিবার উচ্চারণ থেকে এমন একটি পাখি সৃষ্টি করেন যার ঠোঁট হয় সোনার ও পাখা মারজানের।"

এ সকল কাহিনীকার ও গাল্পিকদের মিথ্যাচার ও নোংরামীর চমকপ্রদ বহু ঘটনা হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তেমন একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

একদিন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (রহ) রুসাফার মসজিদে ছালাত আদায় করে বসে আছেন। তখন তাঁদের সামনে একজন গাল্পিক ওয়া'ইজ পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করলো এই সনদে :

حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا : حدثنا عبد

الرزاق عن قتادة عن أنس رض قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন আমাদেরকে বলেছেন, আবদুর রাজ্জাক কাতাদা থেকে এবং তিনি আনাসের (রা) সূত্রে, আমাদের বলেছেন : রাসূল (সা) বলেছেন : তার এই সনদে নিজেদের নাম শুনে ইমাম আহমাদ ইয়াহইয়ার দিকে এবং ইয়াহইয়া ইমাম আহমাদের দিকে তাকাতে থাকেন এবং জিজ্ঞেস করেন : আপনি কি এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন? বললেন : আল্লাহর কসম! হাদীছটি এই মুহূর্তের আগে আর কখনো শুনিনি। ও'য়াজ বা গল্পের আসর শেষ হলে ইয়াহইয়া ইশারা করে লোকটিকে ডাকলেন। সে কিছু প্রাপ্তির আশায় এগিয়ে আসলো। ইয়াহইয়া তাকে বললেন : এ হাদীছটি কে তোমার নিকট বর্ণনা করেছে? বললো : আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মাঈন। ইয়াহইয়া বললেন : আমি ইয়াহইয়া, আর ইনি আহমাদ। আমরা তো কেউ এটাকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বলে শুনিনি। সুতরাং আমাদের সূত্রে এটা বর্ণনা করলে কিভাবে? ওয়া'ইজ বললো : ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন যে এত বড় নির্বোধ তা এই মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। ইয়াহইয়া বললেন : এমন কথা বলছো কেন? সে বললো : এ পৃথিবীতে কেবল আপনারা দু'জন ছাড়া আর কোন আহমাদ ইবন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন নেই? আমি সতেরোজন আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈনের নিকট থেকে হাদীছ লিখেছি।[১৭৯]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সকল গাল্পিকদের চরম মূর্খতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের নিকট তারা খুবই সমাদৃত ছিল। এ সব কাজের প্রতিবাদ করার কারণে বহু আলিম তাদের অনুসারীদের দ্বারা চরম বাড়াবাড়ি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) তাঁর "تحذير الخواص من أكاذيب القصاص" গ্রন্থে এ রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একজন ওয়া'ইজ একবার বাগদাদে একটি মাহফিলে ওয়াজের মধ্যে বলেন : আল্লাহর বাণী–

عَسى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (الاسراء-٧٩)

---

১৭৯. ইমাম আস-সুয়ূতীর তাহযীর আল-খাওয়াস মিন আকাযীব আল-কাসসাস' গ্রন্থের সূত্রে 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ.-৮৬।

"আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।" এর অর্থ নবী (সা) আল্লাহর 'আরশে পাশাপাশি বসবেন। তার এমন ব্যাখ্যার কথা শুনে তৎকালীন বিখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী ভীষণ রেগে গেলেন এবং এর প্রতিবাদ করলেন। তিনি নিজের বাড়ীর দরজায় বড় করে লিখে দিলেন :

سبحان من ليس أنيس، ولا له على عرشه جليس.

"অতি পবিত্র তিনি যার ঘনিষ্ঠ কেউ নেই এবং নেই কেউ তাঁর আরশে পাশাপাশি বসার উপযুক্ত।" এতে বাগদাদের সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যায় এবং আত-তাবারীর বাড়ীর দরজায় এত পরিমাণ পাথর নিক্ষেপ করে যে পাথরের স্তূপে দরজা তলিয়ে যায়।[১৮০]

পাঁচ. ফিক্হ ও কালাম বিষয়ক মতপার্থক্য

ফিক্হ ও ইলমুল কালামের বিভিন্ন মাযহাবের মূর্খ ও বিকৃত স্বভাবের অনুসারীরা নিজ নিজ মাযহাবের সপক্ষে ও সমর্থনে বহু মিথ্যা হাদীছ ছড়িয়ে দেয়। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له.

"যে ব্যক্তি নামাযে তার দু'হাত উঠাবে তার নামায হবে না।"

المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة

"নাপাক ব্যক্তির জন্য তিনবার কুলকুচা করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয।"

امّنى جبريل عند الكعبة فجهرب "بسم الله الرحمن الرحيم."

"কা'বার পাশে-জিবরীল আমার ইমামতি করেছেন এবং জোরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করেছেন।"

من قال القرآن مخلوق فقد كفر.

"যে বলে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, সে কাফির হয়ে যাবে।"

كل من فى السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير

---

১৮০. আল-ইসলাম ওয়াল হাদারা-২/৫৫৯।

الله والقرآن وسيجئ أقوام من أمتى يقولون: القرآن مخلوق، فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه أمرأته من ساعتها.

"আল্লাহ ও কুরআন ছাড়া আসমান ও যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টবস্তু। আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা বলবে : কুরআন সৃষ্ট। যে এমন কথা বলবে সে মহান আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করবে এবং সাথে সাথে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।"[১৮১]

ছয়. সৎকাজের প্রতি আগ্রহ্ থাকা সত্ত্বেও দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

দুনিয়া বিরাগী সূফী, সাধক ও সরল আবিদরা এ কাজে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা মানুষের মধ্যে ইবাদাত-বন্দেগীর আগ্রহ ও আল্লাহ্ ভীতি সৃষ্টির জন্য রাসূলের নামে বহু হাদীছ বানিয়েছেন। তাঁরা একাজকে দীনের খিদমাত মনে করেছেন। তাঁরা ধারণা করেছেন, এ কাজের দ্বারা তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে গেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যখন সত্যিকার আলিমগণ তাদের এ কাজের প্রতিবাদ করেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেন :

من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار.

"যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।"

তখন তারা বলে, আমরা তো মিথ্যা বলছি রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে, বিপক্ষে নয়। এ কাজ তাঁরা করতেন দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও তাদের প্রবৃত্তির আনুগত্যের কারণে। যেমন তাঁরা কুরআনের বিভিন্ন সূরার অতিরঞ্জিত ফজীলত বিষয়ক বহু বানোয়াট হাদীছ ছড়িয়ে দেন। তাঁরা মনে করেন এর দ্বারা মানুষ কুরআন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে। নূহ ইবন আবী মারয়াম এ জাতীয় হাদীছ বানানোর কথা নিজেই স্বীকার করেছে। এ কাজের পক্ষে সে যুক্তি দেখিয়েছে যে, মানুষ কুরআন ছেড়ে আবু হানীফার ফিকহ্ ও ইবন ইসহাকের মাগাযীর প্রতি যখন অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে তখন তাদেরকে কুরআন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণের জন্য এ কাজ করেছে। এমনিভাবে বহু আবিদ-যাহিদ ব্যক্তি বিভিন্ন দু'আ ও যিকরের গুণ-মাহাত্ম্য বিষয়ক হাদীছ বানায়।

১৮১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৮৭।

সাত. খলীফা ও আমীর-উমারার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন

এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের একটি উদাহরণ হলো, গিয়াছ ইবন ইবরাহীম একদিন খলীফা আল-মাহদীর নিকট গিয়ে দেখে, তিনি কবুতর নিয়ে খেলছেন। তখন সে আল-মাহদীকে এই বিখ্যাত হাদীছটি শোনায় :

لا سبق إلا فى نصل أوخف أو حافر.

"বর্শার ফলা, উট অথবা ঘোড়ার ক্ষুর ছাড়া আর কোন কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।"

সে আল-মাহদীকে খুশী করার জন্য এর সাথে আরেকটি শব্দ যোগ করে–" أو جناح অথবা ডানায়।"

আল-মাহদী তাকে দশহাজার দিরহাম দান করেন। যখন সে আল-মাহদীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি মন্তব্য করেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার পাছা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করে, তাদের পাছার অনুরূপ। অতঃপর আল-মাহদী কবুতরটি যবেহ করার নির্দেশ দেন।

উল্লেখিত প্রধান সাতটি কারণ ছাড়াও আরো কিছু কারণে মিথ্যা হাদীছ রচিত হয়েছে। যেমন, হাদীছের সনদ ও মতনে অভিনবত্ব আনা, ফাতওয়ার সপক্ষে দলীল সৃষ্টি করা, বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া, বিশেষ ধরনের খাবার, চিকিৎসা ও পোশাকের প্রচলন ঘটানো ইত্যাদি। মুহাদ্দিছগণ এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আসলে হাদীছ জালকারীদের এসব বেপরোয়া ভাব, দৌরাত্ম্য ও দুঃসাহসের জন্য দায়ী তৎকালীন শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলীফা ও আমীরদের নিস্ক্রিয় ও উপেক্ষার মনোভাব। শুধু তাই নয়, তাঁদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে ক্ষেত্র বিশেষে এই ভ্রান্ত গোষ্ঠী তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরো উৎসাহ পেয়েছে। সে সময় তাঁরা যদি এদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে এই অপকর্মের এত প্রসার ঘটতো না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গিয়াছ ইবন ইবরাহীম খলীফা আল-মাহদীকে খুশী করার জন্য সহীহ হাদীছের সঙ্গে অতিরিক্ত মিথ্যা কথা জুড়ে দিল এবং খলীফা তা বুঝতে পেরেও তাকে দশহাজার দিরহাম দান করেন। আর যে কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি কবুতরটি যবেহ করার নির্দেশ দেন, সে বর্ণনায় কিন্তু এ কথা বুঝা যায় না যে, মিথ্যার উপলক্ষ্য সেই কবুতরটি ছিল বলে তিনি তা করেছেন। খলীফা আল-মাহদীর এ কর্মকাণ্ড সত্যিই বিস্ময়কর। যেখানে তাঁর উচিত ছিল এই জঘন্য মিথ্যাবাদীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং কবুতরটিকে মুক্ত করে দেয়া, সেখানে

তা না করে বিপরীত কাজটি করেন। এই মহাপাপীকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মুসলিম উম্মাহর বাইতুল মাল থেকে ইনাম-উপহার দিয়ে এই অপকর্মে আরো উৎসাহিত করেন। তিনি আরেকজন মিথ্যাবাদী মুকাতিল ইবন সুলাইমান আল-বালখী-এর সাথেও নমনীয় আচরণ করেন। একদিন সে আল-মাহ্দীকে বলে : আপনি অনুমতি দিলে আমি আব্বাস (রা) ও তার বংশধরদের প্রশংসামূলক হাদীছ বানাতে পারি। আল-মাহ্দী বলেন : এমন কিছু করার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকু বলেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন। তাকে শাস্তিও দেননি, তিরস্কারও করেননি।

হাদীছ জালকারীদের সাথে খলীফা হারুনুর রশীদের আচরণও ছিল নমনীয়। তাদের বিরুদ্ধে তিনিও কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না। হারুনুর রশীদ কবুতর উড়াতেন, তাই তাঁকে খুশী করার জন্য আবুল বুখতারী তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) মিথ্যা হাদীছ শোনায় যে, নবী (সা) কবুতর উড়াতেন। সে যে মিথ্যা বলছে তা জেনেও তিনি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি, শুধু এতটুকু বলেন যে, আমার এ দরবার থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি যদি কুরাইশ গোত্রের না হতে তাহলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম। আশ্চর্যের বিষয় যে, এতবড় মিথ্যাবাদী ছিল খলীফা হারুনুর রশীদের একজন কাজী।

তৎকালীন খলীফা ও আমীর তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যেরূপ কঠোর আচরণ করেন, তার কিছু অংশ যদি এই মিথ্যাবাদীদের সাথে করতেন তাহলে চিত্র ভিন্ন হতো। তাঁরা যিন্দীকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। তবে তা এ জন্য নয় যে, তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নামে মিথ্যা হাদীছ ছড়ায়, বরং তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় বলে তাঁরা তা করেন। মসজিদসমূহে অসংখ্য ওয়া'ইজ তাঁদের উপস্থিতিতে ও অসংখ্য মানুষের সামনে মিথ্যা হাদীছ বলতো, তথাকথিত বহু সূফী-সাধক নিজের মত-পথের সমর্থনে রাসূলুল্লাহর (সা) নামে মিথ্যা কথা প্রচার করতো, কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তা বন্ধ করবার কোন পদক্ষেপ নেননি। তবে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ নীরব থাকেননি। তাঁরা দীনের হিফাযাতের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। খিলাফাতের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে অসংখ্য বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছ জাল হাদীছের প্রবাহ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সহীহ হাদীছ সংরক্ষণের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁরা সহীহ হাদীছ সংরক্ষণের পাশাপাশি জাল হাদীছ এবং জালকারীদেরও চিহ্নিত করেন। শুধু তাই নয় বরং জালকারীরা কোন উদ্দেশ্যে, কি উপলক্ষে এবং কোথায় জাল হাদীছ প্রচার করেছে তাও বলে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই আলিমগণের মাধ্যমে কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর রাসূলের (সা) সুন্নাহর হিফাযাত করেন।

হাদীছ জালকরণ প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের ভূমিকা

হাদীছ জালকরণ ও জালকারীদের সম্পর্কে সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের সময় পর্যন্ত মুহাদ্দিছ ও আলিমগণের ভূমিকা এবং হাদীছ সংরক্ষণ ও বিকৃত হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছ পার্থক্যকরণে তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা বিষয়ে যারা অধ্যয়ন করবে তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তাঁরা যা করেছেন তার অতিরিক্ত কোন কিছু করা অসম্ভব এবং তাঁদের অনুসৃত রীতি-পদ্ধতিই সমালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। তাঁরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য ও বর্ণনাসমূহের সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার ব্যাকরণ তথা মৌলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জন্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরকালের জন্য গৌরব ও অহঙ্কারের বিষয় হয়ে থাকবে। সমালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত থেকে সুন্নাহকে রক্ষা ও কলুষমুক্ত করে পরিচ্ছন্ন করেন নিম্নে সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

এক. إِسْنَادُ الْحَدِيْثِ বা সনদসহকারে হাদীছ বর্ণনা :

রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন বিষয়ে একে অপরকে সন্দেহ করতেন না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যা কিছু বর্ণনা করতেন তা গ্রহণ করতে তাবি'ঈগণও কোন রকম দ্বিধা ও ইতস্তত করতেন না। গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেই সুযোগে ইহুদী 'আবদুল্লাহ ইবন সাবা মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ সাধনের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চরমপন্থার শী'আ মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে। এ কাজে সে সহায়ক শক্তি হিসেবে সুন্নাহকে কাজে লাগায় এবং কলুষিত করে। তারপর যুগের পর যুগ এ ধারা অব্যাহত থাকে। সুন্নাহকে কলুষিতকরণের সূচনাতেই সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরাম সতর্ক হয়ে ওঠেন। তখন তাঁরা তাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীছ বর্ণনা করলেই গ্রহণ করতেন না, বরং বর্ণনাকারীর নিকট তাঁরা জানতে চাইতেন কার সূত্রে কিভাবে সে হাদীছটি পেয়েছে। যখন তাঁরা সূত্রে উল্লেখিত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতেন কেবল তখনই সেই হাদীছটি গ্রহণ করতেন। ইবন সীরীন (রহ) বলেন :[১৮২]

لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا :

---

১৮২. মুকাদ্দামাতু মুসলিম-১/১০; মিফতাহুল জান্নাহ-৪০

سَمُّوا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

"পূর্ববর্তী লোকেরা হাদীছ বর্ণনাকারীর নিকট সনদ জানতে চাইতেন না। কিন্তু যখন ফিতনা (গোলযোগ) দেখা দিল তখন তাঁরা বললেন তোমরা তোমাদের লোকদের অর্থাৎ যাদের সূত্রে বর্ণনা করছো তাদের নাম আমাদের বল। তারা সনদ বর্ণনা করলে দেখা হতো তারা কোন মত-পথের। সুন্নাহপন্থী হলে তাঁদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো, আর বিদ'আতপন্থী হলে তাদের হাদীছ বর্জন করা হতো।"

অল্প বয়সী সাহাবী, ফিতনা তথা গোলযোগের অনেক পরে যাঁদের ওফাত হয়েছিল, তাঁদের সময় থেকেই হাদীছ গ্রহণ বর্জনে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন শুরু হয়। সহীহ্ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একবার বাশীর আল-'আদাবী 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আববাসের (রা) নিকট এসে হাদীছ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন : রাসূল (সা) এমন বলেছেন; রাসূল (সা) এমন বলেছেন। ইবনুল 'আব্বাস (রা) তাঁর বর্ণনায় মোটেই কান দিলেন না এবং তাঁর প্রতি তাকালেনও না। এ অবস্থা দেখে বাশীর বললেন : ওহে ইবনুল 'আব্বাস! আপনার কী হয়েছে, আপনি আমার হাদীছ শুনছেন না কেন? আমি আপনার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করছি, আর আপনি তা শুনছেন না? ইবনুল 'আব্বাস (রা) বললেন :[১৮৩]

إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.

"আমরা যখনই কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনতাম : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তখনই আমাদের দৃষ্টি তার প্রতি পড়তো এবং কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনতাম। অতঃপর লোকেরা যখন চড়াই-উতরাইয়ে আরোহণ করলো তখন আমরা যা কিছু জানি তাছাড়া আর কিছুই তাদের থেকে গ্রহণ করিনি।" অতঃপর মিথ্যা যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন তাবি'ঈন কিরামও হাদীছের সনদ চাইতে লাগলেন, আবুল 'আলিয়া বলতেন :[১৮৪]

---

১৮৩. প্রাগুক্ত

১৮৪. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯১

كنا نسمع الحديث من الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم.

"আমরা সাহাবীদের সূত্রে হাদীছ শুনতাম, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বাহনের পিঠে চড়ে তাঁদের নিকট চলে যেতাম এবং তাঁদের মুখ থেকেই তা আবার শুনতাম।" আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইবনুল মুবারক (রহ) বলতেন : সনদ হলো দীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা বলে যেত।

দুই. কঠোরভাবে হাদীছসমূহের সত্যতা যাচাই করা

এ কাজ করা হয়েছে সাহাবা, তাবি'ঈন ও এই শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট থেকে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর নবীর সুন্নাহর হিফাযাতের লক্ষ্যে উঁচু স্তরের বহু সাহাবীর জীবনকাল দীর্ঘ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘকাল জীবিত থেকে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। যখন মিথ্যার বেশাতি শুরু হলো তখন মানুষ এ সকল জীবিত সাহাবীদের শরণাপন্ন হলো। তাঁদের নিকট সুন্নাহর যে জ্ঞান ছিল তারা তা জেনে নিত, তেমনিভাবে যে সকল হাদীছ অন্যদের নিকট থেকে শুনতো তা আবার তাঁদের থেকে সত্যায়ন করে নিত। এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য তাবি'ঈ, এমনকি কোন কোন সাহাবী পর্যন্ত এক শহর থেকে আরেক শহরে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছেন এবং বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও প্রথম সূত্র থেকে হাদীছ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। প্রথম সূত্রের মুখ থেকে হাদীছ শোনার জন্য জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) শাম সফর ও আবূ আইউব আল-আনসারীর (রা) মিসর সফরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) একটি মাত্র হাদীছের সন্ধানে বহু রাত-দিন ক্রমাগতভাবে সফর করতেন। ইমাম শা'বী (রহ) একবার একজনের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণনা করে বলেন : কোন কিছুর বদলা ছাড়াই এটা গ্রহণ কর। এমন সময় ছিল যখন একজন মানুষ এর চেয়ে সামান্য কিছু শোনার জন্য মদীনার দিকে ছুটে যেত।[১৮৫] বিশর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাদরামী (রহ) বলতেন :[১৮৬]

إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار فى طلب الحديث الواحد.

"একটি মাত্র হাদীছ শোনার জন্য আমি বাহনে চড়ে যে কোন শহরের দিকে চলতাম।"

---

১৮৫. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/৯৪

১৮৬. প্রাগুক্ত-১/৯৫

সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় ইবন আবী মুলাইকা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ইবনুল 'আব্বাসের (রা) নিকট লিখে পাঠালাম তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন। কিন্তু তার মধ্যে মতবিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টিমূলক কোন কথার যেন উল্লেখ না করা হয়। ইবনুল 'আব্বাস (রা) বললেন, ছেলেটি সদুপদেশ দানকারী। আমি তার জন্য কিছু কথা নির্বাচন করে লিখে পাঠাবো এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা গোপন করবো? অতঃপর তিনি 'আলীর (রা) বিচারের সিদ্ধান্তসমূহ আনালেন। তা থেকে কিছু কথা লিখলেন, আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, এমন ফায়সালা 'আলী (রা) করেননি। যদি এরূপ করে থাকতেন তাহলে তো বলতে হতো যে, তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন।[১৮৭] তাঊস (রহ) থেকে আরেকটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন, ইবনুল 'আব্বাসের (রা) নিকট একখানা কিতাব আনা হয়। এর মধ্যে ছিল 'আলীর (রা) বিচারের সিদ্ধান্ত। ইবনুল 'আব্বাস তা থেকে সামান্য কিছু বহাল রেখে অবশিষ্টাংশ মুছে দেন। আসলে হযরত 'আলীর (রা) ওফাতের পর লোকেরা তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে নিজেদের মনগড়া কথা সংযোজন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তা 'আলীর (রা) ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'আলী (রা) পথভ্রষ্ট ছিলেন না, বরং যারা এসব কথা সংযোজন করেছে, তারাই ছিল পথভ্রষ্ট। আর এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায়ই হাদীছ যাচাই-বাছাই শুরু হয়ে যায় এবং সুন্নাহর নামে যে জালিয়াতি কারবার শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন।

তিন. রাবীদের সমালোচনা এবং সত্য-মিথ্যা বিষয়ে তাঁদের অবস্থার বর্ণনা

এ এক বিশাল অধ্যায়, হাদীছ বিশারদগণ এর মাধ্যমে মিথ্যা ও মনগড়া হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছ যেমন পৃথক করেছেন, তেমনিভাবে পৃথক করেছেন দুর্বল হাদীছ থেকে শক্তিশালী হাদীছসমূহকে। এ কাজে তাঁরা কল্পনাতীত শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছেন। তাঁরা রাবীদের জীবন-ইতিহাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে কারো তিরস্কারের কোন পরোয়া করেননি। রাবীদের জীবনের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে মানুষকে অবহিত করতে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ করেননি। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তানকে (রহ) একবার বলা হলো :

أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟

১৮৭. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯১

"এই সকল লোক যাদের হাদীছ আপনি পরিহার করছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ানোর ভয় কি আপনি করেন না?" জবাবে তিনি বলেন :

لأن يكون هؤلاء خصمى أحب إلىَّ من أن يكون خصمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لمَ لم تذب الكذب عن حديثى؟

"কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার প্রতিপক্ষ হয়ে একথা বলার চেয়ে যে, তুমি আমার হাদীছ থেকে মিথ্যা দূর করনি কেন, এ সকল লোক প্রতিপক্ষ হওয়া আমার অধিক মনপূত।"[১৮৮]

এ কাজের জন্য তাঁরা একটি নীতিমালা তৈরী করে তা অনুসরণ করেন এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত নেন কার নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যাবে, কার নিকট থেকে গ্রহণ করা যাবে না, কার নিকট থেকে লেখা যাবে এবং কার নিকট থেকে লেখা যাবে না।

যাদের হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না, এরূপ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বর্জিতদের কয়েকটি শ্রেণী নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপকারী

'আলিমগণের এ ব্যাপার ইজমা' হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি যে মিথ্যা আরোপ করে তার হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না, তেমনি তাঁদের আরো ইজমা' হয়েছে যে, এ কাজ সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্গত। তবে এমন ব্যক্তির কাফির হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। একদল বলেন, সে কাফির হয়ে যাবে, আর অন্যরা তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলেন। তার তাওবা কবুল হবে কি হবে না সে ব্যাপারেও 'আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আল-বুখারীর উস্তাদ আবূ বাকর আল- হুমাইদী (রহ) মনে করেন, তার তাওবা কখনো কবুল হবে না। ইমাম নাওবী (রহ) মনে করেন, তার তাওবা কবুল হবে, তার সাক্ষ্যের মত তার বর্ণনাও গ্রহণ করা যাবে এবং তার অবস্থা হলো কাফিরের মত যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবুল মুজাফ্‌ফার আস-সাম'আনী (রহ) বলেছেন, যে একটি মাত্র হাদীছে মিথ্যা বলেছে, তার বর্ণিত পূর্ববর্তী সকল হাদীছ পরিত্যক্ত হবে।[১৮৯]

---

১৮৮. প্রাগুক্ত-৯২

১৮৯. প্রাগুক্ত-

২. সাধারণ কথাবার্তায় যারা মিথ্যা বলে

যারা রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তো কখনো মিথ্যা আরোপ করে না, তবে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলে, এমন লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের ইজমা' হয়েছে যে, যদি কারো জীবনে একবারও মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয় তাহলেও তার হাদীছ পরিত্যক্ত হবে। ইমাম মালিক (রহ) বলেন :[১৯০]

لا يؤخذ العلم عن أربعة : رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ورجل يكذب فى أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.

"চারজনের থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা যাবে না : ১. এমন ব্যক্তি যার নির্বুদ্ধিতা প্রসিদ্ধ– হোক না সে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বর্ণনাকারী। ২. এমন ব্যক্তি যে মানুষের সাথে সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলে, যদিও আমি তাকে অভিযুক্ত করি না যে, সে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। ৩. প্রবৃত্তির অনুসারী কোন ব্যক্তি, যে তার মত-পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। ৪. এমন কোন শায়খ তথা পীর-বুযর্গ যার অনেক মহত্ব-মর্যাদা ও ইবাদাত আছে, তবে সে যা বর্ণনা করে তা বোঝে না।"

হাঁ, কেউ যদি মিথ্যা বলা থেকে তাওবা করে, তারপর তার 'আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) প্রসিদ্ধি পায়, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তার তাওবা কবুল ও তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণের কথা বলেছেন। তবে আবূ বাকর আস-সায়রাফী (রহ) বলেন :[১৯১]

كل أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر.

"মিথ্যা বলার অভিযোগে যে বর্ণনাকারীর খবর আমরা পরিত্যাগ করেছি, তাকে

১৯০. প্রাগুক্ত-৯৩

১৯১. প্রাগুক্ত-

আমরা তারই উপর পেয়েছি। সুতরাং লোক দেখানো তাওবার কারণে তার সে বর্ণনা আবার আমরা গ্রহণ করবো না।"

৩. বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি

অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন বিদ'আতী ব্যক্তি যদি তার বিদ'আত দ্বারা কুফরীর স্তরে পৌঁছে যায় তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। তদ্রূপ কুফরীর স্তরে না পৌঁছলেও মিথ্যা বলা যদি সঙ্গত বলে বিশ্বাস করে তাহলে তার হাদীছও গ্রহণ করা যাবে না। তবে মিথ্যা বলাকে যদি হালাল মনে না করে তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না, অথবা তাঁর ভ্রান্ত মত-পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায় কি জানায় না– এসব পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে 'আলিমগণের কিছু মতপার্থক্য আছে। হাফিজ ইবন কাছীর (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে অতীতে ও বর্তমানে বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশের মত হলো, দেখতে হবে সে তার মত-পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায় কিনা। যদি আহ্বান জানায় তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না, আর যদি আহ্বান না জানায় তাহলে গ্রহণ করা যাবে। ইবন হিব্বান বলেন : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত হয়েছেন যে, উপরোক্ত শ্রেণীর কারো বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই। ইমাম শাফি'ঈর (রহ) মতও এরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইবন হিব্বানের এ ঐকমত্যের দাবী সঠিক নয়। কারণ 'ইমরান ইবন হিত্তান, যিনি একজন খারিজী, হযরত 'আলীর (রা) ঘাতক 'আবদুর ইবন মুলজিমের একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এবং খারিজীদের চিন্তা ও মতের দিকে একজন বড় মাপের আহ্বানকারী ছিলেন, তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী (রহ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম শাফি'ঈও বলেছেন : রাফিজীদের খাত্তাবিয়্যা উপদল ছাড়া অন্য সকল প্রবৃত্তিপন্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো। কারণ, খাত্তাবিয়্যা রাফিজীরা তাদের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে বৈধ মনে করে।[১৯২] ইমাম আবদুল কাদির আল-বাগদাদী তাঁর 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) প্রবৃত্তিপন্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে অবশেষে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আসলে যে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট, তা হলো তাঁরা এমন বিদ'আতীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতেন যে তার বিদ'আতের দিকে আহ্বান জানায় এবং যা তার বিদ'আতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথবা তারা এমন

১৯২. ইখতিসারু 'উলূম আল-হাদীছ-১০৭

সম্প্রদায় যারা মিথ্যা বলা বৈধ মনে করে এবং তাদের মত ও পথের সমর্থনে জাল হাদীছ তৈরী করে। এ কারণে তাঁরা রাফিজীদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইয়াযীদ ইবন হারূন বলতেন, আমরা প্রত্যেক বিদ'আতীর বর্ণনা লিখে থাকি, যদি না সে তার বিদ'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। তবে ব্যতিক্রম হলো রাফিজীরা, তাদের বর্ণনা লিখি না। কারণ তারা মিথ্যা বলে। তাঁরা কোন কোন শী'আ উপদলের বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন, যারা সততা ও আমানতদারীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।[১৯৩]

৪. যিন্দীক, ফাসিক, অমনোযোগী ও অসতর্ক ব্যক্তিবর্গ যারা বোঝে না যে, কী বর্ণনা করেছে– এবং যাদের মধ্যে 'আদালত, দাবত ও ফাহ্ম (ন্যায়পরায়ণতা, পূর্ণ ধারণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা) গুণাবলীর অনুপস্থিতি থাকবে তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইবন কাছীর (রহ) বলেন :[১৯৪]

المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدَّث من حفظه، فاهما إن حدث عن المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته.

"বিশ্বস্ত এবং যা বর্ণনা করে তা পূর্ণরূপে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য। আর তিনি হবেন এজন মুসলিম, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিকৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির কারণসমূহ থেকে মুক্ত। তাছাড়া তিনি হবেন সতর্ক ও মনোযোগী'। যদি স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেন তাহলে প্রখর স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন, আর যদি ভাব বা অর্থ বর্ণনা করেন তাহলে তা বুঝার ক্ষমতা সম্পন্ন। যে সকল শর্ত আমরা উল্লেখ করলাম তার কোন একটির ঘাটতি থাকলে তার বর্ণনা পরিত্যক্ত হবে।"

৫. যে সকল রাবীর বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জন স্থগিত রাখতে হবে তারা বিভিন্ন শ্রেণীর। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শ্রেণী উল্লেখ করা হলো :

ক. যে সকল বর্ণনাকারীর অভিযুক্ত হওয়া ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মতপার্থক্য আছে।

---

১৯৩. মিনহাজ আস-সুন্নাহ-১/১৩; শারহু নুখবাতিল ফিক্‌র-১০৫/১০৮

১৯৪. ইখতিসারু 'উলূম আস-হাদীছ-৯৮

খ. যার বর্ণনায় ভুলের পরিমাণ বেশি ধরা পড়েছে এবং যার বর্ণনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইমামগণের মতবিরোধ বিদ্যমান।

গ. যার বিস্মৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে,

ঘ. শেষ জীবনে যার বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা দিয়েছে,

ঙ. যার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে,

চ. যে কোন কিছু বাছ-বিচার না করে বিশ্বস্ত ও দুর্বল (ছিকাহ ও দা'ঈফ) উভয়ের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করে।

চার. হাদীছের শ্রেণী বিভাগের জন্য সাধারণ নিয়ম-নীতি প্রণয়ন

জাল হাদীছ সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধকল্পে আমাদের হাদীছ বিশারদগণ যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার মধ্যে হাদীছের শ্রেণী বিভাগকরণ অন্যতম। হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে তাঁরা হাদীছসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সহীহ, হাসান ও দা'ঈফ। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীছ বিশারদগণ 'হাসান' নামে হাদীছের কোন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর (রহ) যুগে এ পরিভাষাটি চালু হয়। এরপর থেকে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীছ সহীহ ও দা'ঈফ- এ দু'প্রকারেই বিভক্ত ছিল। যাই হোক উপরোক্ত তিন প্রকার (সহীহ, হাসান ও দা'ঈফ) হাদীছকে আরো বহু প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। হাদীছ বিশারদগণ বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীছকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তবে হাদীছ প্রধানতঃ দুই প্রকার : মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) ও মারদূদ (পরিত্যাজ্য)। 'মাকবূল' সেই বর্ণনা যার সনদে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আর যে বর্ণনায় ঐ শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকে তাকে 'মারদূদ' বলে।

'মাকবূল' হাদীছ প্রধানত দুই প্রকার : সহীহ ও হাসান এবং প্রত্যেকটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। অতএব 'মাকবূল' হাদীছ সর্বমোট চারভাগে বিভক্ত :

১. সহীহ লি-যাতিহি (صحيح لذاته)

২. সহীহ লি-গাইরিহি (صحيح لغيره)

৩. হাসান লি-যাতিহি (حسن لذاته)

৪. হাসান লি-গাইরিহি (حسن لغيره)

রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে আবার হাদীছকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, মুতাওয়াতির ও আ-হাদ।

হাদীছে আ-হাদকে আবার মাশহূর, 'আযীয ও গারীব– এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তেমনিভাবে 'দা'ঈফ' হাদীছকেও বহু প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। ইবন হিব্বান প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে 'দা'ঈফ' হাদীছ বিভক্ত করেছেন। হাদীছ 'দা'ঈফ' হওয়ার একাধিক কারণ থাকে। এর মধ্যে মৌলিক কারণ দুইটি। ১. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া, ২. রাবী অভিযুক্ত অর্থাৎ কোন দোষে দুষ্ট হওয়া।

দা'ঈফ (ضعيف) শব্দটি 'আল-কাবী' (القوى) অর্থাৎ শক্তিশালী-এর বিপরীতার্থক শব্দ। এর অর্থ দুর্বল। এ দুর্বলতা দুই ধরনের হতে পারে– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ভাবগত। হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দ্বারা অর্থগত দুর্বলতা বুঝানো হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণেই কোন হাদীছ বা সুন্নাহকে দুর্বল বা 'দা'ঈফ' বলা হয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কথাই দা'ঈফ নয়। আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহ) বলেন : 'দা'ঈফ' ঐ বর্ণনাকে বলে যাতে সহীহ হাসান হাদীছের শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে।

সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে দা'ঈফ হাদীছের কয়েকটি প্রকার : ১. আল-মু'আল্লাক (المعلق), ২. আল-মুরসাল (المرسل), ৩. আল-মু'দাল (المعضل), ৪. আল-মুনকাতি' (المنقطع), ৫. আল-মুদাল্লাস (المدلس)।

রাবী কোন দোষে দুষ্ট হওয়ার কারণে দা'ঈফ হওয়া হাদীছকে আবার অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রাবীর অভিযুক্ত হওয়া দুইভাবে হতে পারে। দাবৃত তথা ধারণ ক্ষমতা ও 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত বিষয়ে। এ দুইভাবে অভিযুক্ত হওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাবীর দাবত-এর ত্রুটির কারণে একটি হাদীছ দা'ঈফ হলেও অনুরূপ অর্থবোধক আরো কয়েকটি হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে এ দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে হাদীছটি শক্তিশালী হয়ে যায়। কিন্তু 'আদালতে ত্রুটির কারণে কোন রাবী অভিযুক্ত হলে তার বর্ণিত সকল হাদীছ পরিত্যক্ত হবে।

হাদীছ বিশারদগণ রাবীর দাবত বা ধারণ ক্ষমতার দুর্বলতার দিক দিয়ে দা'ঈফ হাদীছকে অনকেগুলো ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আশ-শায (الشاذ), ২. আল-মুনকার (المنكر), ৩. আল-মুদতারাব (المضطرب), ৪. আল-মু'আল্লাক, (المعلق), ৫. আল-মুদরাজ (المدرج), ৬. আল-মাকলূব (المقلوب), ৭. আল-মাতরূক (المتروك) ইত্যাদি। এ

সবের বিস্তারিত বিবরণ এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা হাদীছ শাস্ত্রের মৌলনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বিধৃত হয়েছে।

দা'ঈফ বা দুর্বল রাবীগণের নিকট হতে হাদীছ বা সুন্নাহ বর্ণনা করা যাবে কিনা? এর উত্তরে যে কথা বলা হয়েছে তা হলো যেসব কারণে রাবী দুর্বল বলে গণ্য হয় তার মধ্যে একটি হলো তার স্মৃতিশক্তির ত্রুটি। এটা সৃষ্টিগতও হতে পারে, আবার রাবীর অবহেলা ও স্বল্প বুদ্ধির কারণেও হতে পারে। স্মৃতিশক্তির ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে অনেক সময় রাবী হাদীছ বর্ণনায় মারাত্মক ভুল করে থাকেন।

এ কারণে একদল হাদীছ বিশারদের মতে দা'ঈফ (দুর্বল) রাবীগণের নিকট হতে কোন হাদীছ বর্ণনা করা যাবে না। কেননা মিথ্যা ও জাল হাদীছ রচনাকারীরা এ দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। এ মত পোষণকারী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে ইমাম মালিক, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা, আবূ বাকর ইবন আবী খাইসামা, শু'বা ইবনুল্ হাজ্জাজ, 'আলী আল-মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (রহ) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনেক মুহাদ্দিছ বলেছেন যে, ভুল-ভ্রান্তি যদি মারাত্মক পর্যায়ের না হয় এবং হাদীছ বর্ণনায় যদি তার কোন প্রভাব না পড়ে, তাহলে তার ঐসব হাদীছ গ্রহণ করা যাবে, তা যদি বিশ্বস্ত (সিকাহ্) রাবীর বর্ণিত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে তার একক বর্ণনা ও বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত বর্ণনা পরিত্যক্ত হবে। অবশ্য দা'ঈফ রাবীর হাদীছ কখনো এককভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিছের অভিমত। ইমাম আহমাদ আবূ হাতিম আর রাযী এবং ইমাম আবূ যুর'আ (রহ) প্রমুখ থেকেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[১৯৫]

আদালতে ত্রুটির কারণে রাবী দা'ঈফ বা দুর্বল প্রমাণিত হলে তার হাদীছও পরিত্যক্ত হবে। তবে আদালত বা নৈতিক ত্রুটির কয়েকটি স্তর আছে। এর কোন কোনটি তো একেবারে কুফরির পর্যায়ে নিয়ে যায়। যেমন চরমপন্থী শী'আদের অবস্থা এবং ঐসব লোক যারা দীনের জরুরী বিষয়গুলো অস্বীকার করে। আবার এর কোন কোন ত্রুটি ব্যক্তির উপর 'ফিসক'-এর হুকুমও প্রয়োগ করে। যেমন সাধারণ বিদ'আতীদের অবস্থা, যারা কবীরা গুনাহ ও অন্যান্য পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে। এদের সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পাপ কাজে লিপ্ত থাকার দরুন যাদের উপর ফিস্ক-এর হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের বর্ণনাও

১৯৫. ড. 'উমার আল-ফালাতা, আল-ওয়াদ'উ ফিল হাদীছ-৩/৩৪৭-৩৪৯

আমাদের মুহাদ্দিছগণ প্রথ্যাখ্যান করেছেন। তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত না হলেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিরুদ্ধাচরণ ও শরী'আতের সীমা লংঘনের কারণে মুহাদ্দিছগণ তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে, হাদীছ বিশারদগণ কেবল একটি কারণে দা'ঈফ রাবীগণের নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। সেটি হলো জাল হাদীছের সংমিশ্রণ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছকে মুক্ত রাখা।

এখানে একটি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই যে কোন বর্ণনাকে মাওদূ' বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। এ কাজ কেবল বিষয় বিশেষজ্ঞরাই করতে পারেন। ইবন হাজার আল 'আসকালানী (রহ) বলেন :[১৯৬]

فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوى فى الحديث النبوى وهو الموضوع والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية بميزون بها ذلك. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرآن الدالة على ذلك متمكنة وقد يعرف الوضع باقرار واضعه قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون فى ذلك الاقرار.

"প্রথম প্রকারের অভিযোগ তথা মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ থাকলে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে বলে মাওদূ' বা বানোয়াট। এ হাদীছকে মাওদূ' বলে স্থির করা হয় প্রবলতর ধারণার ভিত্তিতে, নিশ্চিয়তার ভিত্তিতে নয়। কারণ মিথ্যবাদীও অনেক সময় সত্য কথা বলে থাকে। অবশ্য হাদীছ বিশারদগণ এমন শক্ত মেধা ও প্রতিভার অধিকারী হন যে, তারা তা পার্থক্য করতে পারেন। কোন হাদীছকে একমাত্র তিনিই মাওদূ' বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, এ বিষয়ে যার পূর্ণ অবগতি তথা অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, যিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও শক্ত বোধশক্তির অধিকারী এবং এ বিষয়ে নির্দেশক 'আলামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন। কখনো কোন হাদীছ

১৯৬. শারহু নুখবাতিল ফিক্র-৮৪-৮৫

মাওদূ' বলে জানা যায় বানোয়াটকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। ইবন দাকীকুল 'ঈদ বলেন, তবে এতে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কেননা সে এই স্বীকারোক্তিতেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।"

জাল হাদীছের আলামত

হাদীছ বিশারদগণ সহীহ, হাসান ও দা'ঈফ প্রভৃতি হাদীছ চেনার জন্য যেমন কিছু সূক্ষ্ম নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন, তেমনি জাল হাদীছ চিহ্নিতকরণের জন্যও নিয়মাবলী তৈরী করেছেন। এ জন্য তাঁরা এমন কিছু 'আলামত বা লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন যা দ্বারা মিথ্যা বা জাল হাদীছ চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু সনদ ও মতন উভয়টিই হাদীছের অংশ, তাই জাল হাদীছের লক্ষণগুলোও দুইভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

এক. সনদে জালের লক্ষণ

সনদে জালের লক্ষণ অনেক। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ নিম্নরূপ :

১. জাল হাদীছটির রচনাকারী হবে একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী। এককভাবে ঐ মিথ্যাবাদী ছাড়া অন্য কোন সিকাহ্ (বিশ্বস্ত) রাবী থেকে হাদীছটি বর্ণিত হবে না। মিথ্যাবাদীদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য হাদীছ বিশারদগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা তাদের জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। যত মিথ্যা হাদীছ তারা রচনা করেছে তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছেন। একজন জালিয়াতের নামও তাঁদের তালিকা থেকে বাদ পড়েনি।

২. জাল হাদীছ রচনাকারীর নিজের স্বীকৃতি। যেমন আবূ 'আসামা নূহ ইবন আবী মারয়াম নিজে স্বীকার করেছে যে, কুরআনের সূরাসমূহের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ সে জাল করেছে। 'আবদুল কারীম ইবন আবিল 'আওজা' চার হাজার হাদীছ জাল করার কথা স্বীকার করেছে। যাতে সে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে।[১৯৭] এমনিভাবে আবুল জাযী নামক জনৈক জালিয়াত মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তার জালিয়াতির কথা স্বীকার করে এবং তার রচিত জাল হাদীছগুলো মানুষের নিকট বলে দেয়। সে ইবনুল 'আব্বাস ও ইকরিমার (রা) সূত্রে কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত বিষয়ক হাদীছ বর্ণনা করতো। তাকে যখন বলা হলো, ইকরিমার প্রত্যক্ষ ছাত্ররা তো এমন হাদীছ বর্ণনা করেন না। তখন সে বলে :[১৯৮]

---

১৯৭. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯৭

১৯৮. তাদবীর আর-রাবী-১/২৮২

رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة.

"আমি যখন দেখলাম মানুষ কুরআন ছেড়ে আবূ হানীফার ফিকহ্ ও ইবন ইসহাকের মাগাযী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন সাওয়াবের আশায় আমি এসব হাদীছ রচনা করেছি।" আসলে এ ধরনের লোকেরা ছিল দীন সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু তারা চাইতো লোকেরা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত হোক এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকুক। তারা নিজেরাও ছিলো একেকজন বড় 'আবিদ। এ প্রসঙ্গে গোলাম খলীলের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন সংসার ত্যাগী 'আবিদ এবং যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত, বাগদাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর দিন শোকে বাগদাদের সকল দোকান-পাট বন্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি যিক্র ও বিভিন্ন ওযীফার ফযীলত সম্বন্ধে বহু জাল হাদীছ রচনা করেছেন। পরিশেষে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মানুষের মনকে নরম করার জন্য আমি এ মিথ্যা হাদীছগুলো রচনা করেছি। ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) বলেন :[১৯৯]

الواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد.

"হাদীছ জালকারীদের অনেকগুলো শ্রেণী আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি সাধনকারী হলো বৈরাগ্যবাদী সূফী-সাধক সম্প্রদায়।" এ ধরনের মূর্খ 'আবিদ ও সূফী লোকেরা অন্যদের তুলনায় দীনের অধিক ক্ষতি সাধন করে থাকে। কারণ সাধারণ মানুষ তাদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মনে করে, তাদের উপদেশ গ্রহণ করে।

৩. রাবী এমন শায়খ বা উস্তাদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার জন্ম হয়েছে, অথবা তিনি ঐ স্থানে আদৌ যাননি যেখানে তিনি হাদীছ শুনেছেন বলে দাবী করেন। যেমন আল-মামূন ইবন আহমাদ আল-হারবী দাবী করেন, তিনি হিশাম ইবন 'আম্মার থেকে হাদীছ শুনেছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কবে তুমি সিরিয়া গেলে? বললেন : ২৫০ হিজরীতে। ইবন হিব্বান (রহ) বললেন, হিশাম (রহ) তো ২৪৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তুমি কেমন করে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তাঁর থেকে হাদীছ শুনলে?

---

১৯৯. প্রাগুক্ত-১/২৮১

এভাবে ‘আবদুল্লাহ ইবন ইসহাক আল-কিরমানী হাদীছ বর্ণনা করতেন মুহাম্মাদ ইবন ইয়া‘কূব হতে। তাঁকে বলা হলো, তোমার জন্মের নয় বছর পূর্বে মুহাম্মাদ মারা গেছেন, তুমি কিভাবে তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করছো? এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবন হাতিম আল-কাশী হাদীছ বর্ণনা করেছেন ‘আব্দ ইবন হুমাইদ হতে। আল-হাকিম আবূ ‘আবদিল্লাহ (রহ) বলেন, এ শায়খ ‘আব্দ ইবন হুমাইদের মৃত্যুর তের বছর পর তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন।[২০০]

সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় বর্ণিত হয়েছে :

أن المعلى بن عرفان قال : حدثنا أبو وائل، قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين، قال أبو نعيم يعنى الفضل بن دُكين حاكيه عن المعلّى : أتراه بُعث بعد الموت؟

“মু‘আল্লা ইবন ‘ইরফান বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ ওয়ায়িল। তিনি বলেছেন, সিফফীনে ইবন মাসঊদ (রা) আমাদের বিরুদ্ধে বের হন। তার কথা শুনে আবূ নু‘আঈম অর্থাৎ আল-ফাদল ইবন দুকায়ন বললেন, তোমার কি ধারণা তিনি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন?” কারণ ইবন মাসঊদ (রা) হিজরী ৩২ সনে ইনতিকাল করেন, আর সিফ্ফীনের যুদ্ধ হয় হিজরী ৩৭ সনে। কাজেই পাঁচ বছর পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে পাঁচ বছর পরে পৃথিবীতে দেখা তখনই সম্ভব যদি তিনি পুনরুজ্জীবন লাভ করে থাকেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, কথাটি মিথ্যা। উল্লেখ্য যে, আবূ ওয়ায়িল একজন মশহূর তাবি‘ঈ এবং বিশ্বস্ত রাবী। আর মু‘আল্লা ইবন ইরফান হলেন একজন দুর্বল রাবী। কাজেই এ মিথ্যা বর্ণনার নায়ক মু‘আল্লা, আবূ ওয়ায়িল নন।[২০১]

উপরে উল্লেখিত অবস্থাসমূহে আমাদের নির্ভর করতে হয় ইতিহাসের উপর। জানতে হয় রাবীদের জন্ম, মৃত্যু, তাঁদের অবস্থান, ভ্রমণ, তাঁদের শায়খদের মৃত্যু সনসহ সার্বিক অবস্থা, আর এ কারণেই রচিত হয় ‘ইলমুত তাবাকাত বা রাবীগণের স্তর বিষয়ক বিদ্যা। পরবর্তীতে এ বিষয়টি এক স্থায়ী শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। হাদীছ সমালোচকগণ এ শাস্ত্র ছাড়া মোটেই চলতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে কাজী হাফ্স ইবন গিয়াছের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :[২০২]

---

২০০. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯৭

২০১. রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত-২১৬

২০২. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯৮

"إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه السنين."

"যখন তোমরা কোন শায়খের প্রতি দোষারোপ করবে তখন তাঁর বয়স হিসাব করবে।" অর্থাৎ তাঁর বয়স কত এবং যে তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনেছে তাঁর বয়স কত।

সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন :[২০৩]

لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ.

"যখন রাবীগণ মিথ্যা বর্ণনা করতে শুরু করলো তখন আমরাও তাদের জন্য ইতিহাস ব্যবহার করলাম।"

হাসান ইবন যায়িদ বলেন, মিথ্যাবাদীদের চিহ্নিত করার জন্য অনেক সময় আমাদের ইতিহাসেরও প্রয়োজন হয় না। আমরা শুধু রাবীকে জিজ্ঞেস করি, তোমার বয়স কত এবং কোন সনে কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছো? রাবী তার জন্ম তারিখের কথা বললেই আমরা বুঝতে পারি যে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।[২০৪]

৪. রাবীর অবস্থা ও তাঁর মানসিক লক্ষণ দেখেও জাল হাদীছ চেনা যায়। যেমন সাইফ ইবন 'উমার আত-তামীমী বলেন, আমি সা'আদ ইবন জারীফের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর ছেলে একখানি কিতাব হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? ছেলে বললো : শিক্ষক আমাকে মেরেছেন। তখন তিনি বললেন, আজ আমি তাকে লজ্জিত করবো। ইবনুল 'আব্বাস (রা) হতে 'ইকরিমা এবং তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন :

معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين.

"তোমাদের শিশুদের শিক্ষকগণ তোমাদের মধ্যে অধিক দুষ্ট লোক। ইয়াতীমের প্রতি তারা খুব কম দয়াশীল এবং মিসকীনের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।"[২০৫]

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো এ বর্ণনাটি :

"الهريسة تشد الظهر."

---

২০৩. প্রাগুক্ত-

২০৪. রিজাল শাস্ত্র-২১৬

২০৫. তাদরীব আর-রাবী-১/২৭৭

"হারীসা (এক ধরনের খাবার) পিঠকে শক্তিশালী করে।"

এ মিথ্যা হাদীছটির রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবন হাজ্জাজ আন-নাখ'ঈ। সে হারীসা বিক্রী করতো। এরূপ বর্ণনাগুলোর রচয়িতা যে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবী কারীমের (সা) নামে মনগড়া কথা হাদীছ বলে চালিয়ে দিয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়।

উপরোক্ত মিথ্যাবাদী মুহাম্মাদ ইবন হাজ্জাজ তার হারীসা ব্যবসার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে নবী কারীমের (সা) নামে এবং বিভিন্ন সাহাবীর সূত্রে একাধিক মিথ্যা হাদীছ রচনা করে। যেমন :

اطعمنى جبريل الهريسة لأشد بها ظهرى لقيام الليل.

"কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে ইবাদাত)-এর জন্য আমার পিঠ শক্ত করার উদ্দেশ্যে জিবরীল আমাকে হারীসা খাওয়ালেন।"[২০৬]

"মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে জান্নাত থেকে কোন খাবার দেয়া হয়েছে কি? বললেন : হাঁ, জান্নাত থেকে আমাকে হারীসা দেয়া হয়েছে। তা খাওয়ার পরই আমার মধ্যে চল্লিশজনের সমান শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। দাম্পত্য জীবনেও আমার মধ্যে চল্লিশজনের সমান শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবী বলেন, 'এরপর থেকে মু'আয (রা) হারীসা খাওয়া শুরু করেন।"

এভাবে আরো বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্রী যেমন, ডাল, বেগুন, আনার ও আঙ্গুর ইত্যাদির গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা প্রায় সবই জাল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন পেশার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কেও বহু জাল হাদীছ রচনা করা হয়েছে।[২০৭]

মতন জালের আলামতসমূহ

মতনে তথা মূল হাদীছেও জালের লক্ষণ অনেক। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলামত নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

১. শব্দের দুর্বলতা

যাঁরা আরবী বায়ান (বর্ণনা) শাস্ত্রে পারদর্শী তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এ জাতীয় শব্দ কখনো একজন সাধারণ ফাসীহ ও বালীগ তথা বিশুদ্ধ ভাষী ও অলংকারবিদ

২০৬. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯৮

২০৭. আল-ওয়াদ'উ ফিল-হাদীছ-২৮০

হতে প্রকাশ পেতে পারে না। তাহলে যিনি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশুদ্ধ ভাষী [রাসূলুল্লাহ (সা)], তাঁর নিকট হতে কেমন করে এরূপ নিম্নমানের শব্দের প্রয়োগ সমীচীন মনে করা যায়? হাদীছের মূল বক্তব্যে যদি এমন কোন শব্দ থাকে যার অর্থ অত্যন্ত হাস্যকর কিংবা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই বাচালতাপূর্ণ, সে ক্ষেত্রে কেবল শব্দটি যদি হাস্যকর হয়, তাহলেই হাদীছটি জাল হবে এমন কথা সাধারণভাবে বলা যায় না। কারণ হাদীছটি হয়তো মূল অর্থের দিক দিয়ে সহীহ্ কিন্তু তার পরবর্তী কোন রাবী শব্দে কিছুটা পরিবর্তন করে নিজের মত করে কোন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অথচ মূল হাদীছটি নবী কারীম (সা) থেকেই বর্ণিত। তবে রাবী যদি এরূপ দাবি করেন যে, হাদীছের ভাব, ভাষা ও শব্দ সবই নবী কারীম (সা) হতেই বর্ণিত, তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী না বলে কোন উপায় নেই। কারণ নবী (সা) ছিলেন আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষী, তাই হাদীছের একটি শব্দও যদি হয় হালকা ও লঘু প্রকৃতির, তবে তা অবশ্য জাল বা মিথ্যা হবে।

দীর্ঘদিন হাদীছ অধ্যয়নের ফলে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে এমন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা জন্মে যে, হাদীছের একটি শব্দ শোনামাত্র তাঁরা বলে দিতে পারেন এটি রাসূলুল্লাহর (সা) উচ্চারিত শব্দ কিনা। আল্লামা বালকানী (রহ) বলেন :[২০৮]

وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه.

"এর প্রমাণ এই যে, যদি একজন লোক একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত কোন একজন লোকের খিদমত করেন এবং জ্ঞাত হন যে, লোকটি কি পছন্দ করেন এবং কি অপছন্দ করেন। এরপর আরেকজন লোক এসে যদি বলে, তিনি ঐ জিনিসটি অপছন্দ করেন অথচ সেটা তার পছন্দের জিনিস, তাহলে ঐ খাদিম শোনামাত্রই (তার অভিজ্ঞতার আলোকে) বলে দিতে পারবেন যে, লোকটি মিথ্যা বলেছে।"

২. অর্থের বিকৃতি

হাদীছ যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের পরিপন্থী হয় এবং এর গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা দান সম্ভব না হয়, অথবা তা যদি সাধারণ অনুভূতি, নৈতিকতা ও

---

২০৮. তাদরীব আর-রাবী-১/২৭৬

পর্যবেক্ষণের বিপরীত হয়, তবে তা জাল হিসেবে গণ্য হবে। যেমন এই বর্ণনাটি :

أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلّت عند المقام ركعتين.

"নূহ (আ)-এর জাহাজ সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং মাকামে ইবরাহীমের নিকট দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করে।"

لا يولد بعد المائة مولود للّه فيه حاجة.

"(মানুষের) এক শো বছর পরে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে না যার মধ্যে আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে।"

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী বর্ণনাও মাওদূ' বলে গৃহীত হবে। যেমন :

الباذنجان شفاء من كل داء ـ

"বেগুন সর্ব রোগের নিরাময়।"[২০৯]

আল্লাহর পবিত্রতা ও স্বয়ম্ভু হওয়ার ব্যাপারে মানব বুদ্ধির পরিপন্থী বর্ণনা। যেমন :[২১০]

إن اللّه خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها.

"আল্লাহ অশ্ব সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তা চালালেন। ফলে অশ্ব ঘেমে গেল। তারপর তিনি তা থেকে নিজ আত্মাকে সৃষ্টি করলেন।"

বিকৃত রুচি ও যৌন আবেদনমূলক বর্ণনা। যেমন :

النظر إلى الوجة الحسن يجلى البصر.

"সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়।"

অনুরূপভাবে কোন বর্ণনা যদি মানবমণ্ডল ও সৃষ্টি জগতের সাধারণ নিয়মাবলীর পরিপন্থী হয়, তবে তাও জাল (মিথ্যা) বলে গণ্য হবে। যেমন 'উজ ইবন উনুক-এর হাদীছ। বর্ণিত হয়েছে যে, তার দৈর্ঘ্য ছিল চার হাজার গজ। নূহ (আ) তাকে প্লাবণের ভয় দেখালেন? বন্যার পানি তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর সে হাত দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ হতে মাছ ধরে তা সূর্যের কাছে নিয়ে ভেজে নিত। এমনিভাবে রতন আল-হিন্দী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ছয়শো বছর জীবন লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন।

২০৯. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-

২১০. তাদরীব আর-রাবী-২৭৮

বর্ণনা যদি হয় এমন নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপূর্ণ যা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি থেকে আশা করা যায় না। যেমন :

الديك الأبيض حبيبى وحبيب حبيبى جبريل.

'সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু জিবরীলের বন্ধু।"

اتخذوا الحمام المقاصيص فانها تلهى الجنة عن صبيانكم.

"তোমরা শিখাযুক্ত কবুতর পোষ, কারণ সে তোমাদের সন্তানদেরকে জিন হতে রক্ষা করে।"২১১

ইবনুল জাওযী (রহ) বলেন :[২১২]

ما أحسن قول القائل : كل حديث رأيته تخالفه العقول، وتناقضه الأصول، وتباينه النقول فاعلم أنه موضوع.

" সেই ব্যক্তির কথা কতই না সুন্দর যিনি বলেন : যে সকল হাদীছ 'আকল বিরোধী, উসূল তথা ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী এবং নকল তথা কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনার বিপরীত, স্মরণ রাখতে হবে যে তা সবই জাল বা মিথ্যা।"

ইমাম আর রাযী বলেন :[২১৩]

كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم.

"এমন প্রত্যেকটি খবর যা অসত্যের ধারণা দেয় এবং যার ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে তা সবই মিথ্যা, অথবা তার থেকে এমন কিছু বাদ পড়েছে যদ্দারা এই অসত্যের ধারণা দূর হতো।"

৩. বর্ণিত হাদীছটি যদি কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান কিংবা মুতাওয়াতির হাদীছ বা অকাট্য ধরনের ইজমা'র বিপরীত হয়, আর এর মধ্যে কোনভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে তা জাল বলে প্রতিপন্ন হবে। যেমন :

ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء -

---

২১১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৯৯

২১২. তাদরীব আর-রাবী-১/২৭৭

২১৩. প্রাগুক্ত-

"জারজ সন্তানের সাত পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

এ বর্ণনাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন :[২১৪]

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

"কোন ব্যক্তিই অপর কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।"

إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أولم أحدث.

"আমার থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করলে তা যদি সত্যের অনুকূলে হয়, তা তোমরা গ্রহণ করো। আমি তা বলে থাকি বা নাই বলে থাকি।"

উপরের বর্ণনাটি নিম্নোক্ত মুতাওয়াতির হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে।

من كذب على متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار.

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।"

কুরআন-সুন্নাহর সাধারণ নীতিমালার পরিপন্থী মাওদূ' হাদীছের আরেকটি দৃষ্টান্ত :

من ولد له ولد فسماه محمدا كان هو ومولوده فى الجنة.

"কারো পুত্র সন্তান হলে এবং তার নাম মুহাম্মাদ রাখলে, সেই পুত্র ও সে জান্নাতে যাবে।"

তেমনিভাবে রাসূলের (সা) নামে বর্ণিত হয়েছে :

آليت على نفسى الا أدخل النار من اسمه محمد أو أحمد.

"আমি আমার নিজের কসম করে বলছি, যার নাম মুহাম্মাদ বা আহমাদ, আমি কখনো তাকে জাহান্নামে নেব না।"

উপরোক্ত হাদীছ দুইটি কুরআন-সুন্নাহর সাধারণ বিধানের পরিপন্থী। কারণ, মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে তার আমলের দ্বারা, নাম বা উপনাম দ্বারা নয়।

এভাবে ইজমা' বিরোধী হলেও হাদীছটি জাল প্রতিপন্ন হবে। যেমন :

من قضى صلوات من الفرائض فى آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته من عمره إلى سبعين سنة.

---

২১৪. সূরা আল-আন'আম-১৬৪

"রামাদান মাসের শেষ জুম'আর দিন কেউ তার ফরয নামাযসমূহ কাজা আদায় করলে তা তার জীবনের সত্তর বছর অবধি যত কাযা আছে তার পরিপূরক হবে।"

এ একটি ইজমা' বিরোধী হাদীছ। কোন ফায়েতা বা ছুটে যাওয়া ইবাদাতই অন্য কোন ইবাদাতের পরিপূরক হতে পারে না।[২১৫]

৪. বর্ণিত হাদীছটি যদি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তা নিঃসন্দেহে জাল। যেমন একটি হাদীছে এসেছে যে, নবী (সা) খাইবারবাসীদের উপর থেকে জিযইয়া কর রহিত করেন সা'আদ ইবন মু'আযের (রা) সাক্ষ্য ও মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের (রা) লেখার দ্বারা। একই সাথে তাদের উপর থেকে যাবতীয় বিধিনিষেধও প্রত্যাহার করে নেন। এটা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত কথা। কেননা খাইবার যুদ্ধের সময় জিযইয়া শরী'আতের বিধানরূপে কার্যকর হয়নি। জিযইয়ার আয়াত নাযিল হয় তাবুক যুদ্ধের পরের বছর। এর পূর্বে তা সাহাবায়ে কিরামের (রা) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয় ছিল। অনুরূপভাবে সা'আদ ইবন মু'আযের (রা) যে সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে তাও সঠিক নয়। কারণ তিনি খাইবার যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অনুরূপভাবে মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের (রা) যে লেখার কথা বলা হয়েছে তাও সত্য নয়। কারণ মু'আবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের সময়। খাইবার বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ ঐতিহাসিক তথ্যাবলীই প্রমাণ করে যে, হাদীছটি জাল।

এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী আরেকটি হাদীছ হলো, আনাস (রা) বলেন :[২১৬]

دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى عليه وسلم جالسا وعليه مئزر، فهممت أن أكلمه فقال : يا أنس إنما حرمت دخول الحمام بغير مئزر من أجل هذا.

"আমি হাম্মামে প্রবেশ করে দেখি রাসূল (সা) লুঙ্গি পরা অবস্থায় বসে আছেন। আমি কথা বলার জন্য উদ্যোগী হলাম। তিনি বললেন, হে আনাস! আমি লুঙ্গি ছাড়া হাম্মামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি এই কারণে।"

---

২১৫. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৯৯-১০০

২১৬. প্রাগুক্ত-১০০

অথচ ঐতিহাসিক সত্য এই যে, রাসূল (সা) জীবনে কখনো হাম্মামে প্রবেশ করেননি। কারণ তাঁর সময়ে হিজাযে হাম্মামের প্রচলন ছিল না।

৫. কেউ যদি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নির্ধারিত সাধারণ জীবনকালের অধিক জীবন লাভের দাবি করে এবং বহু পূর্বে অতীত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছে বলে প্রচার করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেমন রতন আল-হিন্দী দাবি করেছে, সে নবী কারীমের (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, অথচ এ ব্যক্তি জীবিত ছিল ছয়শো হিজরী সনে। অজ্ঞ লোকদের ধারণা, এ ব্যক্তি নবী কারীমের (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, তাঁর মুখ হতে হাদীছ শুনেছে এবং নবী কারীম (সা) তার দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করেছেন। এরূপ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ নবী কারীমের (সা) সাথে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত সাহাবীগণের অধিকাংশই হিজরী দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। দুনিয়া থেকে সর্বশেষ বিদায় গ্রহণকারী সাহাবী আবুত তুফাইল (রা) হিজরী ১১০ সনে ইনতিকাল করেন। এরপর দুনিয়াতে আর কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। সুতরাং রতন আল-হিন্দীর দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬. হাদীছটি যদি রাবীর মাযহাব তথা মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, আর রাবী যদি হয় তার মাযহাবের ব্যাপারে চরমপন্থী তাহলে হাদীছটি মাওদূ' বলে গণ্য হবে।

যেমন বর্ণনাকারী যদি শী'আদের রাফিজী সম্প্রদায়ের হয় এবং তার বর্ণিত হাদীছে যদি আহ্লি বাইতের (নবী-বংশ) ফযীলত বর্ণিত হয়, বুঝতে হবে তা জাল। কারণ শী'আরা সাধারণতই আহ্লি বাইতের অমূলক প্রশংসায় এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নামে চালিয়ে দিতে এবং সাহাবীগণের গালাগাল ও কুৎসা বর্ণনায় অভ্যস্ত। বিশেষত তারা প্রথম দুই খলীফার প্রতি রীতিমত শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদেরকে খিলাফাতের ব্যাপারে 'আলীর (রা) অধিকার হরণকারী মনে করে। শী'আদের রচিত জাল হাদীছের দৃষ্টান্ত হলো হাব্বা ইবন জুযাইন বর্ণিত এ হাদীছটি :[২১৭]

سمعت عليا رضى الله عنه قال عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين.

---

২১৭. প্রাগুক্ত-

“আমি ‘আলী থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, এ উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহর ‘ইবাদাত করার পাঁচ বছর পূর্বে আমি তাঁর রাসূলের সাথে ‘ইবাদাত করেছি। ইবন হিব্বান বলেন, হাব্বা ছিল চরমপন্থী শী‘আ, জাল হাদীছ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি।

৭. যেসব হাদীছে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে যা অসংখ্য সাহাবীর উপস্থিতিতে ঘটেছে, স্বভাবতই তার বর্ণনাকারীও বহু সংখ্যক সাহাবী হবেন। কিন্তু তা না সাহাবীদের যুগে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে, আর না অধিক সংখ্যক রাবী তা বর্ণনা করেছেন। তখন ধরে নিতে হবে হাদীছটি বানোয়াট। শী‘আদের বর্ণিত ‘গাদীরে খুম’ হাদীছটি এ পর্যায়ের। ‘আলিমগণ বলেছেন এই হাদীছটি জাল হওয়ার ‘আলামত এই যে, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটে, অথচ আবূ বাকরকে (রা) খলীফা নির্বাচনের সময় সকল সাহাবীই বিষয়টি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, এ কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত নয়। উল্লেখ্য যে, শী‘আদের রাফিজী সম্প্রদায় এই গাদীরে খুম’ এর হাদীছটি বর্ণনা করেছে। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার সময় রাসূল (সা) ‘আলীকে (রা) পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেন। অসংখ্য সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) এ নির্দেশ গোপন ও অমান্য করবেন, এ এক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এটা যে শী‘আদের রচিত জাল হাদীছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম ইবন তাইমিয়্যা এ বিষয়ে তাঁর ‘মিনহাজ আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[২১৮]

৮. যেসব হাদীছে ছোট ছোট কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ নেকী এবং অতি তুচ্ছ পাপের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাও জাল। গাল্পিক ওয়ায়িজরা মানুষের অন্তর গলানো এবং শ্রোতাদের বাহবা লাভের জন্য এ জাতীয় বহু হাদীছ রচনা করেছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো :

من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى سبعين نبيا.

“যে ব্যক্তি এত এত রাকা‘আত চাশ্ত নামায পড়বে তাকে সত্তরজন নবীর সাওয়াব দেয়া হবে।”

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো :

من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له.

২১৮. মিনহাজ আস-সুন্নাহ-৪/১১৮

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেকটি বাক্য হতে একটি পাখি সৃষ্টি করবেন, যার যবান হবে সত্তর হাজার, আর প্রত্যেক যবানে হবে সত্তর হাজার ভাষা। এরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।”[২১৯]

৯. নবী কারীমের (সা) নিকট হতে কোন অবিচ্ছিন্ন সনদ-সূত্র ব্যতীত কেবলমাত্র কাশ্‌ফ বা স্বপ্ন যোগে হাদীছ লাভ করার দাবিও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে সকল ‘আলিম একমত যে, স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের সূত্রে শরী‘আতের কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ তা নির্ভরযোগ্য নয়।

আমাদের সর্বজন স্বীকৃত হাদীছ বিশারদগণ হাদীছ সমালোচনা এবং সহীহ ও মাওদূ‘ হাদীছ পার্থক্যকরণের জন্য যে সকল মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, এখানে আমরা তার মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁরা কেবল সনদ সমালোচনার মধ্যেই তাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং ‘মতন’ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকেও তাঁরা সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ও তাদের প্রাচ্যের ভাব-শিষ্যরা যেমন বলে থাকেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ কেবল সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর জোর দিয়েছেন, মতনের প্রতি তাঁরা তেমন দৃষ্টি দেননি, কথাটি যে মোটেই সত্য নয় তা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি। তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সনদ-মতন উভয়টিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁরা জালিয়াতির যে সকল আলামত চিহ্নিত করেছেন তার চারটি সনদ ভিত্তিক, কিন্তু মতন ভিত্তিক নয়টি। এতটুকুতেই তাঁরা থেমে থাকেননি। বরং তাঁরা হাদীছ সমালোচনা, গ্রহণ ও বর্জনে বিষয়গত রুচি ও অভিজ্ঞতারও সুযোগ রেখেছেন। বিষয়গত দক্ষতা তাঁদের অনেকের মধ্যে এমন অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, কোন বর্ণনা শোনামাত্রই তা হাদীছ নয় বলে প্রত্যাখ্যান করতেন। সনদ দেখার কোন প্রয়োজন তারা মনে করতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা বেশির ভাগ সময় যে মন্তব্যগুলো করতেন তা নিম্নরূপ :[২২০]

"هذا الحديث عليه ظلمة، أو متنه مظلم، أو ينكره القلب، أو لا تطمئن له النفس."

“এই হাদীছ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথবা এর মতন অন্ধকার, অথবা অন্তর প্রত্যাখ্যান করে অথবা অন্তর নিশ্চিন্ত হয় না।”

---

২১৯. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১০২

২২০. প্রাগুক্ত-১০২

প্রখ্যাত তাবি'ঈ রাবী' ইবন খুছাইম (রহ) বলেন :

إن من الحديث حديثا له ضوء النهار تعرفه به، وإن من الحديث له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها.

"হাদীছের মধ্যে এমন হাদীছ আছে যাতে দিনের আলোর মত আলো আছে যা দ্বারা তা চেনা যায়, আর হাদীছের মধ্যে এমন হাদীছ আছে যাতে রাতের অন্ধকারের মত অন্ধকার আছে যা দ্বারা তা চেনা যায়।" ইবনুল জাওযী (রহ) বলেন :

الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه فى الغالب.

"মুনকার হাদীছ শুনে হাদীছের ছাত্রদের দেহ– ত্বক থর থর করে কাঁপতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।"[২২১]

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, জাল বা মাওদূ' হাদীছের এসব লক্ষণ দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন কেবল হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ। সাধারণ লোক এসব লক্ষণ বা এর কোন একটি দেখে কোন হাদীছকে জাল বলে আখ্যায়িত করা সঙ্গত হতে পারে না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া আনাড়ি ডাক্তার যেমন রোগ লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন হাদীছে জাল হাদীছের লক্ষণ দেখেই হাদীছটি প্রকৃতপক্ষে জাল কিনা তা নির্ণয় করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রতিটি হাদীছের ক্ষেত্রে হাদীছবেত্তাগণ কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা জেনে নিয়ে সেটাই অনুসরণ করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, জাল হাদীছ সনাক্ত করা একটি জটিল কাজ। এতে একদিকে যেমন রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আশঙ্কা থাকে, অন্যদিকে তেমনি সহীহ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করারও আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুততার সাথে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। বরং এ ক্ষেত্রে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত।

---

২২১. প্রাগুক্ত

হাদীছ জালকরণ প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের প্রচেষ্টার ফলাফল

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ। এই পবিত্র সুন্নাহকে ভেজালমুক্ত ও স্বচ্ছ রাখার জন্য আমাদের পূর্ববর্তীকালের নিবেদিতপ্রাণ মুহাদ্দিছগণ যে প্রচেষ্টা চালান তাতে তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং মুসলিম উম্মাহও তাদের নবীর (সা) সুন্নাহর নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তাঁরা তাঁদের সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে এমনভাবে ছেঁকে ফেলেন যে, হাদীছসমূহ সহীহ, হাসান ও দা'ঈফ হিসেবে পৃথক হয়ে যায়। তাঁদের এই চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যিন্দিক, অন্ধ জাতীয়তাবাদী ও বিভিন্ন শ্রেণীর অজ্ঞ-মূর্খদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাঁর প্রিয় নবীর (সা) সুন্নাহ সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীকালের মুসলিম উম্মাহ তাঁদের সেই অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টার সুফলসমূহ কিয়ামাত পর্যন্ত ভোগ করতে থাকবে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলসমূহের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

এক. সুন্নাহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ

রাসূলে কারীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) জন্য এমন এক মহান নেতা ছিলেন যাঁর নিকট তাঁরা প্রতিটি মুহূর্ত ঈমান-'আকীদা, 'ইবাদত-বন্দেগী, আমল-আখলাক. তাহযীব-তামাদ্দুন, আচার-ব্যবহার এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর জীবনের এক একটি দিকের অনুসরণ করে তাঁরা নিষ্কলুষ লোকদের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁরা জানতেন যে, তিনি নবী হয়ে আসার আগে তাঁরা কী ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কোন্ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাঁদের সামনে আগত প্রতিটি বিষয়ে ফাতওয়া দানকারী ছিলেন তিনিই এবং বিচারপতিও ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই তাঁরা যুদ্ধও করতেন এবং সন্ধিও করতেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর নেতৃত্বের অনুসরণ করে তাঁরা কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন। এ কারণে তাঁরা তাঁর প্রতিটি কথা স্মরণ রাখতেন। যাঁরা তাঁর নিকটে থাকতেন তাঁরা অপরিহার্যরূপে তাঁর সাহচর্যে বসে থাকতেন। যাঁদেরকে কখনো তাঁর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকতে হতো তাঁরা অন্যদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন যে, আজ তিনি কী কী কাজ করেছেন এবং কী কথা বলেছেন?

দূরদূরান্ত থেকে আগত লোকেরা রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যে যতটুকু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পেতেন তাকে তাঁরা নিজেদের গোটা জীবনের মূলধন মনে করতেন এবং জীবনভর তা স্মরণ করতেন। তাঁর সাহচর্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ যাঁদের হতো না তাঁরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চারপাশে সমবেত হতেন

যিনি তাঁর সাহচর্য লাভ করে আসতেন এবং তন্নতন্ন করে প্রতিটি কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতেন। ইমাম বুখারী (রহ) অবিচ্ছিন্ন সনদে 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২২২]

كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد - وهى من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذ نزل فعل مثل ذلك.

"আমি ও মদীনার 'আওয়ালী এলাকার উমাইয়্যা ইবন যায়িদ বংশের আমার এক আনসার প্রতিবেশী– দুজন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতাম। সে একদিন যেত এবং আমি একদিন যেতাম। আমি যেদিন যেতাম, ফিরে এসে তাকে সারাদিনের খবর জানাতাম, তদ্রূপ সে যেদিন যেত, ফিরে এসে আমাকে জানাতো।" মদীনা থেকে দূরে বসবাসকারী গোত্রসমূহ নিজ নিজ গোত্র থেকে দু'একজন করে প্রতিনিধি মদীনায় পাঠাতো। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কিছুদিন অবস্থান করে দীনের বিধি-বিধান শিখতেন, তারপর নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের শিক্ষক ও মুরশিদের দায়িত্ব পালন করতেন।

রাসূলে কারীমের (সা) মুখ থেকে শরী'আতের বিধান জানার জন্য একজন সাহাবী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় আসতেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহ) 'উকবা ইবন আল-হারিছ (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক মহিলা তাঁকে জানায় যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী– দু'জনকেই সে দুধপান করিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে তিনি বাহনের পিঠে সাওয়ার হয়ে মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে কোন যাত্রাবিরতি না করে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চান! কেউ যদি না জেনে দুধবোনকে বিয়ে করে, সে ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কী?

তারপর তিনি নিজের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে তাঁদের বিয়ে বাতিল করে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। অতঃপর তিনি অন্য মহিলাকে বিয়ে করেন।[২২৩]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) উম্মাহাতুল মু'মিনীনের নিকট থেকে জেনে নিতেন একান্তে বেগম-সাহেবাগণের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) আচরণের কথা। মহিলা সাহাবীগণও

---

২২২. বুখারী, কিতাবুল 'ইলম : বাবু আত-তানাউব ফী আল-'ইলম

২২৩. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৭

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের সহায়তায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে মহিলা বিষয়ক পাক-পবিত্রতা, নামায, গোসল ইত্যাদি বিষয় জেনে নিতেন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে যাঁরা কখনো দূর থেকে রাসূলে কারীমকে (সা) দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন অথবা কোন বিশাল জনসমাবেশে শুধু তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন, সেই স্মৃতি জীবনভর ভুলেননি, বরং গৌরবের সাথে নিজের এই সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করতেন যে, আমাদের এই চোখ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভ করেছে এবং আমাদের কান তাঁর ভাষণ শুনেছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের জন্য দুনিয়াতে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে থাকতো তবে তা ছিল মহানবীর (সা) সীরাত। তাঁরা এমন এক একজনের নিকট পৌঁছে যেতেন যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য পেয়েছিলেন, অথবা কখনো তাঁকে দেখেছিলেন, অথবা তাঁর কোন ভাষণ শুনেছিলেন। সাহাবীগণ একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তাঁদের সাহচর্য লাভের আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি তাবি'ঈগণ সাহাবীদের নিকট থেকে সীরাতে পাক সম্বন্ধে যে জ্ঞানেরই সন্ধান পেতেন তাই নিংড়ে নিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কি হাদীছ লেখা হয়েছিল?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে যে কথা অবগত হওয়া জরুরী তা এই যে, রাসূল (সা) যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন গোটা আরব জাতিই ছিল অশিক্ষিত এবং নিজেদের যাবতীয় বিষয় মুখস্থ ও বাচনিকভাবে সম্পাদন করতো। কুরাইশের মত উন্নত গোত্রের অবস্থা ঐতিহাসিক বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী এই ছিল যে, তাদের মধ্যে মাত্র ১৭ ব্যক্তি পড়ালেখা জানতো। বালাযুরীরই বক্তব্য অনুসারে মদীনায় তখন ১১ ব্যক্তির অধিক পড়ালেখা জানা লোক ছিল না। লেখার জন্য কাগজ ছিল দুষ্প্রাপ্য। পাতলা চামড়া, হাড় ও খেজুর পাতার উপর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হতো। এই অবস্থায় রাসূল (সা) যখন প্রেরিত হন তখন তাঁর সামনে সর্বপ্রথম কাজ ছিল, ক্রমাগতভাবে নাযিল হওয়া কুরআন এমনভাবে সংরক্ষণ করা যাতে এর মধ্যে অন্য কোন জিনিসের সংমিশ্রণ না ঘটে। লেখক ছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন, তাই তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, যেসব লোক ওহীর শব্দভাণ্ডার ও আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করছে, তারাই যদি আবার তাঁর নিকট থেকে শুনে তাঁর বরাতে অন্য জিনিসও লিখে নেয় তবে কুরআন মিশ্রণ থেকে নিরাপদ থাকবে না।

সংমিশ্রণ না ঘটলেও অন্তত সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, একটি বক্তব্য তা কুরআনের আয়াত না রাসূলে কারীমের (সা)। এ কারণে তিনি প্রাথমিক যুগে হাদীছসমূহ লিখতে নিষেধ করেন। যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেন :[২২৪]

لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه.

"তোমরা আমার কোন কথা লিখ না। কেউ যদি কুরআন ছাড়া আমার কোন কথা লিখে থাকে সে যেন তা মুছে ফেলে।"

হাদীছ লেখার সাধারণ অনুমতি

হাদীছ লিপিবদ্ধ না করার এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। মদীনায় পৌঁছার অল্প কিছুদিন পরেই সাহাবীদের এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন এবং যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া শিখে ফেললো তখন তিনি সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিলেন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যা কিছু শুনতাম তা লিখে নিতাম। লোকেরা আমাকে বললো :

إنك تكتب عن رسول اللّه كل ما يقول، ورسول اللّه قد يغضب فيقول مالا يتخذ شرعا عاما.

"রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষ, কখনো শান্ত অবস্থায় কথা বলেন, আবার কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। তখন হয়তো যা বলেন তা শরী'আতের সাধারণ বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তুমি সবকিছুই লিখে নিচ্ছো।" এরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাঁর কোন কথাই লিখবো না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বলেন :[২২৫]

أكتب عنى فواالذى نفسى بيده ما خرج من فمى إلا الحق.

"তুমি লেখ, সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, এ মুখ থেকে

---

২২৪. প্রাগুক্ত

২২৫. আল-জামি' ফী বায়ান আল-'ইলম-১/৭৬

কেবল সত্য কথাই বের হয়।" 'আবদুল্লাহর (রা) এই সাহীফা "আস-সাদিকা" নামে প্রসিদ্ধ। এতে এক হাজার হাদীছ স্থান লাভ করে।

২. আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবেদন করেন, আমি আপনার নিকট অনেক কথাই শুনি, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। রাসূল (সা) বললেন :

استعن بيمنك وأومأ بيده إلى الخط.

"তোমার ডান হাতের সাহায্য লও" এবং তিনি নিজের ডান হাতের ইশারায় বলেন, লিখে নাও।

৩. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) একটি ভাষণ দিলেন। পরে (ইয়ামানের অধিবাসী) আবূ শাহ আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভাষণটি আমাকে লিখে দিন। রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন :

"اكتبوا لأبى شاه - তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও।" আবূ হুরাইরার (রা) অপর একটি বর্ণনায় ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মক্কার হারাম শরীফ ও নরহত্যার ব্যাপারে কতিপয় বিধান বর্ণনা করেন। ইয়ামানের আবূ শাহ নামের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে আবেদন করে, আমাকে ভাষণটি লিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন।[২২৬]

৪. আবূ হুরাইরা (রা) বলেন :[২২৭]

ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا عبد الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا أكتب.

"সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক হাদীছের জ্ঞান আর কারো ছিল না। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কারণ তিনি হাদীছ লিখে রাখতেন, কিন্তু আমি লিখে রাখতাম না।"

৫. বিভিন্ন ব্যক্তি 'আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করে এবং একবার তিনি মিম্বরের উপর থাকা অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা রাসূল (সা) বিশেষভাবে আপনাকে দান করেছেন? তিনি উত্তর দেন : না।

---

২২৬. বুখারী, কিতাব আল-'ইলম

২২৭. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৬০

لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فهما فى كتابه، وما فى هذه الصحيفة.

“সেই সত্তার কসম! যিনি শস্যবীজ অংকুরিত করেন, প্রাণ সৃষ্টি করেন। একজন বান্দাকে আল্লাহ তাঁর কিতাবের যে জ্ঞান দান করেন এবং এই সাহীফার মধ্যে যা কিছু আছে তার অতিরিক্ত আর কোন জ্ঞান আমার কাছে নেই।” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো সেই সাহীফার মধ্যে কি আছে? তিনি বললেন :

العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.

“তাতে আছে দিয়াত, বন্দী মুক্তি এবং কোন কাফিরের পরিবর্তে কোন মুসলিমকে হত্যা না করার কথা।” অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেই সাহীফাটি বের করে দেখান। তার মধ্যে ছিল যাকাতের বিধান, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান, মদীনার হারাম এবং অনুরূপ আরো কতিপয় বিষয়।[২২৮]

এছাড়া রাসূল (সা) তাঁর প্রশাসকবৃন্দের নিকট বিভিন্ন এলাকায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধান, যাকাত, মীরাছ সম্পর্কিত বিধান বিভিন্ন সময় লিখিতভাবে পাঠাতেন। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদেরকেও চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন।[২২৯] অনেক সময় তিনি কোথাও কোন বাহিনী পাঠানোর সময় অধিনায়কের হাতে সীলকরা লিখিত নির্দেশনামা দিয়ে বলে দিতেন, অমুক স্থান অতিক্রম করার পর এটা খুলবে।[২৩০] এসব বিষয় সম্পর্কে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারু কুতনী, আদ্-দারিমী, আবূ 'উবাইদের কিতাবুল আমওয়াল, আবূ ইউসুফের কিতাবুল খারাজ এবং ইবন হাযমের আল-মুহাল্লা ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে একটি মারাত্মক ভুল ধারণা মূর্খ-পণ্ডিত নির্বিশেষে অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। ইসলাম-দুশমনগণ একে সুন্নাহর অযথার্থতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে একটি যুক্তি হিসেবে পেশ করে থাকে। সেই ধারণাটি হলো, নবী কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হাদীছ লিপিবদ্ধ হয়নি, হয়েছে তাঁর ইনতিকালের অনেক পরে। অর্থাৎ সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈনের যুগ পর্যন্ত সুন্নাহ শুধু

---

২২৮. আল-জামি' ফী বায়ান আল-'ইলম-১/৭৬; ড. মুহাম্মাদ আবূ শাহবা, দিফা' 'আন আস-সুন্নাহ্-২১

২২৯. ইবন সা'দ, তাবাকাত-২/২২-৫৬

২৩০. আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা-৬০

মৌখিক বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রায় এক শতাব্দিকাল পর্যন্ত সুন্নাহ লিপিবদ্ধ হয়নি। এখন মুসলিম উম্মাহর নিকট হাদীছের যে গ্রন্থাবলী বিদ্যমান তা হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছে। তাদের এই ধারণাটি যেমন প্রসিদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এর অসারতাও বহুবার বহুভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। ইতিহাসে ৫২ জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করেন।[২৩১]

অপরদিকে বহু সাহাবী না লিখলেও সুন্নাহর এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁদের স্মৃতিতে ধারণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ হুরাইরা, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা)। তবে আবূ হুরাইরা (রা) সবচেয়ে বেশি হাদীছ ধারণ ও বর্ণনা করেন, যা সংখ্যায় পাঁচ হাজারের উপরে। আর 'আয়িশা (রা) দু'হাজার দু'শো'র কিছু বেশি হাদীছ ধারণ ও বর্ণনা করেন।[২৩২]

রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাকরের (রা) খিলাফাতকালে সুন্নাহ সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের কোন সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) একবার সুন্নাহ সংকলনের চিন্তা-ভাবনা করেন; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর তা থেকে বিরত থাকেন। এ সম্পর্কে 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের (রা) বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হলো :[২৩৩]

عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال : إنى كنت أردت أن أكتب السنن، وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى والله - لا ألبس كتاب الله بشيئ أبداً.

---

২৩১. মুসতাফা আল-আ'জামী, দিরাসাত ফী আল-হাদীছ আন-নাবাবী-১/৩২৫

২৩২. ড. মুসতাফা আশ-শা'কা, মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইন্দা আল-'আরাব-৪২

২৩৩. জামি' বায়ান আল-'ইলম-১/৭৬; আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম-২২১

"'উরওয়া ইবন আয-যুবাইর (রা) বলেন, 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) সুন্নাহ লেখার ইরাদা করেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁরা লেখার পক্ষে মতও দেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে এক মাস যাবত আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করেন। অর্থাৎ যা খায়র তথা কল্যাণকর তাই আল্লাহর নিকট কামনা করা। আল্লাহ্ তাঁকে একটি স্থির সিদ্ধান্ত দান করেন। একদিন সকালে তিনি বললেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম সুন্নাহ লিখবো। আপনাদের পূর্ববর্তী একটি কাওমের কথা আমার মনে পড়লো, তারা একখানা কিতাব লিখেছিল এবং তাই নিয়ে তারা মগ্ন হয়ে আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি কখনো আল্লাহর কিতাবকে অন্য কোন কিছুর সাথে মিশাবো না।"

'উমার (রা) সুন্নাহ না লেখার যে কারণ উল্লেখ করেছেন তা ছিল যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী। কারণ সে সময় মুসলিমগণ কুরআন মুখস্থ, পঠন-পাঠন ও তিলাওয়াতের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। ফিতনা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ ধারাই চলতে থাকে। এরপর হাদীছের মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ এবং তাঁদের পরবর্তীরা জাল হাদীছের প্রবাহ ঠেকানো ও তার উৎস খুঁজে বের করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যান। তাঁদের এ অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার প্রথম ফল হলো হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন।

আমাদের পূর্ববর্তী এ আলোচনা থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সীমিত আকারে হলেও সুন্নাহ লেখার যে ধারা তৈরী হয়েছিল তা কি তাঁর ইনতিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বন্ধ করে দিয়েছিলেন? আসলে এ ধারণা অমূলক। খিলাফাতে রাশিদা এবং পরবর্তী উমাইয়্যা খিলাফাতকালে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সরকারি ঘোষণা দেয়া হয়নি ঠিক, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে লেখালেখির কাজ চলছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণ সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট থেকে সুন্নাহ লেখার কাজ সমানে চালিয়ে যান। যেমন সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইবনুল 'আব্বাসের (রা) সাথে উটের পিঠে চলার সময় তাঁর নিকট থেকে যে হাদীছ শুনতেন তা হাওদার কাঠে লিখে নিতেন। তারপর যখন নামতেন, কপি করে নিতেন। আবুয যানাদ (রহ) বলেন :

كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس.

"আমরা কেবল হালাল ও হারাম বিষয়ক সুন্নাহ লিখতাম, আর ইবন শিহাব যা কিছু শুনতেন লিখে নিতেন। যখন সেগুলোর প্রয়োজনবোধ করলাম, তখন জানলাম তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।" ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার (রা) খিলাফাতকালে হাররার যুদ্ধের সময় হিশাম ইবন 'উরওয়ার (রহ) লেখা সুন্নাহর বইগুলো পুড়ে যায়। তাই তিনি সারা জীবন আফসোস করে বলতেন :

لو أن عندى كتبى بأهلى ومالى -

"হায়, আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের সাথে যদি আমার বইগুলো আমার নিকট থাকতো!"[২৩৪]

বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের মধ্যে ৯৯ জনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় যাঁরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হিজরী প্রথম শতকের শেষে এবং দ্বিতীয় শতকের সূচনাতে বয়োকনিষ্ঠ তাবি'ঈ এবং তাবি'-তাবি'ঈগণের মধ্যে ২৫২ জনের নাম পাওয়া যায় যাঁদের নিকট হাদীছের লিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। এভাবে সাহাবী, তাবি'ঈন এবং তাবি'-তাবি'ঈন মিলে ৪০৩ জন রাবীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা হাদীছ লিখতেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি নিজেদের নিকট সংরক্ষণ করতেন। শুধু তাই নয়, এ ৪০৩ জন শায়খ হতে আবার তাঁদের ছাত্ররা পাণ্ডুলিপি তৈরী করে নিয়েছেন, তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এমনকি আরো সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন পাণ্ডুলিপি হতে সাত-আট, কোনটা হতে দশ-বার, আবার কোনটা হতে পনের-ষোলটি পাণ্ডুলিপিও তৈরী করা হয়েছে। এসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারীগণের নামও ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এভাবে হিসেব করলে হিজরী প্রথম শতক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার হাদীছের পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান ছিল।[২৩৫] প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইবন শিহাব আয-যুহরী (রহ) যখন তাঁর গৃহে হাদীছ অধ্যয়নে বসতেন তখন তাঁর চারপাশে রাখা গ্রন্থের স্তূপে তিনি তলিয়ে যেতেন। তার মধ্যে অনেক গ্রন্থ ছিল তাঁর নিজেরই লেখা।[২৩৬]

---

২৩৪. দিফা' 'আন আস-সুন্নাহ-২২

২৩৫. ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, 'দিরাসাত ফী আল-হাদীছ আন-নাবাবী (পৃ. ৯২-৩২৫) গ্রন্থের সূত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত-৩৭৯)

২৩৬. মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইন্‌দা আল-'আরাব-৫৪

হাদীছ সংকলনের সরকারী উদ্যোগ

সাধারণভাবে একথা প্রচলিত যে, সরকারীভাবে হাদীছ সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুতে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) (মৃ. হি. ১০১) নির্দেশক্রমে। তিনি তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ ছিলেন। তবে ইতিহাসে এ রকম তথ্যও পাওয়া যায় যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পূর্বে তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান মিসরের ওয়ালী থাকাকালে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা একটি পত্র ইবন সা'দ লাইছ ইবন সা'দের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

حدثنى أبى حبيب أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مُرَّةَ الحضرمى ـ وكانَ قد أدرك بحمص سبعين بَدْرِيًّا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليهٗ وسلم ـ قال ليث : وكان يسمى الجند المقدم، قال : فكتب إليه أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أحاديثهم، إلا حديث أبى هريرة فإنه عندنا.

"ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আমাকে বলেছেন, 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান কুছায়্যির ইবন মুররাকে লেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীছ শুনেছেন তা যেন লিখে পাঠান। তবে আবূ হুরাইরার (রা) হাদীছ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ তা আমাদের নিকট আছে। উল্লেখ্য যে, এই কুছায়্যির ইবন মুররা হিমসে রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তরজন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। লাইছ বলেন, তাঁকে 'অগ্রবর্তী সৈনিক' আখ্যায়িত করা হতো।"

হিমসের এই বিখ্যাত 'আলিম তাবি'ঈর নিকট মিসরের আমীরের এ পত্রটি লেখা হয় সম্ভবতঃ হিজরী ৭৫ সনে বা তার কাছাকাছি সময়ে। কারণ, কুছায়্যির হিজরী ৭৫ থেকে ৮০ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইনতিকাল করেন।[২৩৭]

তবে একথা সত্য যে, 'আবদুল 'আযীযের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আমীরুল

---

২৩৭. তাবাকাত-৭/৪৪৮; তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/১৭৭

মু'মিনীন 'উমার (রহ) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের সত্যিকার ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্র ও সর্বদা একথাটি উচ্চারণ করতে থাকেন :

أيها الناس قيدوا النعم بالشكر وقيدوا العلم بالكتاب.

"ওহে জনগণ! দান-অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা এবং জ্ঞানকে গ্রন্থের দ্বারা বন্দী কর।"[২৩৮]

তিনি মানুষকে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং খিলাফাতের বিভিন্ন অঞ্চলের 'আলিমদেরকে হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার নির্দেশ দেন। কারণ, বহু 'আলিম তাবি'ঈ যাঁরা তাঁদের বক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী ধারণ করে রেখেছিলেন, 'উমার আশঙ্কা করেছিলেন, সাহাবীগণের যুগ শেষ হতে চলেছে, আর তাবি'ঈগণের এই প্রজন্মটি দুনিয়া থেকে চলে গেলে এই হাদীছও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। তাছাড়া স্মৃতিতে ধারণ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও সবসময় পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে গ্রন্থে লিখিত না থাকায় প্রয়োজনের সময় হাদীছ দ্বারা উপকারও পাওয়া যায় না। এ সকল কারণের পাশাপাশি তখন জাল ও মিথ্যা হাদীছ ছড়িয়ে পড়ার ফলে কোনটি বিশুদ্ধ, আর কোনটি জাল হাদীছ তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কালক্রমে এ বিপদ আরো বৃদ্ধি পাবে, এ আশঙ্কায় 'উমারের মত আরো অনেক 'আলিম তাবি'ঈ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যেমন, ইমাম আয্ যুহরীর (রহ) একটি মন্তব্যে একথার সমর্থন পাওয়া যায় :[২৩৮]

لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها ولانعرفها، ما كتبت حديثا، ولا أذنت فى كتابته.

"পূর্বদিক থেকে যদি এমন সব হাদীছ আমাদের নিকট না আসতো যা আমরা জানি না, চিনি না, তাহলে আমি হাদীছ লিখতাম না এবং লেখার অনুমতিও দিতাম না।"

এরই প্রেক্ষিতে ইসলামী খিলাফাতের সর্বোচ্চ কর্ণধার আমীরুল মু'মিনীন 'উমার উপলব্ধি করেন হাদীছ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

---

২৩৮. ইবন আল-জাওযী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয-২৭৬

২৩৮. তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/১৭৭

তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. তিনি মদীনার তৎকালীন আমীর, বিখ্যাত ইমাম ও সমকালীনদের মধ্যে বিচার কাজে সর্বাধিক দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আবূ বাকর ইবন হাযমকে স্বীয় চিন্তা ও শঙ্কার কথা উল্লেখ করে হাদীছ লেখার নির্দেশ দেন এভাবে :[২৩৯]

انظر ما كان من حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاكتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبى صلى اللّه عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً.

"রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তা লিপিবদ্ধ করুন। আমি 'ইলমের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করছি। তবে কেবল নবীর (সা) হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। 'ইলমের প্রসার ঘটান এবং শিক্ষাদানের জন্য বসুন, যাতে যে জানে না সে জানতে পারে। কারণ, 'ইলম যতক্ষণ গোপন না হয়ে পড়ে, বিলীন হয় না।"

আদ-দারিমী 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২৪০]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أكتب إلىّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وبحديث عمر، فإنى قد خشيت درس العلم وذهابه.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বাকর ইবন হাযমকে লেখেন : আপনার নিকট যা কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বলে প্রমাণিত, তা এবং 'উমারের (রা) হাদীছ আমাকে লিখে পাঠান। কারণ, আমি 'ইলমের বিলুপ্তি ও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।"

---

২৩৯. ফাতহুল বারী-১/১৯৪-১৯৫

২৪০. সুনান আদ-দারিমী-১/১২৭

ইবন সা'দের 'তাবাকাত'-এর একটি বর্ণনায় আমারা বিনৃত 'আবদির রাহমানের হাদীছের কথা এসেছে।[২৪১]

২. তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রীকেও এ ব্যাপারে পত্র লেখেন। তিনি বলেন :

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে সুনান (সুন্নাহসমূহ) সংগ্রহের নির্দেশ দেন। আমরা তা ভিন্ন ভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ করি। অতঃপর তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীন খিলাফাতের প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে খাতা পাঠান।"

তিনি যাকাত বণ্টনের আটটি খাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ আছে তা লিখে পাঠানোর জন্য ইমাম যুহরীকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তা বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান।[২৪২]

এরই প্রেক্ষিতে হাফিজ ইবন হাজার (রহ) বলেন :[২৪৩]

وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد.

"হিজরী প্রথম শতকের মাথায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নির্দেশে ইবন শিহাব আয-যুহরী সর্বপ্রথম হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়। তারপর শুরু হয় গ্রন্থাবদ্ধকরণ। এতে বহু কল্যাণ অর্জিত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।"

৩. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ইসলামী খিলাফাতের সকল শহর ও জনপদে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ সম্বলিত ফরমান পাঠান। এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে, তা দু'একটি সুন্নাহই হোক না

২৪১. তাবাকাত-২/৩৮৭; উসূল আল-হাদীছ-১৭৬-১৭৭

২৪২. কিতাব আল-আমওয়াল-২৩১-২৩২

২৪৩. তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/১৭৯

কেন, তাদের এ কাজে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার বলেন :[২৪৪]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإنى حفت دروس العلم وذهاب أهله.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনাবাসীদেরকে লেখেন : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং লিপিবদ্ধ করুন। কারণ আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিরোধানের ভয় করছি।"

আবূ নু'আইম 'তারীখে ইসবাহান' গ্রন্থে বলেছেন :[২৪৫]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه فإنى أخاف دروس العلم وذهاب العلماء.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফাতের দূরবর্তী অঞ্চলে লিখে পাঠান : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ দেখুন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করুন। আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করছি।"

৪. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) কেবল হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করারই নির্দেশ দেননি, বরং সর্বত্র তার ব্যাপক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করার জন্যও সুস্পষ্ট ফরমান জারি করেন। একজন শাসনকর্তার নামে পাঠানো তাঁর একটি ফরমান নিম্নরূপ :[২৪৬]

أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم فى مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت.

"বিদ্বান ব্যক্তিগণকে আদেশ করুন তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে সুন্নাহর শিক্ষা

---

২৪৪. সুনান আদ-দারিমী-১/১৩৭; ফাজরুল ইসলাম-২২১

২৪৫. ফাতহুল বারী-১/১৯৭; ফাজরুল ইসলাম-২২১

২৪৬. তাবি'ঈদের জীবনকথা-১৭৯

দান ও তার ব্যাপক প্রচার করেন। কারণ সুন্নাহ্ প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।"

সুন্নাহ্ লিপিবদ্ধকরণে তাঁর রীতি-পদ্ধতি

সুন্নাহ্ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ্) একটি সঠিক ও শক্তিশালী পদ্ধতি অনুসরণ করেন, অনেকগুলো কঠিন শর্ত মেনে চলেন এবং কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। মোটামুটি চারটি বিষয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

১. এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতা ও সাফল্যের প্রমাণ রেখেছেন। যেমন, আবূ বাকর ইবন হাযম (রহ্)। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইমাম মালিক (রহ্) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :

ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أتم حالا، ولا رأيت من أوتى مثل ما أوتى : ولاية المدينة والقضاء والموسم، وقال كان رجل صدق، كثير الحديث.

"আমি ইবন হাযমের মত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ অবস্থার আর কাউকে দেখিনি। তিনি যা লাভ করেছেন অন্য কেউ তা লাভ করেছে, এমন কাউকে আমি দেখিনি। যেমন, মদীনার শাসন কর্তৃত্ব, বিচার ও হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন : তিনি ছিলেন একজন সত্য-সঠিক মানুষ, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।" ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : كان ثقة عالما، كثير الحديث - "তিনি একজন বিশ্বস্ত 'আলিম, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।" হিজরী ১২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[২৪৭]

তাঁর নির্বাচিত আরেকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম আয-যুহ্রী (রহ্)। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, হাদীছের হাফিয। লাইছ ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেন : "আমি ইবন শিহাবের চেয়ে হাদীছে অধিক পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভীতি-প্রদর্শনমূলক হাদীছ বর্ণনা করলে আমরা বলতাম, এর চেয়ে সুন্দর আর হয় না। যদি আরবদের ইতিহাস ও বংশবিদ্যা বিষয়ে বর্ণনা

---

২৪৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৯৫; আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া-৯/৩৪০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

করতেন, বলতাম এর চেয়ে ভালো আর হয় না। আর কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে বর্ণনা করলে বলতাম, সঠিক কথাই বলেছেন।"[২৪৮] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মানুষকে তাঁর মজলিসে বসার নির্দেশ দিয়ে বলতেন :

عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه.[২৪৯]

"তোমরা ইবন শিহাব থেকে গ্রহণ করবে। কারণ অতীত সুন্নাহ বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশি জানে এমন কাউকে তোমরা পাবে না।"

ইমাম মাকহূলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি যাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানেন কে? বললেন : ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁরপর কে? বললেন : ইবন শিহাব। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র আশি রাতে কুরআন মুখস্থ করেন।[২৫০] ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে, এমন নব্বইটি (৯০) হাদীছ আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।[২৫১] ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেন : لولا الزهرى لذهبت السنن من المدينة.

"আয-যুহ্‌রী না হলে মদীনার সুন্নাহ হারিয়ে যেত।" এরূপ মন্তব্য আরো বহু মনীষী করেছেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন : أول من دوّن العلم ابن شهاب - "সর্বপ্রথম যিনি 'ইলম তথা হাদীছ সংকলন করেন, তিনি হলেন ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী।" আয-যুহ্‌রী নিজেও এ গৌরবের দাবি করতেন এভাবে :

لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني -

"আমার পূর্বে আর কেউ এই 'ইলম ('ইলমে হাদীছ) সংকলন করেননি।"[২৫২]

২. তিনি সাধারণভাবে সুন্নাহ বা হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি অত্যধিক গুরুত্বের কারণে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত সুন্নাহ লেখার জন্য বিশেষ তাকিদ দেন। যেমন তিনি আবূ বাকর ইবন হাযমকে

---

২৪৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৩২৬

২৪৯. কিতাব আল-আগানী-৪/৫২; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়াল-৪/১৭৭-১৭৮; মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইন্‌দা আল-'আরাব-৫৪

২৫০. তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/১৮১

২৫১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১০৪

২৫২. প্রাগুক্ত-১০৪, ২১১; রিজাল শাস্ত্র-২৬৮

'আমারা বিনত 'আবদির রাহমান বর্ণিত হাদীছসমূহ লেখার নির্দেশ দেন। কারণ তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। তাই তিনি ছিলেন 'আয়িশার (রা) হাদীছে বিশেষ পারদর্শিণী। ইবনুল মাদীনী বলেন, 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা বিশ্বস্ত বিদূষী মহিলাদের একজন 'আমারা। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলেন, তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি জ্ঞানের এমন সাগর যা কখনো শুকাবে না। হিজরী ৯৮ মতান্তরে ১০৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

তিনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার ব্যাপারেও আবূ বাকর ইবন হাযমকে নির্দেশ দেন। কারণ, তিনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের বিচার-ফায়সালা, যাকাত বণ্টনের নিয়ম-নীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো তাঁর ফরমানের অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)-কেও তিনি অনুরোধ করেন তাঁদের মহান ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'উমারের (রা) জীবনচিত্র লিখে পাঠানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা। তেমনিভাবে তিনি আবূ বাকর ইবন হাযমকে লেখেন যাকাত-সাদাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) লিখিত পত্রাদির অনুলিপি পাঠানোর জন্য, যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।[২৫৩]

৩. যাঁরা হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করবেন, 'উমার (রা) তাঁদেরকে সহীহ্ ও গায়র সহীহ্ হাদীছের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। যাতে কোনভাবে জাল হাদীছ বিশুদ্ধ হাদীছ হিসেবে লিখিত না হয়। একথা তিনি ইবন হাযমকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যা আদ-দারিমী বর্ণনা করেছেন। এ রকম আরেকটি চিঠি ইমাম আহমাদ (রহ) 'আল-'ইলাল' গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

পরবর্তীকালে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এই দিক নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪. হাদীছের বিশুদ্ধতা ও হাদীছ বর্ণনা ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেও ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের একজন। যাঁদেরকে তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ দেন তাঁদের চেয়ে তিনি নিজে কোন অংশে কম ছিলেন না। এ কারণে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই-এর উদ্দেশ্যে 'আলিমদের সংগৃহীত হাদীছের ব্যাপারে তাঁদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আবুয যিনাদ 'আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান বলেন : "আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে

২৫৩. প্রাগুক্ত; তাবি'ঈদের জীবনকথা-১৮১

ফকীহগণের সাথে সমাবেশ করতে দেখেছি। তাঁরা বহু হাদীছ উপস্থাপন করেন। যখন এমন কোন হাদীছ উপস্থাপন করা হতো যার উপর বর্তমানে 'আমল নেই, তিনি বলতেন : এটা অতিরিক্ত, এর উপর এখন আর 'আমল নেই।"[২৫৪]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এই লিপিবদ্ধকরণের সুফল

প্রাথমিক পর্বের এই প্রচেষ্টা এক সুদূর প্রসারী কল্যাণ বয়ে আনে। ইমাম আয-যুহ্রী যে খাতাগুলো তৈরি করেছিলেন, 'উমার তার অনেকগুলো কপি করে খিলাফাতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, বহু 'আলিম নিজের শোনা ও স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীছগুলো লিখে রাখেন, যাতে প্রয়োজনমত বার বার দেখে নেয়া যায়। তবে সরকারীভাবে যে লেখালেখি হয় এবং খিলাফাতের সর্বত্র যার সুফল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার সবটুকু কৃতিত্ব 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের।

রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর 'উমার ইবন আল- খাত্তাবের (রা) পরামর্শে খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বিভিন্নজনের নিকট ছড়িয়ে থাকা কুরআন একত্র করেন। এই কুরআন সংগ্রহ ও একত্রকরণে তাঁরা উভয়ে মুসলিম উম্মাহর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তারপর তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রা) কুরআন সংরক্ষণের অসমাপ্ত কাজটুকু সমাপ্ত করে যান। আল-কুরআনের পরে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস আস-সুন্নাহ। এই সুন্নাহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার সরকারী ফরমান জারি করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর পূর্বসূরী খুলাফায়ে রাশেদীনের মত আরেকটি অক্ষয় অবদান রেখে যান। সংগ্রহ ও লেখার সরকারী উদ্যোগ যদি তিনি সেদিন না নিতেন তাহলে হয়তো বহু সুন্নাহ তাঁর সময়ে না হলেও পরবর্তীকালে হারিয়ে যেত। তাছাড়া পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ তাদের নবীর (সা) সুন্নাহ সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে যে সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং ব্যাপকভাবে মনোযোগী হয়েছে, তার পশ্চাতেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর তিরিশ মাসের শাসনকালে যে মহৎ কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে, হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের এই সরকারী নির্দেশই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মুসলিম উম্মাহর নিকট চিরকাল স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

এখানে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম আয-যুহ্রী (রহ) ও অন্যরা প্রাথমিক পর্যায়ে যে সংকলনগুলো তৈরী করেন তা অবশ্যই পরবর্তীকালের

২৫৪. প্রাগুক্ত

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখের সংকলনগুলোর মত ছিল না। সেগুলো ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের সংকলন, তাই তাতে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি বিভক্ত করে সাজানো হয়নি। তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের নিকট যা কিছু পেয়েছেন, সবই লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এমনিই হয়ে থাকে। এমনকি সাহাবীদের কথা ও তাবি'ঈদের ফাতওয়াও তাঁরা লিখেছেন। তবে পরবর্তীকালে তা বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে, যেমন বিষয়ভিত্তিক, রাবীর নামভিত্তিক ইত্যাদি ভাবে সাজানো হয়েছে।

ইমাম আয-যুহ্‌রীর (রহ) পরবর্তী সময়ে সুন্নাহ সংকলন

ইমাম আয-যুহ্‌রীর (রহ) পরবর্তী সময়ে যাঁরা ইসলামী খিলাফাতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সুন্নাহ সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন :

মক্কায় ইবন জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হি.) ও ইবন ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.); মদীনায় সা'ঈদ ইবন আবী 'উরূবা (মৃ. ১৫৫ হি.), রাবী' ইবন সুবাইহ (মৃ. ১৬০ হি.) ও ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯ হি.); বসরায় হাম্মাদ ইবন সালামা (মৃ. ১৬৭ হি.); কূফায় সুফইয়ান আছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১ হি.); সিরিয়ায় আবূ 'আমর আল-আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭ হি.); ওয়াসিত-এ হুশাইম (মৃ. ১৭৩ হি.); খুরাসানে 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.); ইয়ামানে মা'মার (মৃ. ১৫৪ হি.) এবং রায়-এ জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ (মৃ. ১৮৮ হি.)। এ কাজে আরো সম্পৃক্ত হন সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা (মৃ. ১৯৮ হি.), লাইছ ইবন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.)। শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ (মৃ. ১৬০ হি.) ও মূসা ইবন 'উকবা (মৃ. ১৪১ হি.)।[২৫৫] এঁরা সকলেই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ সুন্নাহ বা হাদীছ বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের মধ্যে কে প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এঁদের সংগৃহীত গ্রন্থসমূহে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবি'ঈগণের ফাতওয়াও স্থান লাভ করে এবং কোন অধ্যায়, পরিচ্ছেদে বিভক্তও করা হয়নি। ইবন হাজারের মতে হাদীছসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে সর্বপ্রথম বিভক্ত করেন– ইমাম আশ-শা'বী (রহ)।[২৫৬]

এ যুগে সুন্নাহ সংকলনে যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে আরো কয়েকজন হলেন : ইমাম আবূ ইউসুফ (হি. ১১৩-১৮২), ইমাম মুহাম্মাদ (হি. ১৩১-১৮৯), এঁরা

২৫৫. ফাজরুল ইসলাম-২২২; মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইন্দা আল-'আরাব-৪৫

২৫৬. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১০৫

ইমাম মালিকের (রহ) অনুরূপ কাজ করেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃ. ১৮১ হি.) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।[২৫৭]

হিজরী দ্বিতীয় শতকের হাদীছের বিখ্যাত সংকলনসমূহ

এ শতকের বিখ্যাত সংকলনসমূহ হচ্ছে : ইমাম মালিক ইবন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি.) এর 'আল-মুওয়াত্তা' (الموطا), ইমাম আশ-শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪ হি.)-'এর আল-মুসনাদ' ও 'মুখতালাফুল হাদীছ', ইমাম 'আবদুর রায্যাক (মৃ. ২১১ হি.)-এর 'আল-জামি', শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ (মৃ. ১৬০ হি.)-এর 'মুসান্নাফ', সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা (মৃ. ১৯৮ হি.)-এর 'মুসান্নাফ এবং লাইছ ইবন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.)-এর 'মুসান্নাফ'।

ইমাম মালিক, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, ইবন সা'দ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং আবূ বাকর ইবন আবী শাইবার সংকলনগুলো বর্তমানকাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। মূসা ইবন 'উকবার 'আল-মাগাযী' গ্রন্থের একটি অংশও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া যাঁদের পাণ্ডুলিপিগুলো পাওয়া যাচ্ছে না তাও মূলত বিলীন হয়ে যায়নি, বরং সেগুলোর সার্বিক বিষয়বস্তু ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং তাঁদের সমসাময়িকগণ ও পরবর্তীগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এ জন্য আমরা এসব দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির এখন আর মুখাপেক্ষী নই।[২৫৮]

হিজরী তৃতীয় শতক

হিজরী তৃতীয় শতকে 'ইল্‌মে হাদীছের চর্চা, লিখন ও পঠন-পাঠন আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এ শতকে 'ইল্‌মে হাদীছের এক-একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতকের মুহাদ্দিছগণ রাবী ও হাদীছের সন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন। এক-একটি শহর, এক-একটি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদীছসমূহ তাঁরা পূর্ণ সনদসহ সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ যুগে হাদীছ সংকলনের সূচনা হয় 'মুসনাদ' পদ্ধতিতে। সেই পদ্ধতিটি হলো, একই সাহাবী থেকে বর্ণিত সকল হাদীছ, তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, এক স্থানে ধারাবাহিকভাবে

২৫৭. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-৩১৩

২৫৮. প্রাগুক্ত

লিপিবদ্ধ করা। এ পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক যারা তাঁরা হলেন– 'আবদুল্লাহ ইবন মূসা আল-'আবসী আল-কূফী, মুসাদ্দাদ আল-বাসরী, আসাদ ইবন মূসা ও নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ (রহ)। এরপর আরো বহু হাদীছ বিশারদ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আর এরি ধারাবাহিকতায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে হাদীছের বিখ্যাত 'মুসনাদ' গ্রন্থটি। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ (রহ) হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় শতকের প্রথম চল্লিশটি বছর (মৃ. ২৪১ হি.) জীবন লাভ করেন। তিনি সারাটি জীবন হাদীছ সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ে কাটিয়ে দেন। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রহ সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার বর্ণনা থেকে বাছাই করে মাত্র তিরিশ হাজার হাদীছ তাঁর এই 'মুসনাদ' গ্রন্থে সংকলিত করেন। যা তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বলে প্রমাণিত হয়েছে কেবল তাই এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন, আর যা প্রমাণিত হয়নি তা বাদ দিয়েছেন।[২৫৯]

এরপর আবির্ভাব ঘটে হাদীছ যাচাই-বাছাই, সংগ্রহ ও সংকলন জগতের দুই উজ্জ্বল রত্নের, তাঁরা হলেন : মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (হি. ১৯৪-২৫৬) ও মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কাশয়ারী আন-নীসাবুরী (হি. ২০৪-২৬১)। প্রথমজন ইসলামী খিলাফাতের পূর্বাঞ্চলের বুখারায় জীবন অতিবাহিত করেন এবং সমরকন্দের সন্নিকটে ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় জনের জীবন অতিবাহিত হয় ইরানের নিশাপুর এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন।

এ দু'জন দু'খানা বিখ্যাত সহীহ হাদীছ গ্রন্থের সংকলক। এ গ্রন্থ দু'খানি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার বলে মুসলিম উম্মাহর নিকট স্বীকৃত।

এরপর তাঁদের দু'জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরো অনেকে হাদীছ সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বহু নতুন সংকলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার মধ্যে চারখানা সুনান গ্রন্থ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সেগুলো হলো :

১. সুনানু মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ্ (মৃ. ২৭৩ হি.)

২. সুনানু আবী দাঊদ আস-সিজিসতানী (মৃ. ২৭৫ হি.)

৩. সুনানু আবী 'ঈসা আত-তিরমিযী (মৃ. ২৮৭ হি.)

৪. সুনানু আহমাদ ইবন 'আলী আন-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.)

---

২৫৯. মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইন্দা আল-'আরাব-৪৫

উপরোক্ত দু'খানি সহীহ গ্রন্থসহ এ ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থ মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ও আস্থার সাথে গ্রহণ করেছে এবং এর নাম দিয়েছে 'আল-কুতুব আস-সিত্তা' (الكتب الستة) অর্থাৎ ছয়খানি গ্রন্থ। উল্লেখিত ইমামগণ পূর্ববর্তীদের পাণ্ডুলিপি থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজেদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হাদীছ সংগ্রহ করা, জাল হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছ পৃথক করা, দা'ঈফ ও মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) হাদীছ চিহ্নিত করা ইত্যাদি কাজ এত সহজ ছিল না। এ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও কঠিন কাজ ছিল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় নবীর (সা) সুন্নাহর হিফাযাতের জন্য এমন কিছু প্রতিভাধর মানুষ সৃষ্টি করেন যাঁরা এই দুঃসাধ্য কাজকে সহজসাধ্য করে তোলেন। সুন্নাহর এ সকল শিক্ষার্থী তথা গবেষকগণ বিশ্বাসভাজন হাফিযে হাদীছের মুখ থেকে হাদীছ শোনার জন্য গোটা ইসলামী খিলাফাত চষে বেড়িয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, এই গ্রন্থটি আমি সাড়ে সাত লাখ বর্ণনা থেকে বেছে রচনা করেছি। তিনি দু'টি অথবা তিনটি হাদীছের জন্য বহু দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করেছেন।[২৬০] তেমনিভাবে ইমাম বুখারীও ইসলামী খিলাফাতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিন লাখ বর্ণনা সংগ্রহ করেন এবং তার থেকে অতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করে যে সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন তাতে মাত্র সাত হাজার দু'শো পঁচাত্তর (৭২৭৫)টি হাদীছ স্থান পায়। এই হাদীছের অন্বেষণে তিনি খুরাসান, ইরাক, মিসর, শামসহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং এ সকল স্থানের প্রায় এক হাজার শায়খ (উস্তাদ)-এর নিকট থেকে ফায়দা লাভ করেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর পূর্বসূরী ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) 'আল-মুসনাদ' থেকেও তিনি উপকৃত হয়েছেন।[২৬১]

ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজও (রহ) কম করেননি। তিনিও ইমাম আল-বুখারীর (রহ) মত শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছেন। তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) প্রত্যক্ষ ছাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর থেকে পূর্ণমাত্রায় উপকার লাভ করেছেন। ইমাম আল-বুখারীর নিশাপুর ভ্রমণের সময় ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। তিনি কেবল হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশে একাধিকবার বাগদাদ সফর করেন। তাছাড়া ইরাক, শাম, মিসর ও হিজাজেও ঘুরে বেড়ান।

---

২৬০. প্রাগুক্ত

২৬১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৫৫

এভাবে তিনি মোট তিন লাখ বর্ণনা সংগ্রহ করেন এবং একাধারে পনের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তা যাচাই-বাছাইয়ের পর মাত্র বারো হাজার হাদীছের সমন্বয়ে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থটি সংকলন করেন।[২৬২]

হিজরী চতুর্থ শতক

এ শতকের হাদীছ বিশারদগণ তৃতীয় শতকে যে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তার সাথে উল্লেখযোগ্য নতুন কোন কিছু যুক্ত করতে সক্ষম হননি। পূর্ববর্তীরা যা সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকেই তাঁরা তাঁদের সংকলনগুলো তৈরী করেন, পূর্ববর্তীদের সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর তাঁরা নির্ভর করেন এবং আর যে কাজটি করেন তা হলো একটি হাদীছকে একাধিক সনদ সূত্রে বর্ণনা করা। এ শতকের সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন ইমাম হলেন : ১. সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.)। তিনি তিনখানা বিখ্যাত 'আল-মু'জাম' গ্রন্থের সংকলক। যেমন, ক. আল-মু'জাম আল-কাবীর, এতে তিনি প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীছ পৃথক পৃথকভাবে এবং নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাহাবীদেরকেও সাজিয়েছেন। এতে স্থান পেয়েছে পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার হাদীছ। খ. আল-মু'জাম আল-আওসাত, গ. আল-মু'জাম আল-আসগার। ২. আদ-দারাকুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), ৪. ইবন খুযাইমা (মৃ. ৩১১ হি.), ৫. আত-তাহাবী (রহ) মৃ. ৩২১ হি.)।

হিজরী চতুর্থ শতকে সুন্নাহ তথা হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালের 'আলিমগণ যা কিছু করেছেন তা সবই পূর্ববর্তীকালের সহীহ গ্রন্থগুলোর কিছু সংশোধনী ও সংযোজনী ছাড়া তেমন কিছু নয়। যেমন আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন-নীসাবূরী (মৃ. ৪০৫ হি.)-এর 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থটি। এতে তিনি ঐ সকল হাদীছ সংকলন করেছেন যা তাঁর দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশ করেননি। পরবর্তীকালের 'আলিমগণ, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ইমাম আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), আল-হাকিমের দাবির একাংশের সত্যতা মেনে নিলেও বাকী অংশের বিরোধিতা করেছেন।[২৬৩]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের সরকারী ফরমান জারী করার পর বেশি দিন বেঁচে

---

২৬২. মানাহিজ আত-তালীফ 'ইন্‌দা আল-আরাব-৪৫

২৬৩. আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-১০৬-১০৭

ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এ ফরমানের ফলে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত তাতে আর ভাটা পড়েনি। বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক শতক পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

হিজরী প্রথম শতকে যতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, পরিমাণে, আকারে ও পদ্ধতিগতভাবে বিরাট কিছু না হলেও তার ফলেই যে হাদীছ গ্রন্থে সংকলনের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম থেকেই এ কাজ যথাযথ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন হতে শুরু করে এবং তৃতীয় শতকে গিয়ে তা পূর্ণতায় পৌঁছে। এ শতকে হাদীছ একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক-একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতকে একদিকে যেমন হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটে, অপরদিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীছ চর্চার অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ শতকেরই অমূল্য অবদান বিখ্যাত 'সিহাহ সিত্তা' তথা ছয়খানি সহীহ হাদীছ গ্রন্থ। এভাবে অসংখ্য মুহাদ্দিছের জীবনপণ চেষ্টার ফলে মহানবীর (সা) মহান সুন্নাহ বা হাদীছ চিরকালের জন্য সংশয়মুক্ত হয়ে সুরক্ষিত হয়ে যায়।

দুই. হাদীছের পরিভাষা বিদ্যা (علم مصطلح الحديث)

এই বরকতময় আন্দোলনের আরেকটি ফসল হলো 'ইলমু মুসতালাহিল হাদীছ' তথা হাদীছের পরিভাষা বিদ্যা। জাল হাদীছ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে মুহাদ্দিছগণ যে সকল নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করেন তা এ সময় লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা সকল সুন্নাহ বা হাদীছকে তিনটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত করেছেন, তারপর সেগুলোকে আরো বহু উপ-ভাগে বিভক্ত করেন। এ বিদ্যার মাধ্যমে এমন কিছু বিজ্ঞানসম্মত মৌল নীতির বিষয় জানা যায় যা দ্বারা তথ্যসমূহের সত্যতা নিরূপণ করা যায়। ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ[২৬৪]

علم بأصول وقواعد يعرف به احوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

'এ এমন কিছু মূলনীতি ও রীতি-পদ্ধতির জ্ঞান যা দ্বারা গ্রহণ ও বর্জনের দিক দিয়ে সনদ ও মতনের অবস্থাসমূহ জানা যায়।' এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো

২৬৪. তায়সীরু মুসতালাহ আল-হাদীছ–১৫

সনদ ও মতন এবং মূল লক্ষ্য হলো দুর্বল ও ভেজাল হাদীছ থেকে সহীহ্ হাদীছ পৃথক করা। খবর ও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তাদের উদ্ভাবিত এ সকল নিয়ম-নীতি ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক। আমাদের হাদীছ বিশেষজ্ঞগণই সর্বপ্রথম এ মূল নীতিসমূহ উদ্ভাবন করেন। তবে পরবর্তীতে ইতিহাস, ফিক্‌হ, তাফসীর, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এ সকল নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করা হয়।

ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগসমূহে জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের রচনা ও সংকলনসমূহের সকল কথা ও বর্ণনা অবিচ্ছিন্ন সনদে প্রথম সূত্র পর্যন্ত পৌঁছানোর একটা রীতি গড়ে ওঠে। যেমন আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী (হি. ২৮২-৩৫৬)-এর বিখ্যাত 'কিতাবুল আগানী' গ্রন্থটি সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, গান ও সূর বিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও তার সকল তথ্য সনদসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৬৫] আসলে তখন ইলমে হাদীছের ব্যাপক চর্চার কারণে এমন একটি ধারা গড়ে উঠেছিল যে, সনদ ছাড়া কেউ কোন তথ্য উপস্থাপন করলে মানুষ তা গ্রহণ করতে চাইতো না। অবশ্য ইলমে হাদীছ ছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সনদের তেমন যাচাই-বাছাই করা হতো না। এমনকি 'আলিমদের রচিত গ্রন্থসমূহ তাদের ছাত্ররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করে আসছে। যেমন ইমাম আল-বুখারীর (রহ) সহীহ গ্রন্থটি, আজো মুহাদ্দিছগণ তাঁদের সনদ-সূত্র ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই শাস্ত্র খবর বা হাদীছকে প্রথমতঃ তিনভাগে এবং তারপর আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করে আলোচনা করে থাকে। তাছাড়া আলোচনা করে থাকে রাবীর গুণাবলী, দোষ-ত্রুটি, বর্ণিত হাদীছের ত্রুটি-বিচ্যুতি, যেমন হাদীছ মু'আল্লাল, মুদতারার, শায ইত্যাদি কিনা, কোন্ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কোনটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হবে ; হাদীছ শোনা, ধারণ করা, অন্যের নিকট পৌঁছানো ইত্যাদি কিভাবে করতে হবে, মুহাদ্দিছ ও হাদীছের ছাত্রদের আদব-কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ভাগ করে আলোচনা করে থাকে। এ বিষয়ে হিজরী প্রথম তিন শতকের আলিমগণ কিছু নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি উদ্ভাবন করেন এবং বিভিন্ন জন তা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সংগ্রহ, সংকলন ও সুবিন্যস্ত করেন। এ শাস্ত্রের উন্নতি ও অগ্রগতি বিশেষ কোন ব্যক্তির হাতে অথবা বিশেষ একটি যুগে হয়নি, বরং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের মত এরও উন্নতি ঘটেছে ধাপে ধাপে।

---

২৬৫. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব 'আরাবী–২/৪৯০

হিজরী চতুর্থ শতকে এ শাস্ত্রের উপর প্রথম লেখালেখি শুরু হয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ইমাম আল-বুখারীর (রহ) উস্তাদ 'আলী ইবন আল-মাদীনী (হি. ১৯৪-২৫৬) স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তারপর এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়। নিম্নে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. المحدث الفاصل بين الراوى والسامع (আল-মুহাদ্দিছ আল-ফাসিল বাইনা আর-রাবী ওয়াস সামি') ঃ এটি রচনা করেন কাজী আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন 'আবদির রহমান আর-রামাহুরমুযী (মৃ. ৩৬০ হি.)। এ গ্রন্থে তিনি আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে সুনিপুণভাবে সাজান। কিন্তু এতে এ শাস্ত্রের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২. معرفة علوم الحديث (মা'রিফাতু 'উলূম আল-হাদীছ) ঃ এটির রচয়িতা আল-হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ আন-নীসাবূরী (মৃ. ৪০৫ গি.)। তবে এ গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত নয়।

৩. المستخرج على معرفة علوم الحديث (আল-মুসতাখারাজু 'আলা মা'রিফাতি 'উলূম আল-হাদীছ) ঃ এটির রচয়িতা আবূ নু'আইম আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.)। তাঁর রচনাটি স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ ছিল না, বরং সেটি ছিল পূর্বসূরী আল-হাকিম আন-নীসাবুরীর গ্রন্থটির কিছু সংশোধন ও তার সাথে কিছু সংযোজন। কিন্তু তাতেও তিনি অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছেন।

৪. الكفاية فى علم الرواية (আল-কিফায়া ফী 'ইল্‌ম আর-রিওয়ায়া) ঃ বইটি রচনা করেন আবু বাকর আহমাদ ইবন 'আলী আল-খাতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.)। এ শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়মাবলী এবং রিওয়ায়াতের রীতি-নীতিসমূহ এতে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। এটি এ শাস্ত্রের একটি উৎস-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৫. الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع (আল-জামি 'লি আখলাক আর-রাবী ওয়া আদাব আস-সামি') ঃ এটিরও রচয়িতা আল-খাতীব আল-বাগদাদী। গ্রন্থটির শিরোনাম দ্বারাই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এতে তিনি রাবীদের নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব, অভিরুচি ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি হাদীছ শ্রবণকারী শিক্ষার্থীদের আদব-আখলাক, নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এ শাস্ত্রের জন্য

এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। এতে অতি মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে। আসলে হাদীছ শাস্ত্রের এমন কোন শাখা নেই যে ক্ষেত্রে আল-খাতীব আল-বাগদাদী কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তাই হাফিজ আবূ বাকর ইবন নুকতা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ[২৬৬]

كل من انصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبة.

"যে কেউ ইনসাফের সাথে মূল্যায়ন করলে জানবে যে, মুহাদ্দিছগণ আল-খাতীবের পরে তাঁরই গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভরশীল।"

৬. الإلماع إلى معرفة أصُوْل الرواية وتقييد السماع (আল-ইলমা'-ইলা মা'রিফাতি উসূল আর-রিওয়ায়াহ্ ওয়া তাকয়ীদ আস-সিমা') ঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেন কাজী 'আয়াদ ইবন মূসা আল-ইয়াহসিবী (মৃ. ৫৪৪ হি.)। এ শাস্ত্রের পরিভাষার সকল বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পায়নি। কেবলমাত্র ধারণ ও বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ এতে স্থান লাভ করেছে। আল-বাগদাদীর গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন তিনি। আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও সুবিন্যাসের দিক দিয়ে এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ।

৭. مالا يسمع المحدث جهله (মালা ইয়াসা'উ আল-মুহাদ্দিছা জাহ্লুহূ) ঃ এ একটি পুস্তিকা, রচনা করেন আবু হাফ্স 'উমার ইবন 'আবদিল মাজীদ আল-মায়ানাজী (মৃ. ৫৮০ হি.)।

৮. علوم الحديث ('উলূম আল-হাদীছ) ঃ এ গ্রন্থটির রচয়িতা আবু 'আমর 'উসমান ইবন 'আবদির রহমান আস-শাহ্‌রাযুরী, ইতিহাসে তিনি ইবনুস সালাহ নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ৬৪৩ হি.)। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষা বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে এটি সর্বোত্তম এবং মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক। এতে অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হলেও সুবিন্যস্ত নয়। ইতিহাসে এ গ্রন্থটি– مقدمة ابن الصلاح – (মুকাদ্দিমাতু ইবনুস সালাহ) নামে প্রসিদ্ধ। এটি সুবিন্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, তিনি দিমাশকের আশরাফিয়া মাদরাসায় ক্লাসে অল্প অল্প করে অবিন্যস্তভাবে ছাত্রদের ইমলা' বা শ্রুতলিখান। অবশ্য তিনি এ গ্রন্থে খাতীব আল-বাগদাদী ও তাঁর পূর্ববর্তীরা তাঁদের রচনাসমূহে যা কিছু বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন তা সবই সন্নিবেশ করেছেন। যাই হোক গ্রন্থটি পরবর্তীকালের 'আলিমগণকে মুগ্ধ করেছে। তাই অনেকে তার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেছেন,

২৬৬. তায়সীরু মুসতালাহ আল-হাদীছ–১২

অনেকে কাব্যরূপ দিয়েছেন, অনেকে সমালোচনা করেছেন, আবার অনেকে তার পক্ষ অবলম্বন করে প্রশংসাও করেছেন।

৯. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير (আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি মা'রিফাতি সুনান আল-বাশীর আন-নাযীর) ঃ এটি রচনা করেন মুহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবন শারফ আন-নাওবী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। মূলত এটি ইবনুস সালাহ'র 'উলূম আল-হাদীছ' গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থটি চমৎকার, তবে মাঝে মাঝে আলোচিত বিষয় দুর্বোধ্য রয়ে গেছে।

১০. تدريب الراوى فى شرح تقريب النووى (তাদরীব আর-রাবী ফী শারহি তাকরীব আন-নাওবী) ঃ এর রচয়িতা জালাল উদ্দীন 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকর আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.)। নাম দ্বারাই বুঝা যায়, এটি ইমাম আন-নাওবীর পূর্বে উল্লেখিত 'আত-তাকরীব' গ্রন্থটির ব্যাখ্যা। লেখক এতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় 'সন্নিবেশ করেছেন।

১১. نظم الدرر فى علم الأثر (নাজমুদ দুরার ফী 'ইলম আল-আছার) ঃ এর রচয়িতা যাইনুদ্দীন 'আবদুর রহীম ইবন আল-হুসাইন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হি.)। এটি ألفية العراقى (আলফিয়াতুল 'ইরাকী) নামে প্রসিদ্ধ। বইটি মূলত ইবনুস সালাহর علوم الحديث ('উলূম আল-হাদীছ) গ্রন্থটির কাব্যরূপ। কিছু অতিরিক্ত বিষয়ও এতে যোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে উপকারে আসার অনেক কিছু এতে আছে। এর একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে খোদ-লেখকের আছে দু'টি।

১২. فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث (ফাতহুল মুগীছ ফী শারহি আলফিয়াতিল হাদীছ) ঃ এটি রচনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২ হি.)। এটি পূর্বে উল্লেখিত 'আলফিয়াতু আল-'ইরাকী'র ব্যাখ্যা। বলা চলে এ একটি সার্থক ব্যাখ্যা।

১৩. نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر (নুখবাতুল ফিক্‌র ফী মুসতালাহি আহ্‌লিল আছার) ঃ ইবন হাজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) এর রচয়িতা। অতি সংক্ষিপ্ত ছোট্ট একটি পুস্তিকা হলেও বেশ উপকারী। এ গ্রন্থের বিন্যাস ও শ্রেণীকরণ একেবারে অভিনব। লেখক নিজেই 'نزهة النظر' (নুজহাতুন নাজার) নামে এর একটি ব্যাখ্যাও লিখেছেন। তাছাড়া আরো অনেকে এর ব্যাখ্যা ও টীকাসহ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৪. المنظومة البيقونية (আল-মানজুমা আল-বায়কুনিয়া) ঃ এটির রচয়িতা 'উমার ইবন মুহাম্মাদ আল-বাইকুনী (মৃ. ১০৮০ হি.)। অতি সংক্ষিপ্ত একটি কবিতা, যার শ্লোক সংখ্যা ৩৪-এর বেশি হবে না। তবে এটি অতি প্রসিদ্ধ ও উপকারী, এর ব্যাখ্যায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

১৫. قواعد التحديث (কওয়া'ইদুত তাহদীছ) ঃ রচয়িতা মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল-কাসিমী (মৃ. ১৩৩২ হি.)। একটি সম্পাদিত দারুন উপকারী বই।

এছাড়া আরো বহু মূল্যবান গ্রন্থ বিভিন্ন যুগে এ শাস্ত্রের উপর লিখিত হয়েছে।[২৬৭]

তিন. 'ইলমুল জারাহি ওয়াত তা'দীল (علم الجرح والتعديل)

এ বরকতময় প্রচেষ্টার আরেকটি ফল হলো 'ইলমুল জারাহি ওয়াত তা'দীল' অথবা 'ইলমু মীযান আর-রিজাল' (علم ميزان الرجال) এর উৎপত্তি। জারাহ (جَرَحٌ) অর্থ ক্ষত করা, আহত করা, আর তা'দীল (تعديل) অর্থ সোজা করা, সুবিন্যস্ত করা ইত্যাদি। 'ইলমুল জারাহি ওয়াত তা'দীল বিদ্যার সংজ্ঞা হলো ঃ[২৬৮]

هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان.

"এ এমন বিদ্যা যাতে রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা, তাদের সততা, বিশ্বস্ততা, 'আদালত (ন্যায়পরায়ণতা), মুখস্থশক্তি, ধারণ ক্ষমতা অথবা এর বিপরীত দিক যেমন মিথ্যা বলা, অমনোযোগিতা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।'

জাল হাদীছ প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে যে সকল জ্ঞান বা শাস্ত্রের উদ্ভব হয় তার মধ্যে এ শাস্ত্রটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে এ বিদ্যার কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ শাস্ত্রের উৎপত্তির মূলে আছে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছগণের প্রবল ইচ্ছা। এ শাস্ত্রে রাবীগণের জীবন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দোষ-গুণ বের করে মূল্যায়ন করা হয় এবং সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোন্ হাদীছ সহীহ ও কোন্ হাদীছ সহীহ নয়–সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মুহাদ্দিছগণ স্ব-উদ্যোগে তাঁদের সমকালীন রাবীদের জীবন যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তেমনিভাবে

২৬৭. প্রাগুক্ত–১৫ ; আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-১০৮-১০৯

২৬৮. প্রাগুক্ত

পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অবগত হন এবং কোন রকম দ্বিধা, জড়তা ও পাপবোধ ছাড়াই তাদের সম্পর্কে ভালো-মন্দ মতামত ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীগণ যেমন ইবনুল 'আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.) 'উবাদা ইবন আস-সামিত (মৃ. ৩৪ হি.), আনাস ইবন মালিক (মৃ. ৯৩ হি.) (রা) প্রমুখের সময় থেকে রাবীগণের জীবন-বৃত্তান্তের পর্যালোচনা ও দোষ-ত্রুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদেরকে গ্রহণ বা বর্জনের রীতি চালু হয়। তাবিঈগণের মধ্যে এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রনী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (মৃ. ৯৩ হি.), আশ-শা'বী (মৃ. ১০৪ হি.) , ইবন সীরীন (মৃ. ১১০ হি.), আল-আ'মাশ (মৃ. ১৪৮ হি.) (রহ) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইমাম শু'বা (মৃ. ১৬০ হি.) রাবীগণের জীবন পর্যালোচনার ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নিলেন। তিনি 'ছিকা' তথা বিশ্বস্ত রাবী ছাড়া দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করতেন না। ইমাম আবু হানীফা (মৃ. ১৫০ হি.) ও ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯ হি.) (রহ)–তাঁরা দু'জনই রাবীগণের নিকট থেকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা রাবীগণের জীবন-চরিত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে আল-জারাহ ওয়াত তা'দীল' শাস্ত্রের সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন ইমাম হলেন ঃ মা'মার ইবন রাশীদ (মৃ. ১৫৪ হি.), হিশাম আদ-দাস্তাওয়ায়ী (মৃ.১৫৪ হি.), আল-আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭ হি.), সুফইয়ান আছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), হাম্মাদ ইবন সালামা (মৃ. ১৬৭ হি.) ও আল-লাইছ ইবন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.)। এঁদের পরে আরেকটি তাবকা বা শ্রেণীর জন্ম হয়। যেমন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.), আল-ফাযারী (মৃ. ১৮৫ হি.), ইবন 'উয়াইনা (মৃ. ১৯৮ হি.) এবং ওয়াকী' ইবন আল-জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.)। এ তাবকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হলেন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮ হি.) ও 'আবদুর রহমান ইবন মাহদী (মৃ. ১৯৮ হি.)। তাঁরা উভয়ে ছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট অতি বিশ্বাসভাজন ও হুজ্জাত বা দলীল-প্রমাণ বিশেষ। তাঁরা যাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে মত দিতেন তাঁর বর্ণনা গৃহীত হত, আর যাঁর দোষ-ত্রুটির কথা বলতেন তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা হতো না।[২৬৯]

২৬৯. প্রাগুক্ত–১১০

এরপরে সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরেকটি তাবকার অভ্যুদয় ঘটলো। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন ঃ ইয়াযীদ ইবন হারূন (মৃ. ২০৬ হি.), আবু দাঊদ আত-তায়ালীসী (মৃ. ২০৪ হি.), 'আবদুর রায্যাক ইবন হিশাম (মৃ. ২১১ হি.) ও আবু 'আসিম আন-নাবীল আদ-দাহ্হাক ইবন মাখলাদ (মৃ. ২১২ হি.)।

অতঃপর এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এই তাবকার মধ্যে যাঁরা গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা হলেন ঃ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (মৃ. ২৩৩ হি.), 'আলী আল-মাদীনী (মৃ. ২৩৪ হি.), 'আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), আল-ওয়াকিদীর কাতিব মুহাম্মাদ ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.)। ইবন সা'দ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'আত-তাবাকাত আল-কুবরা'। পনের খণ্ডের এ বিশাল গ্রন্থটি এ বিষয়ের সর্ববৃহৎ কর্মকাণ্ড। ইমাম আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) এটিকে সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছেন 'ইনজাযুল ও'য়াদ আল-মুনতাকা মিন তাবাকাত 'ইবন সা'দ। এঁদেরকে অনুসরণ করে এ শাস্ত্র বিষয়ে লেখালেখিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন ঃ ইমাম আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) ; তিন খণ্ডে রচিত তাঁর 'আত-তারীখ' গ্রন্থখানি এ বিষয়ের একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খণ্ড তিনটির নাম ঃ

১. আত-তারীখ আল-কাবীর, ২. আত-তারীখ আল-আওসাত, ৩. আত-তারীখ আস-সাগীর। এছাড়া এ বিষয়ে তাঁর 'কিতাব আদ-দু'আফা' আল-কাবীর' নামে আরো একটি গ্রন্থ আছে। ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), ইমাম আবু দাঊদ (মৃ. ২৭৫ হি.), ইমাম আন-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.), ইবন হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হি.), দারাকুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), আবু হাতিম আর-রাযী (মৃ. ৩২৭ হি.), ইবনে 'আদী (মৃ. ৩৬৫ হি.), আবু যুর'আ, ইবন হাজার (মৃ. ৮৫২ হি.) ও ইমাম আস-সূয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর ঊনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত একটি তাবকার পর আরেকটি তাবকার আলিমগণ রাবীদের বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজ চালিয়ে গেছেন। সুতরাং হাদীছের গ্রন্থাবলীতে আসা রাবীদের নামের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস ও তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এসব গ্রন্থাবলীতে খুঁজে পাওয়া এখন আর কারো জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।[২৭০]

রাবীগণের আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও দোষ-ত্রুটি (আল-জারাহ ওয়াত তা'দীল) বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থসমূহ আবার বিভিন্ন প্রকারের। যেমন ঃ

---

২৭০. ড. সুবহী আস-সালিহ, 'উলূম আল-হাদীছ-১০৮-১০৯ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১১০-১১১

১. শুধুমাত্র 'ছিকা' তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণের জীবন আলোচিত হয়েছে। যেমন ইবন হিব্বান আল-বুসতীর 'কিতাব আছ-ছিকাত', চারখণ্ডে রচিত ইবন কাতলূবাগা (মৃ. ৮৮১ হি.)-এর 'কিতাব আছ-ছিকাত' এবং খালীল ইবন শাহীন (মৃ. ৮৭৩ হি.)-এর 'কিতাব আছ-ছিকাত'।

২. শুধুমাত্র দা'ঈফ তথা দুর্বল রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ। এ বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। তারমধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন লেখক হলেন ঃ ইমাম আল-বুখারী, ইমাম আন-নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারাকুতনী, আল-'উকাইলী, ইবনুল জাওযী ও ইবন 'আদী (রহ)। শেষোক্ত জনের 'আল-কামিল ফী আদ-দু'আফা' (الكامل فى الضعفاء) গ্রন্থটি এ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। এতে তিনি এমন রাবীগণের আলোচনাও সন্নিবেশিত করেছেন যাঁদের সম্পর্কে কিছু না কিছু সমালোচনা হয়েছে–তা তাঁরা হোন না কেন সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের রাবী। এমনকি সর্বজন মান্য ইমামগণের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করা হয়েছে তাও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করতে ভুলেননি। কারণ এ সকল ইমামগণের অনেকের জীবদ্দশায় তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদের অনেক সমালোচনা করেছেন। ইবন 'আদীর এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ইমাম আয-যাহাবী (রহ) রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মীযান আল-ই'তিদাল' গ্রন্থটি।

৩. উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর অর্থাৎ ছিকা ও দা'ঈফ রাবীগণের জীবনী স্থান পেয়েছে এমনসব গ্রন্থে। এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো ঃ ইমাম আল-বুখারীর তিনখানা তারীখ গ্রন্থ ঃ আল-কাবীর, আল-আওসাত ও আস-সাগীর। প্রথমটি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে এবং পরবর্তী দু'টি সন ভিত্তিক সাজানো হয়েছে। ইবন হিব্বানের 'কিতাবুল জারাহি ওয়াত তা'দীল', ইবন আবী হাতিমের 'আল-হারাহ ওয়াত তা'দীল', ইবন সা'দের 'আত-তাবাকাত আল-কুবরা' এবং হাফিজ ইবন কাছীরের 'আত-তাকমীল ফী মা'রিফাতিছ ছিকাত ওয়াদ দু'আফা' ওয়াল মাজাহীল'। কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সহকারে ইবন কাছীর তাঁর এ গ্রন্থে আল-মিয্যি (المزّى)-এর 'আত-তাহ্যীব' ও আয-যাহাবীর 'মীযান আল-ই'তিদাল' গ্রন্থ দুটিও সন্নিবেশ করেছেন। এ গ্রন্থটি একজন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্র জন্য খুবই সহায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৭১]

২৭১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১১১ ; তাওজীহ আন-নাজার-১১৮

এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ইমামগণ রাবীগণের সমালোচনার নীতি ও মানদণ্ডের ক্ষেত্রে একই রকম মান ও স্তরের ছিলেন না। অনেকে ছিলেন চরমপন্থী, অনেকে ছিলেন একেবারেই উদারপন্থী, আবার অনেকে ছিলেন মধ্যপন্থী। চরমপন্থীদের মধ্যে ছিলেন ঃ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, আবু হাতিম আর-রাযী প্রমুখ। ইমাম আত-তিরমিযী, আল-হাকিম, ইবন মাহদী–এঁরা ছিলেন উদারপন্থী। আর মধ্যপন্থীরা হলেন ইমাম আহমাদ, ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)। এ কারণে কোন কোন রাবী সম্পর্কে এ সকল ইমামদের মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ একজনকে 'ছিকা' (বিশ্বস্ত) বলেছেন, আরেকজন তাঁকে দা'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের নির্ধারিত মানদণ্ড ও পর্যবেক্ষণের পার্থক্যের কারণে এমন হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে একই রাবী সম্পর্কে একজনের দু'রকমের মত লক্ষ্য করা যায়। আজ হয়তো যাঁকে 'ছিকা' বলেছেন, পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে এমন কিছু দেখেছেন যাতে তিনি তাঁর পূর্বের মত থেকে সরে এসেছেন। ঠিক এমনিভাবে এর বিপরীতটাও অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ফকীহদের ইজতিহাদের বিরোধিতা করে দ্বিমত পোষণ করাও 'জারাহ ও তা'দীলের' ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের একটি অন্যতম কারণ। আমরা জানি সেই প্রাচীনকাল থেকে আহ্‌লুল হাদীছ (হাদীছ বিশারদ) ও আহ্‌লুর রায় (যুক্তি ও কিয়াস পন্থী)-এর বিরোধ ও বিতর্ক চলে আসছে। এরই ফলে কোন কোন হাদীছ বিশারদ কোন কোন ফিকহের ইমামকে এমন কঠোরভাবে অভিযুক্ত করেছেন যে, তাতে তাঁরা দা'ঈফ রাবীতে পরিণত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফার (র) নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি একজন খুব বড় মাপের ইমাম। যুহ্‌দ, তাকওয়া, আমানতদারী ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বহু মুহাদ্দিছ তাঁর প্রতি নানা অভিযোগ আরোপ করেছেন এবং জারাহ ও তা'দীলের ইমামগণ তাঁকে একজন অভিযুক্ত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আহলি হাদীছের ঝোঁক ও প্রবণতার সাথে ইমাম আবু হানীফার (রহ) ইজতিহাদী প্রবণতার বে-মিল হওয়া ছাড়া আর কোন কারণ এর পেছনে নেই। আবু বাকর আল-খাতীব তাঁর তারীখু বাগদাদ' গ্রন্থে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ইমাম আবু হানীফার (রহ) ফিকহের রীতি-পদ্ধতির সূক্ষ্মতা অনেক মুহাদ্দিছ, এমনকি হাদীছের ইমামগণ বুঝতে সক্ষম হননি। এ কারণে সাধারণভাবে তারা একান্তভাবে ইমাম আবু হানীফাকে একজন অভিযুক্ত দুর্বল রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ ইতিহাস তাঁদের এ দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।।

সমালোচকদের এই প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোরতা ও উদারতার পার্থক্যের কারণে শেষের দিকে অধিকাংশ 'আলিম এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা না থাকলে কারো কোন সমালোচনা ও অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। তাতে সমালোচকদের অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক সমালোচনার হাত থেকে রাবীগণ রক্ষা পাবেন। হাফিজ ইবন কাছির (রহ) বলেন ঃ[২৭২]

بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا لاختلاف الناس فى الاسباب المفسقة فقد يعتمد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذالك فى نفس الأمر أو عندغيره، فلذا اشترط بيان السبب فى الجرح.

"দোষ-ক্রটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা না থাকলে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ যে যে কারণে একজন মানুষ ফাসিক হয়, সে ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। একজন সমালোচক কোন কিছুকে ফাসিকী কাজ বলে মনে করেন এবং তার ভিত্তিতে কাউকে দা'ঈফ ঘোষণা করেন। আসলে বিষয়টি কিন্তু তেমন নয় অথবা অন্যের নিকট সেটি তেমন কোন ফাসিকী কাজ নয়। এজন্য অভিযোগের কারণ বর্ণনার শর্ত করা হয়েছে।"

চার. 'উলূম আল-হাদীছ (علوم الحديث)

আমাদের পূর্ববর্তীকালের মুহাদ্দিছগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার চতুর্থ ফসল হলো 'উলূম আল-হাদীছ। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সুন্নাহের পঠন-পাঠন, বর্ণনা, সুন্নাহ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ, সুন্নাহর মূলনীতি ও উৎসসমূহের অনুসন্ধান, সার্বিকভাবে এর বিশুদ্ধতা নিরূপণ ইত্যাদি এর প্রতিপাদ্য বিষয়। 'উলূম আল-হাদীছকে 'উসূল আল-হাদীছ'ও বলা হয়। এক কথায় হাদীছের মুলনীতি শাস্ত্র জ্ঞানকে উসূল আল-হাদীছ বলা হয়। শায়খ ইয্‌যুদ্দীন (রহ) বলেন ঃ[২৭৩]

علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن.

"এ এমন কিছু নিয়ম-কানুনের জ্ঞান যার মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।" এ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সনদ ও মতন

---

২৭২. ইখতিসারু 'উলূম আল-হাদীছ–১০১

২৭৩. তাদরীব আর-রাবী–১/৪১

এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো গায়র সহীহ হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছকে পৃথক করা। ইবন হাজার (রহ) বলেন, এর সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো ঃ[২৭৪]

معرفة القواعد المعرفة بحال الراوى والمروى.

"বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীছের অবস্থা অবগত হওয়া যায়, এমন কিছু নিয়ম-কানুন জানাকে বলে 'ইল্‌ম আল-হাদীছ।" ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ) তাঁর মা'রিফাতু 'উলূম আল-হাদীছ' গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বায়ান্ন এবং ইমাম আন-নাওয়াবী (রহ) তাঁর 'আত-তাকবীর' গ্রন্থে পঁয়ষট্টি প্রকার জ্ঞানের আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হলো ঃ

১. মুহাদ্দিছ-এর সত্যবাদিতা, দৃঢ়তা, ধারণ ক্ষমতা, তাঁর মূলনীতির শুদ্ধতা, তাঁর বয়স, ভ্রমণ, তাঁর অমনোযোগিতা, উদাসীনতা, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জানা।

এ সম্পর্কে আল-হাকিম (রহ) বলেন, আমাদের এ কালের হাদীছ শিক্ষার্থীদের যেসব বিষয় একান্ত প্রয়োজন, তার প্রথমটি হলো মুহাদ্দিছ-এর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানা। তিনি কি শরী'আত বর্ণিত তাওহীদে বিশ্বাসী? নবী ও রাসূলগণের প্রতি যেসব ওহী নাযিল হয়েছে এবং তাঁরা যে শরীআত দান করেছেন তিনি নিজে কি তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেন? তারপর তাঁর বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন তিনি কি কোন প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান জানান? কারণ কোন বিদ'আতপন্থী তাঁর বিদ'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানালে তাঁর থেকে কোন হাদীছ লেখা যাবে না এবং তাঁর প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শনও করা যাবে না। তাঁদেরকে বর্জন করার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের ইজমা' হয়েছে। তারপর তাঁকে জানতে হবে মুহাদ্দিছের বয়স সম্পর্কে। তিনি যে শায়খের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করছেন সত্যিই যে তাঁর মুখ থেকে শুনেছেন তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কারণ এমন অনেক শায়খ আছেন যাঁদের, বয়স হিসেব করে জানা যায়, উর্ধ্বতন যে শায়খের সূত্রে বর্ণনা করছেন তাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তারপর দৃষ্টি দিতে হবে তাঁর বর্ণনার মূলনীতির প্রতি। তা কি পুরনো না নুতন? আমাদের এ যুগে এমন একদলের উদ্ভব হয়েছে যারা বাজার থেকে বই কিনে তা দেখে বর্ণনা করে বেড়ায়, আরেক দল আছে যারা তাদের শোনা বর্ণনাসমূহ নিজেদের হাতে গ্রন্থে লিখে রাখে এবং তা থেকে বর্ণনা করে। তাদের মুখ থেকে যারা শোনে, তারা যদি বিষয় বিশেষজ্ঞ না হয় তাহলে তো ক্ষমারযোগ্য। কিন্তু যদি বিষয় বিশেষজ্ঞ হয় তাহলে তাদের

২৭৪. প্রাগুক্ত

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরেও এমন লোকদের বর্ণনা শোনা ও গ্রহণ করা তাদের জন্য দোষ বলে বিবেচিত হবে। তারা তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না। আর যারা জাহিল তাদেরও এ বিষয়ে যারা জানে তাদের নিকট প্রশ্ন করে জেনে নেয়া উচিত ছিল। এমনই করেছেন আমাদের পূর্বসূরী ন্যায়নিষ্ঠ ইমামগণ।[২৭৫]

২. হাদীছের সনদ সম্পর্কে জানা

সনদবিহীন হাদীছের হুজ্জাত হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ইমামদের মতপার্থক্যের কারণে এ একটি বড় ধরনের জ্ঞান বলে বিবেচনা করা হয। মুসনাদ (সনদযুক্ত) হলো সেই হাদীছ, যে হাদীছ মুহাদ্দিছ তাঁর শায়খের সূত্রে এমনভাবে বর্ণনা করবেন যে, শ্রোতা তা শুনে বুঝতে পারবে যে, তিনি তাঁর শায়খের মুখ থেকে সত্যিই শুনেছেন। এভাবে শায়খ তাঁর উর্ধ্বতন শায়খ থেকে উপরের দিকে কোন সাহাবী পর্যন্ত এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সনদ-সূত্র পৌছিয়ে দেবেন।

৩. মাওকূফ হাদীছ সম্পর্কে জানা

এর দৃষ্টান্ত হলো আল-হাকিমের এই বর্ণনাটি। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ তাঁদের আঙ্গুলের নখ দ্বারা তাঁর দরজায় টোকা দিতেন।" আল-হাকিম বলেন, এ হাদীছের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রসঙ্গ থাকায় যাঁরা এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন তাঁরা এটাকে একটি মুসনাদ হাদীছ বলে মনে করবেন। অথচ এটা তা নয়। এ একটি মাওকূফ হাদীছ যা তিনি তাঁর সমকালীন সাহাবীদের একটি কাজকে বর্ণনা করেছেন, যাঁদের একজনও তাঁর সনদে নেই।

৪. স্তর অনুযায়ী সাহাবীগণের পরিচয় জানা

আল-হাকিমের বর্ণনা অনুযায়ী এঁদের বারোটি স্তর। প্রথমটি হলো যাঁরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বশেষটি হলো সেই সকল শিশু-কিশোর যাঁরা মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভ করেছেন এবং তাঁদেরকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

৫. ঐসব মুরসাল হাদীছ সম্পর্কে জানা যেগুলোর দলীল হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে

হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানের এ একটি অত্যন্ত জটিল শাখা। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরাই এ ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা লাভ করতে পারেন।

---

২৭৫. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১১৩-১১৪

৬. মুনকাতা‘ হাদীছের পরিচয় জানা

এটি মুরসাল ছাড়া অন্য এক প্রকারের হাদীছ। হাদীছের হাফিযদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায় যাঁরা এ দু'প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। এই মুনকাতা‘ আবার তিন প্রকার ঃ

ক. সনদের মধ্যে এমন দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি থাকবেন যাদের নাম-পরিচয় কিছুই বলা হয়নি।

খ. সনদের মধ্যে একজন নাম-পরিচয়হীন ব্যক্তি থাকা। তবে ভিন্ন সূত্রে তাঁর পরিচয় জানা যাবে।

গ. তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে সনদের মধ্যে এমন একজন রাবী থাকবেন, তাঁর থেকে কে বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না। এ প্রকারকে মুরসাল বলা হয় না, বরং বলা হয় মুনকাতা‘।[২৭৬]

৭. মুসালসাল সনদের পরিচয় জানা

এ হচ্ছে প্রকাশ্য শ্রুতির একটি প্রকার যাতে গোপনীয়তার কিছু নেই। এটি আবার কয়েক প্রকার। কখনো এই مسلسل বা ধারাবাহিকতা হয় একটি নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা। সনদের অন্তর্গত প্রত্যেক রাবী হাদীছ বর্ণনার সময় কোন একটি বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করবেন। যেমন সকলে বলবেন ঃ "حَدَّثَنَا" অথবা "سمعته يقول" অথবা বলবেন ঃ "شهدت على فلان أنه قال"। আবার কখনো এই تسلسل বা ধারাবাহিকতা হয় কোন একটি বিশেষ কর্মের দ্বারা। প্রত্যেক শায়খ তাঁর ছাত্রের সাথে সেই কাজটি করে থাকেন। যেমন ঃ الحديث المسلسل بالمصافحة। অর্থাৎ প্রত্যেক শায়খ তাঁর ছাত্রের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দনের হাদীছটি।

৮. মু‘আন‘আনা (المعنعنة) হাদীছের পরিচয় জানা

সনদের রাবীগণ عَنْ ـ عَنْ করে যে হাদীছ বর্ণনা করেন তা "الحديث المعنعنة।" হিসেবে পরিচিত। যেমন ইবন মাজাহ্'র একটি হাদীছ ঃ[২৭৭]

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان

عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عائشة (رض)

---

২৭৬. প্রাগুক্ত-১১৫

২৭৭. ইবন মা-জাহ্-১/৩২১ (১০০৫)

قـالـت : قـال رسـول الله صلى الله عليـه وسلم : ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ـ

এই সনদে সুফইয়ান থেকে 'আয়িশা (রা) পর্যন্ত عـن ـ عـن -করে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু শর্তসাপেক্ষে এ ধরনের সনদকে হাদীছ বিশারদগণ মুত্তাসিল বা ধারাবাহিক সনদ বলে গণ্য করেছেন। আল-হাকিম জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত এ ধরনের একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এই হাদীছটি মিসর, মদীনা ও মক্কাবাসীগণ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কারোরই সনদের অন্তর্গত রাবীদের সম্পর্কে 'তাদলীস' বা কোন কিছু গোপন করার অভ্যাস নেই।[২৭৮]

৯. মু'দাল বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে জানা

সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়লে সেই সনদকে মু'দাল বলে। এটি মুরসাল সনদ থেকে ভিন্ন।

১০. মুদরাজ সম্পর্কে জানা

প্রথমত মুদরাজ দু'প্রকার ঃ মুদরাজ আল-ইসনাদ ও মুদরাজ আল-মতন। এর প্রত্যেকটি আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। মুদরাজ আল-মতন হলো ঃ মতনের মধ্যে এমন কিছু সংযোজন করা যা তার অংশ নয়। এ সংযোজনের কাজটি হয় কখনো শুরুতে কখনো মাঝখানে আবার কখনো শেষপ্রান্তে। এটি সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহর (সা) কথার সাথে রাবী বা অন্য কারো কথা যোগ করার ফলে। এই ইদরাজ বা সংযোজন ধরা যায় ঃ ১. ভিন্ন সনদে মুদরাজ অংশটি পৃথক করে বর্ণিত হলে, ২. রাবী নিজে সেটি বলে দিলে, ৩. কোন হাদীছ বিশারদ তা সনাক্ত করলে এবং ৪. রাসূলের (সা) পক্ষে সেরূপ কথা বলা অসম্ভব বলে মনে হলে। মুদরাজ হাদীছের একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নের এই হাদীছটি ঃ[২৭৯]

عن عبد الله مسعود (رض) أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد فى الصلاة وقال : "قل التحيات لله والصلوات" فذكر التشهد، وقال : فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.

---

২৭৮. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-১১৫

২৭৯. শারহু নুখবাতিল ফিক্র-৯২-৯৩

"আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাঁর হাত ধরেন এবং নামাযের ভিতরের তাশাহ্হুদ তাঁকে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন ঃ "বল, আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ...।" 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ 'আত-তাশাহ্হুদ' উল্লেখ করার পর বলেন, যখন তুমি এটা পাঠ করবে তখন তোমার নামায শেষ হবে। তুমি ইচ্ছা করলে উঠে যেতে পার, ইচ্ছা করলে বসেও থাকতে পার।"

আল-হাকিম বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শেষাংশ– فإذا قلت هذا فقد قضيت فاقعد. ...– মুদরাজ। কারণ তা রাসূলুল্লাহর (সা) নয়, বরং আদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) কথা। আরেকটি সনদে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে রাবী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন এভাবে ঃ

قال عبد اللّٰه بن مسعود : واذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك ... الخ.

১১. তাবি'ঈগণের পরিচয় জানা

এটা জ্ঞানের এমন এক শাখা যার সাথে বহু জ্ঞান বিজড়িত। ক্রমানুসারে তাঁদেরকে বহু স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকলে সে যেমন সাহাবা ও তাবিঈনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না, তেমনিভাবে পার্থক্য করতে পারবে না তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈনের মধ্যেও। আল-হাকিম তাদের পনেরোটি (১৫) তাবকার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো সেই সকল তাবি'ঈ যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। যেমন ঃ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কায়স ইবন আবী হাযিম (রহ) প্রমুখ। তাঁদের সর্বশেষ তাবকাটি হলো ঃ বসরাবাসীদের মধ্যে যাঁরা আনাস ইবন মালিকের (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন' ; কুফাবাসীদের মধ্যে যাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফার (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন ; মদীনাবাসীদের মধ্যে যাঁরা আস-সায়িব ইবন ইয়াযীদের (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন ; মিসরবাসীদের মধ্যে যাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ ইবন জাযআর (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং শামবাসীদের মধ্যে যাঁরা আবু উমামা আল-বাহিলীর (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

১২. সাহাবায়ে কিরামের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে জানা

এ বিষয়ে কারো জ্ঞান না থাকলে বহু বর্ণনা তাঁর কাছে সংশয়যুক্ত হয়ে যাবে। প্রথমে জানতে হবে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সন্তানদের সম্পর্কে এবং তাঁদের মধ্যে কে কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাও জানতে হবে। এভাবে জানতে হবে বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সন্তানদের সম্পর্কে; অতঃপর ক্রমানুসারে তাবি'ঈন, তাবি'-তাবি'ঈন ও মুসলিমদের ইমামগণের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে। হাদীছ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান।

১৩. 'ইল্‌ম আল-জারাহ্ ওয়াত তা'দীল সম্পর্কে জানা

মুলত এ জ্ঞান দু'প্রকার ঃ আল-জারাহ্ বিষয়ক ও আত-তা'দীল বিষয়ক। এর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। কোন রাবী সম্পর্কে জানতে হবে যে ; তিনি 'আদিল (ন্যায়পরায়ণ), অভিযুক্ত না অপরিচিত? কেননা যে কোন রাবী সম্পর্কে হয়তো তার 'আদিল হওয়ার কথা জানা যাবে, নয়তো ফাসিক হওয়ার কথা অথবা কোনটাই জানা যাবে না। এটা জানা না গেলে হাদীছটি সহীহ কিনা তা নির্ণয় করাও যাবে না। জারাহ ও তা'দীলের আবার অনেকগুলো স্তর আছে।[২৮০] একজন মুহাদ্দিছের এসব কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল-হাকিম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৪. সহীহ ও গায়র সহীহ হাদীছ সম্পর্কে জানা

জারাহ ও তা'দীলের বাইরে এ একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে আসা সনদ ছাড়া অন্য খুব কম সনদই ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যায়। আল-হাকিম বলেন ঃ [২৮১]

إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة فى كتابى الإمامين البخارى ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذا كرة أهل المعرفة لتظهر عليه.

---

২৮০. প্রাগুক্ত-১৬৮-১৭০

২৮১. আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা-১১৭

"কেবল রিওয়ায়াতের (বর্ণনা) দ্বারা সহীহ্ হাদীছ চেনা যায় না। বরং বুঝা, মুখস্থ করা এবং বেশি বেশি শোনার মাধ্যমে চেনা যায়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়নি, কিন্তু সহীহ্ সনদে বর্ণিত– এমন কোন হাদীছ চেনার সহায়ক কোন বিদ্যা নেই। তবে হাদীছ বিশেষজ্ঞের সেই সব হাদীছের 'ইল্লাত তথা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা যাতে সেগুলো তা প্রকাশ পায়, একান্ত প্রয়োজন।"

১৫. ফিকহুল হাদীছ (فقه الحديث) বিষয়ে জানা

হাদীছের অর্থ, শিক্ষনীয় বিষয় এবং তা থেকে বের হওয়া বিধি-বিধান সম্পর্কে জানাই হলো ফিক্হুল হাদীছ। মূলত এর উপরেই শরীআতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সকল মুহাদ্দিছের মধ্যে কিন্তু ফিকহুল হাদীছের প্রতিভা ছিল না। তবে তাঁদের অনেকে এ জ্ঞানে এত পারদর্শী ছিলেন যে, মুসলিম উম্মাহ্ তাঁদেরকে ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। যেমন ঃ ইবন শিহাব আয-যুহরী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওযা'ঈ, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা, আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) ও আরো অনেকে।

১৬. নাসিখ ও মানসূখ হাদীছ সম্পর্কে জানা

নাসিখ অর্থ রহিতকারী এবং মানসূখ অর্থ রহিত। শব্দ দু'টির মূল 'নাসখুন' (نَسْخٌ), যার অর্থ দূর করা, কপি করা। মুহাদ্দিছগণ এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.

"বিধানদাতার দেয়া পূর্ববর্তী একটি হুকুমকে তাঁরই দেয়া পরবর্তী একটি হুকুম দ্বারা উঠিয়ে নেয়াকে বলে 'নাসখ'। সুতরাং পূর্ববর্তী হুকুম হলো 'মানসুখ' ও পরবর্তী হুকুম হলো 'নাসিখ'। হাদীছ বিষয়ক জ্ঞানের এ এক কঠিন শাখা। ইমাম আয-যুহ্‌রী (রহ) বলেন ঃ[২৮২]

"أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه"

"নাসিখ ও মানসুখ হাদীছ সম্পর্কে জানার চেষ্টা ফকীহগণকে অক্ষম ও অপারগ করে দিয়েছে।"

২৮২. তায়সীরু মুসতালাহ আল-হাদীছ–৫৯

জ্ঞানের এ ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান হলেন ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ)। এ শাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশাল পাণ্ডিত্য ও অগ্রগামিতা। ইবন ওয়ারা একবার মিশর থেকে ফিরে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি ইবন ওয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আশ-শাফি'ঈর গ্রন্থগুলো লিখে এনেছো? বললেন ঃ না। ইমাম আহমাদ বললেন ঃ তুমি দারুণ অবহেলা করেছো। আমরা আশ-শাফি'ঈর সাথে না বসা পর্যন্ত মুজমাল, মুফাস্‌সাল ও নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে জানতে পারিনি।[২৮৩]

নাসিখ ও মানসুখ জানা যায় কয়েকটি উপায়ে। যেমন ঃ

ক. রাসূলের (সা) কথা ও কাজের মাধ্যমে। রাসূল (সা) স্পষ্ট করে বলে দেবেন যে, পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করা হলো এবং এখন এই করতে হবে। অথবা তিনি পূর্বে একটি কাজ করেছেন, পরবর্তীতে তার বিপরীত কোন কাজ করেছেন। তখন পূর্ববর্তী কাজটি মানসুখ বলে ধরে নিতে হবে।

খ. সাহাবীর কথার দ্বারা।

গ. ইতিহাস জ্ঞানের দ্বারা। রাসূল (সা) কোন কাজটি আগে করেছেন, কোনটি পেছনে করেছেন তাতো ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যাবে। তেমনিভাবে একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) একটি সুন্নাহ বর্ণনা করলেন, ঠিক তার বিপরীত আরেকটি সুন্নাহ বর্ণনা করলেন আরেকজন সাহাবী। তখন ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন্ বর্ণনাটি আগের এবং কোন্‌টি পেছনের।

ঘ. ইজমা'র মাধ্যমে।

এ শাস্ত্রের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ

ক. আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-হাযিমী ঃ আল-ই'তিবার ফী আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ।

খ. ইমাম আহমাদ ঃ আন-নাসিখ ওয়াল মানুসূখ।

গ. ইবন আল-জাওযী ঃ তাজরীদ আল-আহাদীছ আল-মানসূখা।

১৭. রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণিত মাশহূর হাদীছ সম্পর্কে জানা

মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় যে হাদীছ প্রত্যেক স্তরে তিনজন বা তার অধিক রাবী

২৮৩. প্রাগুক্ত

বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রাবীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে উপনীত হয়নি, সেই হাদীছকে বলে 'মাশহূর'। রাবীর সংখ্যা কম হলেও হাদীছটি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় একে 'মাশহূর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উসূলবিদগণ মাশহূরকে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ-এর মাঝামাঝি পৃথক এক প্রকার হাদীছ হিসেবে গণ্য করেছেন। আল-হাকিম বলেন, মাশহূর হাদীছ সহীহ হাদীছের বাইরে এক প্রকার হাদীছ। অনেক মাশহূর হাদীছ সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়নি।[২৮৪]

১৮. গারীব হাদীছ সম্পর্কে জানা

যে হাদীছের সনদে কোন এক স্তরে মাত্র একজন রাবী আছেন, সেই হাদীছকে বলে গারীব হাদীছ। তবে কোন কোন স্তরে একাধিক রাবী থাকতে পারে। কোন হাদীছের মূল সনদে অর্থাৎ সাহাবীগণের স্তরে রাবী একজন হলে তাকে বলে গারীবে মুতলাক বা ফারদে মুতলাক, আর মধ্য সনদে অর্থাৎ সাহাবীগণের পরে কোন এক স্তরে রাবী একজন হলে তাকে বলে গারীবে নিসবী। মুহাদ্দিছগণ গারীব হাদীছের আরো অনেকগুলো প্রকার উল্লেখ করেছেন। এর এক প্রকার হলো غرائب الصحيح অর্থাৎ সহীহ হাদীছের অন্তর্গত গারীব হাদীছসমূহ।[২৮৫]

১৯. আফরাদ (الأفراد) হাদীছ সম্পর্কে জানা

প্রথমত এই 'আফরাদ হাদীছ' দু'প্রকার : 'ফারদে মুতলাক' ও 'ফারদে নিসবী'। 'ফারদে মুতলাক' হলো, একটি হাদীসের গোটা সনদে সর্বস্তরে যদি একজন করে রাবী থাকেন। আর 'ফারদে নিসবী' হলো সেই হাদীছ যার গোটা সনদে একজন করে রাবী, কিন্তু তাঁরা সকলে বিশেষ কোন স্থানের অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। মুহাদ্দিছগণ এই 'ফারদে নিসবী' হাদীছকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করা হলো :

১. একজন সাহাবী থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীছের সনদের সর্বস্তরে একজন করে রাবী, তবে তাঁরা সকলে একই শহরের। যেমন আবূ দাঊদ বর্ণিত এই হাদীছটি :

---

২৮৪. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা–১১৭

২৮৫. শারহু নুখবাতুল ফিক্‌র–২৯

عن أبى الوليد الطيالسى عن همام عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد رض قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.

"আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন : আমাদেরকে সূরা আল-ফাতিহা ও সেই সাথে আরো কিছু পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" লক্ষণীয় যে, উল্লেখিত হাদীছটির সনদে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন করে রাবী এবং তাঁরা সকলে একই শহর-বসরার অধিবাসী। এমনিভাবে কোন কোন হাদীছের বর্ণনাকারীর সকলে মক্কা, মদীনা, কূফা অথবা মিসর ইত্যাদি যে কোন একক স্থানের হতে পারেন। যেমন, হযতর আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

صلى النبى صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه فى المسجد.

"নবী (সা) সুহাইল ইবন বাইদা' ও তাঁর ভাইয়ের জানাযার নামায মসজিদে পড়েন।" এই হাদীছের সনদের প্রতিটি স্তরে একজন করে রাবী এবং তাঁরা সকলে মদীনার অধিবাসী।

২. একজন ব্যক্তি বিশেষ থেকে একজন রাবী কোন হাদীছ বর্ণনা করবেন। যেমন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.

"নবী (সা) ছাফীয়্যার সাথে শাদীর পর সাবীক ও খেজুর দিয়ে ওয়ালীমার ভোজ দেন।" হাদীছটির বর্ণনা সূত্রের একজন ওয়ায়িল, তিনি একাই তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে শুধু সুফইয়ান ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

৩. একটি হাদীছের সনদের সকল স্তরের রাবী বিশেষ কোন শহরের, কিন্তু তাঁদের থেকে অন্য কোন শহরের একজন রাবীর সেই হাদীছটি বর্ণনা করা।

৪. একক সনদের রাবীদের মধ্যে একটি স্তরের একজনমাত্র রাবী 'ছিকা' (বিশ্বস্ত), আর অন্যরা সকলে গায়র 'ছিকা' (অবিশ্বস্ত)।

ইমাম দারাকুতনী (রহ) এ সকল বিষয়ের উপর একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া আত-তাবারানীর المعاجم। (আল-মা'আজিম) গ্রন্থেও এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৮৬]

২৮৬. তাদরীব আর-রাবী–১/২৪৮-২৫০

২০. মুদাল্লিস রাবীগণের পরিচয় জানা

'মুদাল্লিস' শব্দটি 'দালাস (دلس) মূল থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ গোপন করা, অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যিনি কোন কিছু গোপন করে একটা অস্পষ্টতা ও অন্ধকারের সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন 'মুদাল্লিস' রাবী। সনদ থেকে রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি অনেক সময় স্পষ্ট থাকে, যে কেউ তা জানতে ও বুঝতে পারে। রাবী যখন তার উর্ধ্বতন রাবীর সমসাময়িক না হয় তখন এরূপ হয়ে থাকে। আবার কখনো হয় সূক্ষ্ম। হাদীছের সনদসমূহ ও সনদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইমামগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে তা বুঝা অসম্ভব। এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেখানে রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি হয় সূক্ষ্ম সেই হাদীছের নাম 'মুদাল্লাস' এবং 'যিনি এই বাদ বা গোপন করার কাজটি করেন তিনি হলেন 'মুদাল্লিস'। এই প্রকার হাদীছের রাবী যার কাছ থেকে হাদীছটি শুনেছেন তার নাম উল্লেখ না করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন যাতে হাদীছটি এমন ব্যক্তি থেকে শুনেছেন বলে মনে হয় যিনি তার কাছে সেটি বর্ণনা করেননি। ইমাম আস-সূয়ূতী (রহ) এই 'তাদলীস তথা গোপন করা বা বাদ দেয়া কাজটিকে প্রথম তিন প্রকার এবং তা থেকে আরো অনেকগুলো প্রকারের উল্লেখ করেছেন।[২৮৭] আল-হাকিম (রহ) উদাহরণসহ ছয় প্রকার তাদলীসের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, হিজায, হারামাইন তথা মক্কা-মদীনা, মিসর, খুরাসান, আল-জিবাল (পার্বত্য অঞ্চল), ইস্‌ফাহান, পারশ্যের বিভিন্ন অঞ্চল, খুজিস্তান এবং মা ওয়ারায়ান নাহর-এর অধিবাসী কোন রাবী 'তাদলীস' করেছেন বলে আমরা জানিনা। সবচেয়ে বেশি তাদলীস' করেছেন কূফার মুহাদ্দিছগণ। বসরার মুষ্টিমেয় কিছু লোক এ কাজ করেছেন। আর বাগদাদবাসীদের মধ্যে একমাত্র আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আল-বাগান্দী আল-ওয়াসিতী ছাড়া আর কেউ 'তাদলীস' করেছেন বলে কেউ উল্লেখ করেননি। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম বাগদাদে 'তাদলীসের' প্রচলন করেন। তারপর কেউ কেউ তাঁকে অনুসরণ করেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদী এই মুদাল্লিস রাবীগণের নাম সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ইবন 'আসাকিরও এ বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৮৮]

২১. হাদীছের 'ইল্লাত'সমূহ সম্পর্কে জানা

'ইল্লাত (العلة) হলো এমন দুর্বোধ্য গোপন কারণ যা হাদীছের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে। একটি হাদীছ দৃশ্যত: সহীহ, কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন লুক্কায়িত

২৮৭. প্রাগুক্ত–১/২২৩-২৩২; শারহু নুখবাতুল ফিক্‌র–৭৮-৮০

২৮৮. তাদরীব আর-রাবী–১/২৩২

কারণ পাওয়া গেছে যা তার বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করেছে, সেই হাদীছকে বলে 'মু'আল্লাল হাদীছ'। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে 'ইল্লাত' হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত :

১. দুর্বোধ্য ও গোপন হওয়া।

২. হাদীছের বিশুদ্ধতা খর্ব করা।

এ দু'টি শর্তের কোন একটি না থাকলে, যেমন : গোপন না হয়ে প্রকাশ্য হওয়া অথবা বিশুদ্ধতা খর্ব না করা– তখন সেটি 'ইল্লাত নামে অভিহিত হবে না।

মু'আল্লাল একটি সূক্ষ্মতম বিষয়, আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন :[২৮৯]

هذا النوع من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المدينى وأحمد والبخارى ويعقوب بن شيبة وأبى حاتم وأبى زرعة والدار قطنى.

"উলূম আল-হাদীছের প্রকারসমূহের মধ্যে এই প্রকারটি হলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, গৌরবময় ও সূক্ষ্মতম। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা ও উজ্জ্বল বোধশক্তির অধিকারীই কেবল এ জ্ঞান লাভে সক্ষম হন। এ কারণে খুব কম লোকই এ বিষয়ে কথা বলেছেন। যেমন 'আলী ইবন আল-মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম আল-বুখারী, ইয়া'কূব ইবন শাইবা, আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ যুর'আ ও দারাকুতনী (রহ)।"

এই জ্ঞান সম্পর্কে ইবন মাহদী বলেন ঃ[২৯০]

لأن أعرف علة حديث أحب إليَّ من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندى.

"আমার নিকট নেই এমন বিশটি হাদীছ আমি লিখি, আর তার চেয়ে একটি হাদীছের 'ইল্লাত জানা আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

আল-হাকিম বলেন, বিভিন্ন কারণে একটি হাদীছ ইল্লাতযুক্ত হয়, তবে তাতে 'জারাহ' (দোষ-ত্রুটি)-এর ভূমিকা থাকে না। আমাদের নিকট হাদীছের 'ইল্লাত

২৮৯. প্রাগুক্ত–১/২৫১

২৯০. প্রাগুক্ত–১/২৫২

সনাক্ত করার ক্ষেত্রে মুখস্থশক্তি, বোধশক্তি ও জ্ঞান ছাড়া আর কোন হুজ্জাত বা দলীল নেই। আর 'মাজরূহ' (দোষ-ত্রুটিযুক্ত) হাদীছ বর্জিত ও তুচ্ছ। 'ছিকা' রাবীদের বর্ণিত হাদীছে বেশি 'ইল্লাত থাকে। তাঁরা হয়তো কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে এমন ইল্লাত আছে–যা তাঁদের নিকট গোপন থেকে গেছে। ফলে হাদীছটি ইল্লাতযুক্ত হয়ে গেছে। তিনি এই ইল্লাত খুঁজে বের করার কোন নিয়ম-নীতি উল্লেখ করেননি। বরং প্রত্যেক প্রকারের হাদীছ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে তার মধ্যে গোপন থাকা 'ইল্লাত চিহ্নিত করেছেন। সকল 'ইল্লাত হয় একটি হাদীছের অংশ আরেকটি হাদীছের প্রবেশ করার কারণে, অথবা রাবীর সংশয়ের কারণে অথবা কোন মুরসাল হাদীছের মুত্তাসিল করার কারণে হয়েছে।[২৯১]

ইবন মাহদী বলেন, এই 'ইল্লাতের জ্ঞান পুরোটাই ইলহাম। যদি তুমি কোন 'আলিমকে বল, আপনি অমুক হাদীছটি মু'আল্লাল (ইল্লাতযুক্ত) বলছেন, অথচ আপনার এ দাবীর পেছনে কোন দলীল নেই। আপনি ছাড়া আরো বহু মানুষ আছেন যাঁরা এই 'ইল্লাতের কথা বলেন না। সেই 'আলিম লোকটি বলবেন, তুমি যদি কোন মুদ্রা বিশেষজ্ঞের নিকট যাও, তাকে তোমার দিরহামগুলো দেখাও এবং তিনি বলেন এইটা ভালো ও এইটা জাল, তাহলে তুমি কি তার কাছে প্রমাণ চাইবে, না তার কথা মেনে নেবে? তুমি বলবে, আমি তার কথা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেব। এই 'ইল্লাতের জ্ঞানও তেমন। আলিমগণের সাথে দীর্ঘ উঠাবসা, গভীর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাই এই জ্ঞানের মূলভিত্তি।[২৯২]

এইশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ ঃ

১. ইবন আল-মাদীনী ঃ কিতাব আল-'ইলাল

২. ইবন আবী হাতিম ঃ 'ইলাল আল-হাদীছ

৩. আহমাদ ইবন হাম্বল ঃ আল-'ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল

৪. আত-তিরমিযী ঃ আল-'ইলাল আল-কাবীর ওয়া আল-'ইলাল আস-সাগীর

৫. আদ-দার কুতনী ঃ আল-'ইলাল আল-ওয়ারিদা ফী আল-আহাদীছ আল-নাবাবিয়া। এ গ্রন্থটিই সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত।[২৯৩]

২২. পরস্পর বিরোধী সুন্নাহসমূহ সম্পর্কে জানা (معرفة السنن المتعارضة) ঃ

এ বিদ্যাও 'উলূম আল-হাদীছ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ফিকহী মাযহাবের

---

২৯১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা–১১৯

২৯২. তাদরীব আর-রাবী–১/২৫২-২৫৩

২৯৩. তায়সীরু মুসতালাহ আল-হাদীছ–১০২

ইমামগণ প্রত্যেকেই নিজেদের মতের সমর্থনে এই পরস্পর বিরোধী হাদীছসমূহের একটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। যেমন রাসূলে কারীমের (সা) বিদায় হজ্জ কোন প্রকারের হজ্জ ছিল ঃ ইফরাদ, তামাত্তু' না কিরান? এ বিষয়ে তিন ধরনের সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ ও ইবন খুযাইমা (রহ) হজ্জে 'তামাত্তু', ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) হজ্জে ইফরাদ এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহ) হজ্জে কিরানের হাদীছ গ্রহণ করেছেন।[২৯৪]

২৩. এমন 'খবর'সমূহ সম্পর্কে জানা যার পরিপন্থী কোন খবর একেবারেই নেই।

আল-হাকিম এর বহু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

২৪. সনদের একজন রাবী কর্তৃক হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত ফিকহী শব্দ সংযোজন করা সম্পর্কে জানা।

ইমাম আস-সুয়ূতী বলেন : "هو فن لطيف تستحسن العناية به" "এ একটি অতি সূক্ষ্ম শাস্ত্র, যার প্রতি মনোযোগ দেয়া উত্তম।" এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে একদল লোক খ্যাতি অর্জন করেন। যেমন আবু বাকর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আন-নীসাবূরী, আবুল ওয়ালীদ হাস্সান ইবন মুহাম্মাদ আল-কারাশী (রহ) প্রমুখ।

এর অনেকগুলো প্রকার আছে। তার একটির দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীছটি :

عن ابن مسعود رض قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أفضل؟ قَال : الصلاة فى أول وقتها، قلت : ثم أى؟ قال : الجهاد فى سبيل الله، قلت : ثم أى؟ قال : بر الوالدين.

"ইবন মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম : কোন্ 'আমল সবচেয়ে ভালো? বললেন : প্রথম ওয়াকতে নামায আদায় করা। বললাম : তারপর কোন্টি? বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। বললাম : তারপর কোন্টি? বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আল-হাকিম বলেন, হাদীছটি সহীহ। মুসলিম ইমামদের একটি দল মালিক ইবন মিগওয়ালের সূত্রে

২৯৪. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা–১১৯

এটি বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে 'উসমান ইবন 'উমারের সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে বিনদার ইবন বাশ্শার ও আল-হাসান ইবন মাকদাম-এ দু'জন ছাড়া আর কেউ "أول الوقت" (প্রথম ওয়াকত) কথাটি উল্লেখ করেননি। এঁরা দু'জনই ফকীহ ও 'ছিকা' (বিশ্বস্ত) রাবী।[২৯৫]

২৫. মুহাদ্দিছগণের মাযহাব (মত) সমূহ সম্পর্কে জানা

আল-হাকিম হাদীছের ইমামগণের সূত্রে এমন বহু বক্তব্য তুলে ধরেছেন যাতে তাঁরা সেই সব পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে পারেন যা কোন রাবী নিজের প্রতি আরোপ করেছে।

২৬. হাদীছের 'মতন' (মূলপাঠ) লেখার ব্যাপারে যে ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে জানা।

হাদীছের বড় বড় ইমামের এ ব্যাপারে পদস্খলন ঘটেছে।

২৭. হাদীছের সনদসমূহ লেখার ব্যাপারে যে ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে জানা।

আল-হাকিম মতন ও সনদ ভুলের বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়া 'উলূম আল-হাদীছ-এর সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানের আরো বহু শাখা আছে। যেমন ঃ রাবীদের নাম, ডাকনাম, জীবনকাল, বংশ-গোত্র, তাদের সমকালীন ব্যক্তিবর্গ, পেশা, লকব, হাদীছটি বলার প্রেক্ষাপট, রাবীদের জন্মস্থান, শহর, ভ্রমণ ইত্যাদি আরো বহু বিষয়ের জ্ঞান এ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) তাঁর বিখ্যাত 'আত-তাদরীব আর-রাবী ফী শারহি তাকরীব আন-নাওয়াবী' গ্রন্থে এ শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত তিরানব্বইটি (৯৩) বিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

পাঁচ. জাল হাদীছ ও হাদীছ জালকারীদের বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী

পূর্ববর্তীকালের মুহাদ্দিছগণের অভ্যাস ছিল, যখন তারা কোন হাদীছের মধ্যে মিথ্যা কোন কিছুর সন্ধান পেতেন তখন সেই মিথ্যাবাদীকে খুঁজে বের করতেন এবং বিভিন্ন মজলিস ও সমাবেশে প্রকাশ্যে তাদের মিথ্যা কথাসহ পরিচয় ঘোষণা করে দিতেন। তাঁরা বলতেন : অমুক মিথ্যাবাদী, তার কোন বর্ণনা গ্রহণ করবেন না, অমুক যিনদীক, অমুক কাদারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ইত্যাদি।

মুহাদ্দিছগণের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

---

২৯৫. তাদরীব আর-রাবী–১/২৪৮

১. আবান ইবন জা'ফার আন-নুমাইরী : এ ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার (রহ) নামে তিনশো (৩০০) জাল হাদীছ ছড়িয়েছে, যার একটিও তিনি বর্ণনা করেননি।

২. ইবরাহীম ইবন যায়িদ আল-আসলামী : এ ব্যক্তি ইমাম মালিকের (রহ) নামে বহু হাদীছ জাল করেছে, যার কোন ভিত্তি নেই।

৩. আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-জুওয়ায়বারী : সে শি'আদের কার্‌রামিয়্যা সম্প্রদায়ের জন্য হাজার হাজার হাদীছ রচনা করেছে।

৪. জাবির ইবন ইয়াযীদ আল-জু'ফী : তার সম্পর্কে সুফইয়ান বলেন, আমি জাবিরকে বলতে শুনেছি সে প্রায় তিরিশ হাজার হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। তার কোন কিছু উল্লেখ করা আমি সঙ্গত মনে করি না।

৫. মুহাম্মাদ ইবন শুজা' আছ-ছালজী : সে সৃষ্ট বস্তুর সাথে আল্লাহর সাদৃশ্যমূলক বহু হাদীছ তৈরী করে মুহাদ্দিছগণের নামে ছড়িয়েছে।

৬. নূহ ইবন আবী মারইয়াম : সে কুরআনের নানাবিধ ফজীলত ও বিভিন্ন সূরার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিষয়ক বহু হাদীছ তৈরী করে ছড়িয়েছে।

এর বাইরে আরো যে সকল মিথ্যাবাদীর নাম পাওয়া যায় তাদের কয়েকজন হলো : আল-হারিছ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আ'ওয়ার, মুকাতিল ইবন সুলাইমান, মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-মাসলূব, মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আল-ওয়াকিদী, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়া আল-আসলামী, ওয়াহাব ইবন ওয়াহাব আল-কাজী, মুহাম্মাদ ইবন আস-সায়িব আল-কালবী, আবূ দাঊদ আন-নাখঈ, ইসহাক ইবন নাজীহ আল-মুলাত্তি, 'আব্বাস ইবন ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ, মা'মূন ইবন আবী আহমাদ আল-হারাবী, মুহাম্মাদ ইবন 'উকাশা আল-কারমানী, মুহাম্মাদ ইবন আল-কাসিম আত-তাযিকানী, মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আল-ইয়াশকুরী ও মুহাম্মাদ ইবন তামীম আল-ফারইয়াবী।

ইমাম আন-নাসাঈ (রহ) বলেন :২৯৬

الكذابون المعروفون بوضع الأحاديث أربعة : إبن أبى يحيى بالمدينة، والواقدى ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.

---

২৯৬. প্রাগুক্ত–১/২৮৭

"জাল হাদীছ রচনার সাথে জড়িয়ে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভকারী ব্যক্তি চারজন। ১. মদীনায় ইবন আবী ইয়াহইয়া, ২. বাগদাদে আল-ওয়াকিদী, ৩. খুরাসানে মুকাতিল ও ৪. শামে মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-মাসলূব।"

সাধারণ মানুষ যাতে জাল হাদীছ দ্বারা প্রতারিত না হয় সে জন্য মুহাদ্দিছগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাদীছ জালকারীদের চিহ্নিত করণের সাথে সাথে তাঁদের জাল হাদীছসমূহ সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তাঁরা সহীহ হাদীছের সংকলন তৈরীর পাশাপাশি জাল হাদীছেরও সংকলন তৈরী করেছেন, যাতে আর কখনো কোন দুর্বৃত্ত এমন পাপাচারে দুঃসাহসী না হয়। এ বিষয়ের উপর রচিত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. মাওদূ'আত আন-নুক্কাশ : রচয়িতা হাজিফ আবু সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-ইস্ফাহানী আল-হাম্বলী (মৃ. ৪১৪ হি.)

২. আল-আবাতীল : রচয়িতা ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ হুসাইন ইবন ইবরাহীম আল-হামাদানী আজ-জুওযাকানী (মৃ. ৫৪৩ হি.)।

৩. আল-মাওদূ'আত : এর সংকলক হাফিয আবুল ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী ইবন আল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.)। তিনি যে সকল হাদীছকে মাওদূ' বলে বিশ্বাস করেছেন, তা সে সহীহ গ্রন্থসমূহেরই হোক না কেন, সবই এ গ্রন্থে সংকলন করেন। সুতরাং তিনি সহীহ মুসলিমের দু'টি, সহীহ বুখারীর একটি, মুসনাদে আহমাদ-এর আটত্রিশটি, আবু দাউদের আটটি, জামি' আত-তিরমিযীর তিরিশটি, সুনান আন-নাসা'ঈর দশটি, সুনান ইবন মাজাহর তিরিশটি এবং আল-হাকিম-এর মুসতাদরাক-এর ষাটটি হাদীছ জাল বলে চিহ্নিত করে তাঁর এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য সুনান গ্রন্থেরও বহু হাদীছ তিনি জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার এ গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেও মুহাদ্দিছগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন মুসনাদে আহমাদ-এর হাদীছকে মাওদূ' বলার প্রতিবাদে গ্রন্থ লিখেছেন 'আল্লামা আল 'ইরাকী ও ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ) (মৃ. ৮৫২ হি.)। ইবন হাজার রচিত গ্রন্থটির নাম : আল-কাওলুল মুসাদ্দাদু ফী যাব্বিল মুসনাদিল ইমাম আহমাদ। আর সাধারণভাবে গ্রন্থটির সমালোচনা করে ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ) লিখেছেন 'আত-তা'আক্কুবাত 'আলা আল-মাওদূ'আত'। এছাড়াও তিনি ইবনূল জাওযী রচিত গ্রন্থটি সংক্ষেপ করে 'আল-লা'আলী আল-মাসনূ'আ' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা প্রায় সবই বহাল

রেখেছেন, তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত: বুখারী ও মুসলিমের হাদীছগুলোর বিষয়ে তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদের হাদীছগুলো সম্পর্কে ইবনুল জাওযীর মতকেও তিনি সমর্থন করেননি।[২৯৭]

৪. আল-মুগনী 'আনিল হিফ্য ওয়াল কিতাব : গ্রন্থটির লেখক আবূ হাফ্স 'উমার ইবন বাদার আল-মূসিলী (মৃ. ৬২২ হি.)। এ গ্রন্থে তিনি কেবল অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়ে বলেছেন, এই বিষয়ের কোন হাদীছ সহীহ নয়। যেমন :

باب فى زيادة الايمان ونقصانه وأنه قول وعمل -

(অধ্যায় : ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি এবং ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি) তারপর তিনি বলেছেন : এই অধ্যায়ের কোন কিছুই সহীহ নয়। 'আলিমগণ এ গ্রন্থেরও সমালোচনা করেছেন।

৫. আদ-দুরার আল-মুলতাকাতু ফী তাবঈন আল-গালাত : রচয়িতা 'আল্লামা আস-সাগানী রাজি উদ্দীন আবুল ফাদল হাসান ইবন হুসাইন (মৃ. ৬৫০ হি.)। আলিমগণ এ গ্রন্থটিরও সমালোচনা করেছেন।

৬. তাযকিরাতুল মাওদূ'আত : এটির রচয়িতা আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল-মাকদিসী (মৃ. ৫০৭ হি.)। মিথ্যাবাদী, অভিযুক্ত, দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীদের বর্ণিত হাদীছই তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

৭. তাযকিরাতুল মাওদূ'আত : এর রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবন তাহির ইবন 'আলী আল-ফাতানী (মৃ. ৯৮৬ হি.)। এর সাথে তিনি হাদীছ জালকারী ও দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে আরবী বর্ণমালা অনুসারে রচিত একটি রিসালা সংযুক্ত করেছেন।

৮. আল-মাওদূ'আত : রচয়িতা আশ-শায়খ 'আলী আল-কারী আল-হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.)

৯. আল-ফাওয়ায়িদ আল-মাজমূ'আ ফী আল-আহাদীছ আল-মাওদূ'আ : রচয়িতা আল-ইমাম আশ-শাওকানী (মৃ. ১২৫০ হি.)।

১০. আল-ফাওয়ায়িদ আল-মাজমূ'আ ফী আল-আহাদীছ আল-মাওদূ'আ : রচয়িতা আল-হাফিয মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন 'আলী আশ-শামী (মৃ. ৯৪২ হি.)।

১১. আর-রিসালা : আল-ইমাম আস-সান'আনী এটি রচনা করেছেন। এতে তিনি

---

২৯৭. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা–১২১ ; রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত–২৭৪

ঐসব মিথ্যা হাদীছ সন্নিবেশ করেছেন যা তাঁর সময়ের কাহিনীকার ও ওয়ায়িজগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তিনি গ্রন্থটির শেষে প্রসিদ্ধ দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীগণের নাম সংযোজন করেছেন।

১২. আল-লু'লু আল-মারসু' ফী মা লা আসলা লাহূ আও বি আসলিহি মাওদূ' : এটির রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আবুল মাহাসিন আল-কাবিক্‌জী আল-আযহারী (মৃ. ১৩০৫ হি.)। তিনি ত্রিপোলীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিসরে হিজরী ১৩০৫ সনের শেষের দিকে মৃত্যু বরণ করেন।

১৩. তালখীস আল-মাওদূ'আত : রচয়িতা জালাল উদ্দীন ইবরাহীম ইবন উসমান।

১৪. তানযীহ্ আশ-শারী'আ আল-মারফূ'আ 'আন আল-আহাদীছ আশ্ শানী'আ আল-মাওদূআ : রচয়িতা 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-কিনানী (মৃ.৯৬৩ হি.)।

১৫. তাযকিরাতুল মাওদূ'আ : মুহাম্মাদ ইবন তাহির ইবন আলী আস-সিদ্দীক পাট্টনী (মৃ. ৯৮৬ হি.)।

১৬. মুখতার আল-লা'আলী আল-মাসনূ'আ : রচয়িতা আবুল হাসান ইবন আহমাদ আল-মালিকী আল-মাগরিবী (মৃ. ১১৪৩ হি.)।

১৭. আদ-দুরার আল-মাসনূ'আ : লেখক আবুল 'আওন শামসুদ্দীন বাকর ইবন আহমাদ আস-সাফারানী (মৃ. ১১৮৮ হি.)।

১৮. তাহ্‌যীব আল-মুসলিমীন মিন আল-আহাদীছ আল-মাওদূ'আ আস-সায়্যিদিল মুরসালীন : এর রচয়িতা মুহাম্মাদ আল-বাশীর যাকির আল-আযহারী (মৃ. ১৩৫০ হি.)।

১৯. কিতাব আল-মানার আল-মুনীফ ফী আস-সাহীহ ওয়া আদ-দা'ঈফ : রচয়িতা আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আদ-দিমাশ্‌কী (মৃ. ৭৫১ হি.)।

২০. কানূন আল-মাওদূ'আত ফী আসমা' আল-ওয়াদ্দা'ঈন ওয়া আল-কায্‌যাবীন : রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী।

এছাড়া আরো বহু গ্রন্থ এ বিষয়ের উপর রচিত হয়েছে। যেমন : আল-কাসাস ওয়া আল-মূযাক্‌কিরীন, আহাদীছ আল-কাসাস ওয়া আল-মূযাক্‌কিরীন, আহাদীছ আল-কাসাস, আল-বা'ইছ 'আলা আল-খাল্লাস মিন হাওয়াদিছ আল-কাসাস, তাহ্‌যীর আল-খাওয়াস মিন আহাদীছ আল-কাস্‌সাস, আল-আলসিনা, তামঈয আত-তায়্যিব মিন আল-খাবীছ, আল-আছার আল-মারফূ'আ ফী আখবার আল-মাওদূ'আ, আল-কালাম আল-মারফূ' ফী মা ইয়াতা'আল্লাকু বিল হাদীছ

আল-মাওদূ', আল-কাশ্ফ আল-হাদীছ ফী মান রুমিয়া বিওয়াদ'ইল হাদীছ ইত্যাদি।[২৯৮]

ছয়. মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হাদীছসমূহের সংকলন-গ্রন্থাবলী

এ সকল গ্রন্থে সহীহ, দা'ঈফ ও মাওদূ' সব ধরনের হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নও আমাদের মুহাদ্দিছগণের মহান প্রচেষ্টার একটি অনন্য ফসল। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. আল-লা'আলী আল-মানছূরা ফী আল-আহাদীছ আল-মাশহূরা : গ্রন্থটির রচয়িতা আয-যারাকশী (মৃ. ৭৯৪ হি.)। ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সূয়ূতী (রহ) এটি সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছেন 'আদ-দুরার আল-মুন্‌তাশারা ফী আল-আহাদীছ আল-মুশতাহারা'।

২. আল-মাকাসিদ আল-হাসানা ফী আল-আহাদীছ আল-মুশতাহারা 'আলা আল-আলসিনা : এর সংকলক হলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রাহমান আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২ হি.)।

৩. কাশ্ফ আল-খাফা' ওয়া আল-ইলবাস ফী মা ইয়াদূরু মিন আল-আহাদীছ 'আলা আলসিনাতিন নাস : এর রচয়িতা ইমাম আল-'আজলূনী (মৃ. ১১৬২ হি.)। তিনি ইমাম আস-সাখাবীর গ্রন্থটি অনুকরণ করলেও কিছু অতিরিক্ত তথ্যও সংযোজন করেছেন।

৪. তামঈয আত-তায়্যিব মিন আল-খাবীছ ফী মা ইয়াদূরু 'আলা আলসিনাতিন নাস মিন আল-হাদীছ : গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইবন আদ্-দায়বা' আশ-শাইবানী আল-আছারী (মৃ. ৯৪৪ হি.)।

৫. আসনা আল-মাতালিব ফী আহাদীছ মুখতালাফাতিল মারাতিব : শায়খ মুহাম্মাদ আল-হূত আল-বাইরূতী 'তামঈয আত-তায়্যিব' গ্রন্থটির অনুকরণে এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তবে তিনি এতে অতিরিক্ত কিছু তথ্যও সংযোজন করেছেন।[২৯৯]

---

২৯৮. হাদীছের তত্ত্ব–১২৭ ; মীযানুল আখবার–১১৬

২৯৯. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা–১২২–১২৩

উপসংহার

সুন্নাহ্ অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও বিকাশ

সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি বলতে গেলে নবী কারীমের (সা) রিসালাত প্রাপ্তির সূচনা থেকেই। রাসূলের সুন্নাহর অস্বীকৃতি এবং তার রিসালাত অস্বীকৃতির সময়কাল প্রায় একই। অপরাধের মাত্রা হিসেবে দুটোই সমান। সুন্নাহর অস্বীকৃতি যেমন কুফরী কাজ তেমনি রিসালাত অস্বীকৃতিও কুফরী কাজ। ইতিহাসের প্রতিটি যুগই যেমন কাফির থেকে মুক্ত ছিল না, তেমনি মুক্ত ছিল না সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের থেকেও। অথচ এই অস্বীকারকারীরা সব সময় নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেছে।

প্রথমত এর সূচনা হয় ব্যক্তি পর্যায়ে এবং তা খুবই সীমিত আকারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম ও হাতিব ইবন আবী বালতায়ার (রা) মধ্যে ভূমিতে কে আগে সেচ দেবে তা নিয়ে ঝগড়া হয়। তাঁরা ফায়সালার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূলুল্লাহ সিদ্ধান্ত দেন যে, যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম তার ভূমিতে সেচ দেয়ার পর হাতিব ইবন আবী বালতা'আ সেচ দেবে। এ রায়ে হাতিব ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, যুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই, তাই আপনি তাঁর পক্ষে রায় দিলেন। তখন নাযিল হয় এ আয়াত :[৩০০]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

(النساء - ٦٥)

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে ; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা নিসা-৬৫)

এ ছিল একটি ব্যতিক্রম ঘটনা। সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাসে এটা উল্লেখ করা হয় না। তাছাড়া ক্ষুব্ধ ব্যক্তি হাতিব (রা) খুব দ্রুত সত্য উপলব্ধি করে রাসূলের (সা) সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

---

৩০০. সহীহ আল-বুখারী, কিতাব আত-তাফসীর, (৪৫৮৫)

দল ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুন্নাহ অস্বীকার করার সূচনা হয় খারিজী ও শী'আদের মাধ্যমে। তারপর এদের সাথে যুক্ত হয় মুতাকাল্লিম গোষ্ঠী, বিশেষত: মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং তাদের সাথে আরো যুক্ত হয় যিন্দীক ও মুসলিম মিল্লাতের পাপাচারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীরা।[৩০১] শী'আ ও খারিজী উভয় গোষ্ঠী সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতো, তবে শী'আরা কেবল তাদের ইমাম ও আহলি বাইতের সূত্রে যে সকল সুন্নাহ ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা-ই মানতো। অন্য সকল সাহাবীর থেকে বর্ণিত সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করতো। তারা যাদের বর্ণিত সুন্নাহ মানতো তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাছাড়া তাদের রাফিজী গ্রুপতো হাদীছ জাল করণের মারাত্মক অপরাধের সাথেও জড়িয়ে পড়ে।

খারিজীরা তো 'আলী (রা)-মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফীন যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী তাহকীম তথা শালিসী উদ্যোগের পর সকল সাহাবীকে কাফির বলে ঘোষণা করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাঁদেরকে হত্যা ও তাঁদের সম্পদ ও নারী-শিশুদের গণীমাত হিসেবে দখল করা বৈধ মনে করতো। এমতাবস্থায় কোন সাহাবীর বর্ণিত সুন্নাহ গ্রহণ করার কথা তারা চিন্তাও করতো না। তবে খারিজীদের একটি গ্রুপ যাদের সংখ্যা অতি নগণ্য, সাহাবায়ে কিরাম কাফির নয়, বরং ফাসিক বলে বিশ্বাস করতো। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে খারিজীরা যেহেতু মুষ্টিমেয় বিশেষ কিছু সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর আদালতে বিশ্বাস করতো না, তাই তাঁদের বর্ণিত সুন্নাহ গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী (রহ) খারিজীদের সম্পর্কে বলেন :[৩০২]

أنكروا حجية الاجماع والسنن الشرعية، وأنه لا حجة فى شئ من أحكام الشريعة الامن القرآن، ولذلك انكرو الرجم والمسح على الخفين لأنهما ليسا فى القرآن وقطعوا يد السارق فى القليل والكثير لان الامر بالقطع فى القرآن مطلق۔

"তারা ইজমা' ও শর'ঈ সুন্নাহর হুজ্জাত বা প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। তাদের মতে একমাত্র কুরআন ছাড়া শরী'আতের আহকামের ক্ষেত্রে আর কোন

৩০১. ইবন কুতাইবা, তা'বীলু মুখতালাফ আল-হাদীছ-১৫

৩০২. ড. মাহমূদ মুহাম্মাদ মাযরূ'আ, শুবহাত আল-কুরআনিয়্যীন হাওলা আস-সুন্নাহ্-৪০, উসূল আদ-দীন-১৯

কিছুই দলীল বা প্রমাণ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ কারণে তারা ব্যভিচারীকে রজম করা ও দুই মোযার উপর মসেহ করা অস্বীকার করে। কারণ, এর বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। তেমনিভাবে কম বা বেশি যাই চুরি করুক তারা চোরের হাত কেটে দেয়। কারণ, কুরআনে সাধারণভাবে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে।"

সুন্নাহ অস্বীকৃতির এই পথ ভ্রষ্টতা খারিজী ও শী'আদের হাত ধরে পথ চলা শুরু করে এবং পরে তাদের সাথে আরো অনেক পথভ্রষ্ট দল ও গোষ্ঠী যোগ দেয়। এই পথ চলা যুগের পর যুগ চলতে থাকে এবং পথিমধ্যে তারা বিভিন্ন দল ও মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন :

ক. একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) কথা, কাজ ও সমর্থন– সব কিছুকে অস্বীকার করে। এসব কিছুকে তারা আর দশজন সাধারণ মানুষের কথা, কাজ ও সমর্থনের মতই মনে করে।

খ. একদল রাসূলুল্লাহর (সা) 'আমলী সুন্নাহ মানলেও কাওলী সুন্নাহকে অস্বীকার করে।

গ. তৃতীয় দলটির অপরাধ মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম, তবে এদের সংখ্যা অনেক বেশি। এরা বলে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল সুন্নাহ– কথা বা কাজ মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কেবল তাই গৃহীত হবে, এর বাইরে খবরে ওয়াহিদ হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আকীদা বিষয়ক খবরে ওয়াহিদ প্রত্যাখ্যান করলেও অন্য বিষয়ক খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করে।

ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের এই তৎপরতা কোন সময় একটু বেগবান এবং কোন সময় একটু দুর্বল অবস্থায় উনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে।

খারিজীদের এই ফিত্না সৃষ্টির প্রয়োজন এই জন্য হয়েছিল যে, তারা মুসলিম সমাজে যে নৈরাজ্য ছড়াতে চাচ্ছিল তার পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ প্রতিবন্ধক ছিল। কারণ সুন্নাহ সমাজকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মহানবীর (সা) সুন্নাহর বর্তমানে তাদের চরমপন্থী মতবাদ অচল হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তারা হাদীছের যথার্থতায় সন্দেহ পোষণ এবং সুন্নাহর অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

মু'তাযিলাদের এই ফিতনার সূত্রপাত করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, অনারব ও গ্রীক দর্শনের সাথে প্রথম বারের মত পরিচয় হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাস, নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে যেসব সন্দেহের

সৃষ্টি হতে থাকে তা পূর্ণরূপে অনুধাবনের পূর্বে তারা কোন না কোনভাবে এর সমাধান দিতে চাচ্ছিল। স্বয়ং এই দর্শনের উপর তখনো তাদের এতটা অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়নি যে, তা সমালোচনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার বিশুদ্ধতা ও শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। দর্শনের নামে যে কথাই এসেছে তারা তাকে সম্পূর্ণ যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দাবী মনে করেছে এবং তারা চাচ্ছিল যে, ইসলামের 'আকীদা-বিশ্বাস ও নীতিমালার এমন ব্যাখ্যা করা হোক যাতে তা এই তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তিক দাবীর অনুরূপ হয়ে যায়। এ পথেও হাদীছ ও সুন্নাহ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য তারাও খারিজীদের মত হাদীছকে সন্দেহযুক্ত মনে করে এবং সুন্নাহকে হুজ্জাত বা দলীল হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

এই উভয় দলের ফিতনার উদ্দেশ্য এবং তাদের কৌশল ছিল অভিন্ন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কুরআন মাজীদকে তার বাহকের (রাসূল সা.) মৌখিক ও আমলী (বাস্তব) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এবং আল্লাহর রাসূল (সা) স্বীয় পরিচালনায় ও নির্দেশনায় যে চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র একটি গ্রন্থের আকারে উপস্থাপন করা, অতঃপর তার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে আরেকটি ব্যবস্থায় রূপান্তর করা, যার উপর ইসলামের লেবেল আঁটা থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে কৌশল অবলম্বন করে তার সারকথা দু'টি :

১. হাদীছ সম্পর্কে মনের মধ্যে এই সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে যে, তা আদৌ রাসূলে কারীমের (সা) কি না?

২. এই মৌলিক প্রশ্নও উত্থাপন করা হবে যে, কোন কথা বা কাজ রাসূলে কারীমের (সা) হলেও তার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে আমরা কখন বাধ্য?

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের পর্যন্ত কুরআন মাজীদ পৌছিয়ে দিতেই আদিষ্ট ছিলেন। অতএব তিনি তা পৌছে দিয়েছেন। অতঃপর মুহাম্মাদ (সা) ইবন 'আবদিল্লাহ আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন তা কি আমাদের জন্য হুজ্জাত তথা অকাট্য প্রমাণ হতে পারে?

এই দুটি ফিতনা কিছুকাল চলার পর একেবারেই স্তিমিত হয়ে যায় এবং হিজরী তৃতীয় শতকের পর কয়েক শতক পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ার কোথাও তার নামগন্ধও অবশিষ্ট ছিল না। নিম্নলিখিত কারণসমূহ ঐ সময় উল্লেখিত ফিতনার মূলোৎপাটন করে :

১. মুহাদ্দিছগণের ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক কাজ যা মুসলিম সমাজের সকল চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের আশ্বস্ত করে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ও হাদীছ

যেসব রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তা মোটেও সন্দেহযুক্ত নয়, বরং অতিবিশ্বস্ত মাধ্যমে উম্মাতের নিকট পৌঁছেছে এবং তাকে সন্দেহযুক্ত রিওয়ায়াত থেকে পৃথক করার জন্য সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ বর্তমান রয়েছে।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা, যার সাহায্যে তৎকালীন যুগের বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ মুসলিম জনসাধারণের সামনে এ কথা প্রমাণ করে দেন যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদা তা নয়–যা হাদীছ প্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁকে দিতে চাচ্ছে। কুরআন মাজীদ পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁকে একজন পত্রবাহক মাত্র নিযুক্ত করা হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, কুরআনের ভাষ্যকার, আইন প্রণেতা, বিচারক এবং প্রশাসকও নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব কুরআন মাজীদের আলোকেই তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ আমাদের জন্য ফরয এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণের দাবী করে সে মুলতঃ কুরআনের অনুসারীই নয়।

৩. সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের মনগড়া ব্যাখ্যা কুরআনকে খেলনায় পরিণত করেছিল। মুহাদ্দিছগণ সে বিষয়টি মুসলিম সর্বসাধারণের সামনে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর সাথে কুরআনের সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে দীন ইসলামের অবয়ব কতটা নিকৃষ্টভাবে বিকৃত হয়ে যায়, আল্লাহর কিতাবের সাথে কিভাবে তামাশা করা যায় এবং তার অর্থগত বিকৃতির কী ধরনের হাস্যকর নমুনা সামনে আসে তার একটা চিত্রও তারা উপস্থাপন করেন।

৪. উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ চিন্তা কোন ক্রমেই একথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না যে, মুসলিম ব্যক্তি কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে মুক্ত হতে পারে। মুষ্টিমেয় এমন কিছু লোক তো প্রতিটি যুগেই এবং প্রতিটি জাতির মধ্যেই থাকে যারা উল্টাপাল্টা কথা বলে, যুক্তিহীন কথাকেই যুক্তিযুক্ত বলে দাবী করে। কিন্তু সমগ্র উম্মাহ্র নেতৃত্বের আসন অধিকার করা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। মুসলিম জনগণের নিকট একথা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, তারা রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতের উপর ঈমানও আনবে, আবার নিজেদের ঘাড় থেকে তাঁর আনুগত্যের রশিও খুলে ফেলবে। একজন সহজ সরল প্রকৃতির মুসলিম যার মনমগজে বক্রতা নেই, সে কোন পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু এই আকীদা কখনো গ্রহণ করতে পারে না যে, যেই রাসূলের (সা) উপর সে ঈমান এনেছে তাঁর আনুগত্য করতে মোটেই বাধ্য নয়।

এটা ছিল সবচেয়ে বড় ভিত্তি যা শেষ পর্যন্ত সুন্নাহ প্রত্যাখ্যানকারীদের শিকড় কেটে দেয়। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহ্র মনমানসিকতা এত বড় বিদ'আতকে মেনে নেয়ার জন্য কোন প্রকারেই প্রস্তুত হয়নি যে, এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, তার সমস্ত আইন-কানুন, বিধিব্যবস্থা এবং কাঠামো সমেত প্রত্যাখ্যান করা হবে যা রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রশিদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, মুজতাহিদীন এবং উম্মাতের ফকীহগণের পথ নির্দেশনায় ধারাবাহিকভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ লাভ করে আসছিল এবং তা পরিত্যাগ করে ভবিষ্যতে একটি নতুন ব্যবস্থা এমন লোকদের দ্বারা গড়ে তোলা হবে যারা দুনিয়ার প্রতিটি দর্শন ও মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের একটি নতুন সংস্করণ বের করতে চায়।

সুন্নাহ প্রত্যাখ্যানকারীদের এই ফিতনা কয়েক শো বছর যাবত প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে হিজরী ত্রয়োদশ শতকে (খ্রীস্টীয় উনবিংশ শতকে) তা পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার পহেলা জন্ম ইরাকে, অতঃপর পুনর্জন্ম লাভ করে ভারতে। এখানে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান ও মৌলভী চেরাগ আলী এর সূচনা করেন। অতঃপর মৌলভী আবদুল্লাহ চক্রালোবী-এর পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরে মৌলবী আহমাদ উদ্দীন অমৃতসরী ও মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরী তা নিয়ে অগ্রসর হন। অবশেষে আসে চৌধুরী গোলাম আহমাদ পারভেজের ভূমিকা, যিনি এই গোমরাহীকে চরম পর্যায়ে পৌঁছান।

এই পুনর্জন্মের কারণও তাই ছিল, যা হিজরী দ্বিতীয় শতকে এর জন্মের কারণ হয়েছিল। আর তা ছিল বাইরের দর্শন ও ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়ে মানসিক পরাজয় বরণ করা এবং সমালোচনা ব্যতীতই বাইরের এসব জিনিসকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবী বলে মেনে নিয়ে ইসলামকে তদনুযায়ী ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের তুলনায় ত্রয়োদশ শতকের পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর। ঐ সময় মুসলিমরা ছিল বিজয়ী, তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যও ছিল এবং তারা যেসব দর্শনের সম্মুখীন হয়েছিল তা ছিল বিজিত ও পরাভূত জাতিসমূহের দর্শন। এ কারণে তাদের মন-মগজে এসব দর্শনের আক্রমণ অতি সামান্য প্রমাণিত হয় এবং অতি শীঘ্র তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

পক্ষান্তরে উনবিংশ শতকে (হি. ত্রয়োদশ) মুসলিমদের উপর এই হামলা এমন সময় করা হয় যখন তারা প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে আসছিল, তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তাদের দেশ শত্রুরা দখল করে নিয়েছিল, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদেরকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উল্টাপাল্টা করে

ফেলা হয়েছিল এবং তাদের উপর বিজয়ী জাতি নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা, আইন-কানুন এবং নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন শৃঙ্খলা পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়েছিল। এই অবস্থায় যখন মুসলিমগণ বিজয়ী জাতির দর্শন, বিজ্ঞান এবং তাদের আইন-কানুন ও সাংস্কৃতিক নীতিমালার সম্মুখীন হলো তখন তাদের মধ্যে পূর্বকালের মু'তাযিলাদের তুলনায় হাজার গুণ বেশি ভীত প্রভাবিত মনের মু'তাযিলার আবির্ভাব হতে থাকলো। তারা মনে করে নিল যে, পাশ্চাত্য থেকে যে মতবাদ. যে চিন্তা, যে ধ্যানধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতির যে নীতিমালা এবং জীবন-বিধান আমদানী হচ্ছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমালোচনা করে সত্য-মিথ্যার ফায়সালা করা অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইসলামকে যেভাবেই হোক কেটেছেঁটে যুগোপযোগী করে নিতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে তারা যখনই ইসলামকে মেরামত করতে চাইলো তখন তারাও অতীতের মু'তাযিলাদের অনুরূপ অসুবিধারই সম্মুখীন হলো। তারা বুঝতে পারলো যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা যে জিনিস পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবরূপে কায়েম করেছে তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ। এই সুন্নাহই কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে মুসলিমদের পূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণার বিনির্মাণ করেছে এবং সুন্নাহই জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামের বাস্তব রূপ মজবুত ভিত্তির উপর গঠন করেছে। অতএব এই সুন্নাহ্র ব্যাপারে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ না করা পর্যন্ত ইসলামের কোন নতুন রূপ দেয়া সম্ভব নয়। তারপর বাকী থাকবে কেবল কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ, যেগুলো বুঝার ক্ষেত্রে না থাকবে কোন বাস্তব নমুনা, না নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আর না কোন প্রকারের রিওয়ায়াত। এভাবে কুরআনকে অপব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিণত করা সহজ হবে এবং ইসলামকে প্রতিটি প্রচলিত দর্শন অনুযায়ী প্রতিদিন একটি নতুন আকৃতি দান করা যাবে।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারাও আবার অতীতকালে ব্যবহৃত দুটি কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ একদিকে যেসব হাদীছের মাধ্যমে সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার যথার্থতায় সন্দেহের সৃষ্টি করা হলো এবং অপরদিকে সুন্নাহর স্বয়ং ও সরাসরি হুজ্জাত (প্রমাণ) হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করা হলো। কিন্তু এখানে পরিস্থিতির পার্থক্য এই কৌশলের বিস্তারিত আকারের বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। অতীতকালে যেসব লোক এই ফিতনার পতাকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তারা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপক্ক। তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্হ-এর জ্ঞানেও তারা ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাদের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেই সব মুসলিমদের সাথে যাদের জ্ঞান চর্চার ভাষা ছিল আরবী। তখনকার সাধারণ মুসলিমদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অনেক উন্নত। সেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বত্র বিচরণ করতেন এবং এই ধরনের জনগণের সামনে কোন কাঁচা কথা এনে পরিবেশন করলে স্বয়ং সেই ব্যক্তিরই বিপাকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ কারণে অতীত কালের মু'তাযিলাগণ পরিমাপ করে কথা বলতো। পক্ষান্তরে এ যুগে যেসব লোক এই ফিতনা ছড়ানোর জন্য আবির্ভূত হয় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মানও স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একজন থেকে আরেকজনের নিম্নতর হতে থাকে। তারা আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানে দারুণ অদক্ষ। আরবী ভাষায় সরাসরি কুরআন-হাদীছ পাঠ করে মর্মোদ্ধার করতে অক্ষম। এ বিষয়ে তারা প্রাচ্যবিদদের নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অথচ তারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সম্পর্কে এই ধারণায় লিপ্ত যে, ইসলাম সম্পর্কে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম। এই অবস্থায় অতীতের মু'তাযিলাদের তুলনায় বর্তমানকালের মু'তাযিলাদের যোগ্যতার মানদণ্ড কতটা নিম্নতর হতে পারে তা সুস্পষ্ট।

আধুনিক কালে এই ফিতনার প্রসারের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. হাদীছকে সন্দেহপূর্ণ প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ সেসব তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজেদের পক্ষ থেকে তাতে কিছু টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, যাতে অজ্ঞ লোকেরা এই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয় যে, মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কোন জিনিসই নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়নি।

২. ত্রুটি বের করার উদ্দেশ্যে হাদীছ ভাণ্ডারে শুদ্ধি অভিযান চালানো এবং এমন জিনিস বের করে বরং মনগড়াভাবে রচনা করে জনসাধারণের সামনে পেশ করা যাতে তাদের প্রভাবিত করা যায় যে, হাদীছের গ্রন্থাবলী নিছক লজ্জাজনক অথবা হাস্যকর উপাদানে পরিপূর্ণ। অতঃপর বিনীতভাবে এই আবেদন করা যে, ইসলামকে অপমান থেকে বাঁচাতে হলে এই সমস্ত মূল্যহীন ভাণ্ডার সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।

৩. রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতের পদমর্যাদাকে শুধুমাত্র একজন বাহকের পদ সাব্যস্ত করা যার দায়িত্ব কেবলমাত্র জনগণের নিকট কুরআন পৌঁছে দেওয়া।

৪. শুধুমাত্র কুরআন মাজীদকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহকে ইসলামী আইন ব্যবস্থার আওতা থেকে বের করা।

৫. মুসলিম উম্মাহ্র সকল 'আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির এবং ভাষাবিদ ইমামকে অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা, যাতে মুসলিমগণ কুরআন মাজীদের বক্তব্য বুঝার জন্য তাদের শরণাপন্ন না হয়, বরং তাদের সম্পর্কে এই ভ্রান্তির শিকার হয় যে, তাঁরা সকলে কুরআনের যথার্থ শিক্ষাকে গোপন করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

৬. কুরআন মাজীদের সমস্ত পরিভাষাসমূহের অর্থের পরিবর্তন সাধন এবং কুরআনের আয়াতসমূহের এমন বিকৃত অর্থ আবিষ্কার করা যা পৃথিবীর যে কোন আরবী ভাষাবিদের দৃষ্টিতে কুরআনের শব্দ থেকে বের করার কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অনারবদের মধ্যে অনেকে এসব কাজ করছে, তাদের সামনে যদি কুরআনের কয়েকটি আয়াত স্বরচিহ্ন ছাড়া লিখে রাখা হয় তবে তারা তা সঠিকভাবে পড়তেও পারে না।[৩০৩]

ভারত-পাকিস্তানে এ ফিতনার কয়েকজন পুরোধার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এই অশুভ গোষ্ঠী নতুন করে মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। একদল লোক নিজেদেরকে "الْقُرْآنِيُّوْنَ।" তথা কুরআন পন্থী বলে দাবী করে। তারা প্রচার করতে থাকে শরী'আতের একমাত্র দলীল আল-কুরআন। এর বাইরে সুন্নাহর কোন গুরুত্ব নেই। তাদের প্রচার ও আন্দোলন চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায়। ভারত বিভক্তির পর এ মতবাদ "পারভেযী" মতবাদ হিসেবে পাকিস্তানে শিকড় গেঁড়ে বসে। এ মতবাদের কয়েকজন পুরোধা হলেন :

১. স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৭)

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে এ ব্যক্তির হাত ধরে। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র পরিপন্থী বহু কথা প্রচার করে ইসলাম ও মুসলিমদের বহু ক্ষতি তিনি করেছেন। ইসলামের দুশমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোসর হিসেবে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জঘন্য কাজ তিনি করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি মুসলিমদেরকে তা অনুকরণের আহবান জানান। তিনি তাঁর সারাটি জীবন ইংরেজদের সেবায় কাটিয়ে দেন। মুসলিম উম্মাহ্ যাতে ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব ও

৩০৩. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা-১৭-২৩

সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কুরআনের একটি তাফসীর প্রণয়ন করেন। এ তাফসীরে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা'র পরিপন্থী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে তাফসীর করতে গিয়ে ঈমান-আকীদা ও বাস্তব আমলের অনেক কিছু অস্বীকার করেছেন। গায়ব (অদৃশ্য জগত), ফেরেশতা, জিন, শয়তান ইত্যাদি অস্বীকার করে তার অপব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং সুন্নাহ বা হাদীছের বর্ণনাকারীরা যেহেতু বিশ্বাস যোগ্য নয়, তাই তাদের বর্ণনার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না বলে অতীতের সুন্নাহ অস্বীকারকারীরা যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করতেন তিনি সেই সকল যুক্তি আবার সামনে নিয়ে আসেন।

সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ।

১. হাদীছে জিন, ফেরেশতা, শয়তান, জান্নাত, জাহান্নাম বিষয়ক যত কথা এসেছে তার বাহ্যিক অর্থ তিনি গ্রহণ না করে অপব্যাখ্যা করে ভিন্ন অর্থ নিয়ে মূলতঃ সুন্নাহ অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রেও ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন।

২. সুন্নাহ দীর্ঘকাল লিখিত হয়নি, মানুষের স্মৃতিতে থাকার দাবী করা হয়েছে, যার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

৩. সুন্নাহর মধ্যে যে সকল আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, গল্প-কাহিনী, উপদেশ পাওয়া যায় তা মূলতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নয়, বরং তা সবই মুহাদ্দিছ, সুন্নাহর ব্যাখ্যাকার ও ফকীহদের গবেষণা প্রসূত বিষয়। তাই তা মানা অপরিহার্য নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি যা আরোপ করা হচ্ছে, তার সত্যতা সন্দেহমুক্ত নয়, তাছাড়া পরবর্তীতে যারা বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা হয়তো রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্য যথাযথভাবে বুঝতে না পারার কারণে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. 'আবদুল্লাহ চাকরালাবী

১৮৩০ সনে পাঞ্জাবের চাকরালা নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ, কিন্তু পিতার পীর তাঁর জন্য দু'আ করে নাম রাখেন– গোলাম নবী। পরবর্তীকালে এই গোলাম নবী (নবীর দাস) হয়ে যান নবীর দুশমন। প্রথম জীবনে তিনি স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী থাকলেও পরবর্তীতে ভ্রান্ত পথে

পা বাড়ান এবং তাঁর নতুন মতবাদ প্রচারের সূচনা করেন– এভাবে : "এই কুরআন– একমাত্র এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। এছাড়া সুন্নাহ কোন ওহী নয়।" পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি প্রথম জীবনে সুন্নাহ অস্বীকারকারী ছিলেন না, হঠাৎ করেও তিনি অস্বীকারকারী হননি, বরং কুরআন-হাদীছ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার এক পর্যায়ে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। আর এই সুযোগটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রহণ করে এবং তারা তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইংরেজরা তাঁকে তাঁর মতবাদ প্রচার প্রসারে সহায়তা করে। অবশ্য একথাও প্রচলিত আছে যে, ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরই তিনি সুন্নাহ অস্বীকারকারী হয়ে যান।

৩. আহমাদ উদ্দীন অমৃতসরী

তিনি ১৮৬১ সনে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে দীনী 'ইলম অর্জন করেন। পরবর্তীতে খৃস্টান মিশনারী কলেজে পড়ালেখা করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সুন্নাহ অস্বীকারকারী স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও আবদুল্লাহ 'চাকরালাবীর মতবাদের সাথে পরিচিত এবং তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথেও তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি "মুসলিম উম্মাহ" নামে একটি জার্নাল বের করেন এবং তার অনুসারীদের নিয়ে একটি দলও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৩৬ সনে মারা যান।

৪. গোলাম আহমাদ পারভেজ

১৯০৩ সনে তিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। সরকারী ছাপাখানায় কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি طلوع اسلام নামে কটি জার্নাল প্রকাশ করেন এবং পূর্ববর্তী সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের মতই মতামত এবং সুন্নাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করতে থাকেন।

৫. তাহরীক তা'মীরে ইনসানিয়্যাত

এ একটি সংগঠন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতারা পাকিস্তানের কিছু বিত্তশালী মানুষ এবং তারা সকলেই পূর্ববর্তী সকল সুন্নাহ অস্বীকারকারী, বিশেষতঃ পারভেজী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তারা তাদের নামে পরিচয় না দিয়ে এই সংগঠনের আড়ালে একই বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

আবদুল খালিক মালুওয়াদা। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং প্রচুর অর্থ এই সংগঠনের পেছনে ব্যয় করেন।[৩০৪]

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, সুন্নাহ অস্বীকারকারীগণ, তা তারা যে প্রকৃতিরই হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতেও চায়, আবার তাদের বাতিল ধ্যান-ধারণা ও স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার নামে স্বেচ্ছাচারিতার পথে প্রতিবন্ধক সুন্নাহকে অস্বীকারও করতে চায়। এই 'মুনকিরীনে সুন্নাহ' তথা সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের আগাগোড়া ইতিহাস যদি আমাদের সামনে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের প্রথম দল অথবা ব্যক্তিটির বক্তব্য এবং শেষ দল বা ব্যক্তিটির বক্তব্য একই। হয়তো যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের উপস্থাপনা, কৌশল ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।

এর পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ্‌র মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির,ফাকীহ ও ইমামগণের কর্মতৎপরতার ইতিহাসও আমাদের সামনে আছে। তাঁদের প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিরোধের কারণে সুন্নাহ অস্বীকারকারীরা কোন কালেই মুসলিম জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাই বর্তমান সময়ের সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, তাদের কর্মপদ্ধতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আমাদের পূর্বসূরীগণ যেভাবে তাদের প্রতিরোধ করেছেন, সেভাবে তাদের মুকাবিলা করতে হবে।

---

৩০৪. ড. মাহমূদ মুহাম্মাদ মাযরূ'আ, প্রাগুক্ত–৪৫

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-হাকিম, মা'রিফাতু 'উলূম আল-হাদীছ, সম্পাদনা : মু'আজ্জম হুসায়ন (কায়রো : ১৯৩৭)

২. ইবন কাছীর, ইখতিসারু 'উলূম আল-হাদীছ, শারহু আহমাদ শাকির (মিসর : তাব'আ হিজাযী)।

৩. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীব আত-তাহযীব (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)

৪. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল বারী, (আল-বাহিয়্যা ; ১৩৪৮)

৫. ইবন কুতায়বা, তা'বীলু মুখতালাফ আল-হাদীছ (মিসর : ১ম সংস্করণ, ১৩২৬)

৬. তাহির আল-জাযাইরী, আন-নাজার ইলা 'উলূম আল-আছার (মিসর : ১৩২৮)

৭. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ্ ফী আল-ইহতিজাজ বিস-সুন্নাহ্ (আল-মাদীনা আল-মুনাওওরা : আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯)

৮. ইবন 'আবদিল বার, জামিউ বায়ান আল-'ইলম (মিসর : আল-মুনীরিয়্যা)

৯. ইবন তায়মিয়্যা, মিনহাজ আস-সুন্নাহ্ (আমীরিয়্যা, ১৩২১)

১০. ইবন কাছীর, মুখতাসার তাফসীর, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ 'আলী আস সাবূনী (বৈরূত : দারুল কুরআন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮১)

১১. ইবন কায়্যিম আল-জাওযীয়্যা, ই'লাম আল-মুওয়্যাক্‌কি'ঈন (কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০০৪)

১২. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (মিসর : মাকতাবাতু আন-নাহ্‌দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১৩. আল-ইমাম আস-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' (বৈরূত : আল-মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০)

১৪. আল-ইমাম আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

১৫. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া (বৈরূত : মাকতাবাতু আল-মা'আরিফ)

১৬. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত : দারু সাদির)

১৭. সাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা (করাচী, ১৩০২)

১৮. ইবন তায়মিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া (মাককা : আন-নাহ্‌দা আল-হাদীছা, ১৪০৪)

১৯. আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম (মিসর : তাব'আ সুবাইহ)

২০. আল-ইমাম আশ-শাফিঈ, আর-রিসালা, সম্পাদনা : আহমাদ শাকির (মিসর : তা'আ আল-বাবি আল-হালাবী)

২১. ইবন হাযাম, আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম (মিসর : মাকতাবাতু আস-সা'আদা)

২২. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাদরীব আর-রাবী ফী শারহি তাকরীব আন-নাওয়াবী (মিসর : মাতবা'আতু আস সা'আদা)

২৩. আহমাদ-আমীন, ফাজরুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১০ম সংস্করণ)

২৪. ইবন আবী আল-হাদীদ, শারহু নাহ্‌জিল বালাগা (মিসর : তাব'আ আল-বাবী 'আল-হালাবী)

২৫. আন-নাওয়াবী, শারহু সহীহ মুসলিম (তাব'আ আল-মিসরিয়্যা, ১৩৪৭)

২৬. ড. 'উমার ইবন হাসান আল-ফালাতা, আল-ওয়াদ'উ ফী আল-হাদীছ (দিমাশ্ক : মাকতাবাতু আল-গাযালী, ১৯৮১)

২৭. ড. মুসতাফা আশ-শা'কা, মানাহিজ আত-তা'লীফ 'ইনদা আল-'আরাব (বৈরূত : দারুল 'ইলম ১৯৯৮)

২৮. মুসতাফা আল-আ'জমী, দিরাসাত ফী আল-হাদীছ আন-নাবাবী (বৈরূত)

২৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (দিমাশ্ক : দারুল কালাম)

৩০. ড. সুবহী আস-সালিহ, 'উলূম আল-হাদীছ (ইরান : মানশূরাত আর-রিদা, ১৯৪৪)

৩১. ড. মাহমূদ মুহাম্মাদ মাযরূ'আ, শুবহাত আল-কুরআনিয়্যীন হাওলা আস-সুন্নাহ্ (আল-মাকতাবা আশ-শামিলা)

৩২. ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান, তায়সীরু মুসতালাহ আল-হাদীছ (ভারত : মাকতাবায়ে ইশা'আতে ইসলাম)

৩৩. ড. মুহাম্মাদ আবূ শাহ্বা, দিফা'উন 'আন-আস-সুন্নাহ্ (আল-আযহার : মাতবা'আতু আল-মাসহাফ আশ-শারীফ, ২য় প্রকাশ)

৩৪. ড. উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)

৩৫. ড. 'আবদুল 'আজীম ইবরাহীম মুহাম্মাদ, আশ-শুবহাত আছ-ছালাছূন আল-মুছারা লি-ইনকার আস-সুন্নাহ্ আন-নাবাবিয়্যা (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহ্বা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)

৩৬. ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ, ২০০৫)

৩৭. ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৫)

৩৮. মুফতী আমীমুল ইহসান, মীযানুল আখবার (ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭)

৩৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা (ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫)

৪০. নূর মোহাম্মাদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২)

৪১. শিবলী নু'মানী, ইসলামী দর্শন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)

৪২. ইবন হাজার 'আসকালানী, শারহু নুখবাতিল ফিক্র (ঢাকা : ২য় প্রকাশ, ২০০১)

৪৩. ড. মুসতাফা আস-সুবা'ঈ, আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬)

৪৪. ড. মাহফূজুর রহমান, সুন্নাতে রাসূল (সা.) : অনুসরণের রূপরেখা (কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন, ২০০৬)

৪৫. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২)

৪৬. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ।